বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

চাঁদপুর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

চাঁদপুর

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. দেলোয়ার হোসেন

সংগ্রাহক
এস. এম. জয়নাল আবেদীন
আইনুন্নাহার কাদ্‌রী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
চাঁদপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১৩

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : CHANDPUR (Present state of Folklore in Chandpur District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : April 2013. Price : Tk. 200.00 only. US$: 10

ISBN-984-07-5322-3

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাক্তি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক তানভীর আহমেদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান চাঁদপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে চাঁদপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-১২৪

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. একনজরে চাঁদপুর জেলা
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. ভূমি ব্যবস্থাপনা
ঙ. ভূ-তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিচয়
চ. নৃ-তাত্ত্বিক ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়
ছ. নদ-নদী
জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঝ. জেলার ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ
ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্ব
ট. মুক্তিযুদ্ধ
ঠ. বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব
ড. চাঁদপুর জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন
ঢ. চাঁদপুর জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সংগঠন
ণ. মাজার
ত. যোগাযোগ ব্যবস্থা

লোকসাহিত্য (folk literature / folk narrative) ১২৫-১৪২

ক. লোকগল্প/কাহিনি/ কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. লোকপুরাণ
গ. পুথি পাঠ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (materital culture) ১৪৩-১৪৭

লোকশিল্প

১. জালশিল্প
২. মৃৎশিল্প
৩. নকশিকাঁথা,

www.pathagar.com

৪. বাঁশ-বেতশিল্প
৫. হোগলা পাটি
৬. শীতল পাটি
৭. তাঁতশিল্প
৮. শোলাশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume) ১৪৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪৯-১৫০

লোকসংগীত (folk song) ১৫১-১৭০

লোকসংগীত

১. বন্দনাসংগীত
২. জারি গান
৩. খোদাতত্ত্ব
৪. নবীতত্ত্ব
৫. মারফতি
৬. চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার গান
৭. মাজারের গান
৮. বেহুলার গীত
৯. হয়লা
১০. গজল
১১. বিয়ের গীত

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৭১-১৭২

লোকউৎসব (folk festival) ১৭৩-১৭৬

১. চাঁদপুর সদর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসব
২. ঈদ-উল-ফিতর
৩. কোরবানি
৪. নবী দিবস
৫. মোসলমানি
৬. মসজিদে সিন্নি প্রদান
৭. মেজবানি
৮. রথের মেলা
৯. বৈশাখি উৎসব

www.pathagar.com

লোকমেলা (folk fair) ১৭৭-১৭৮

১. বাবুরহাটের বৈশাখী মেলা
২. হাইমচর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা
৩. মেহেরনের রথের মেলা
৪. ঐতিহ্যবাহী লেংটার মেলা ও অন্যান্য মেলা
৫. হাজীগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা
৬. মেহের কালীবাড়ীর কালী পূজা
৭. মেহের কালীবাড়ীর পৌষ মেলা

লোকাচার (ritual) ১৭৯-১৮৩

চাঁদপুরে বিয়ের অনুষ্ঠান,
বতের ভাত
হরব
দোল
কীর্তন
ঢাকবাদ্য
রামলীলা
কুলানি

লোকখাদ্য (folk food) ১৮৪-১৮৫

লোকনাট্য (folk theatre) ১৮৬-১৯২

দুবাইওয়ালা

লোকক্রীড়া (folk games) ১৯৩-২০২

লাঠি খেলা
কুস্তিখেলা
মোরগ লড়াই
ঘুড়ি উড়ানো
ঘোড়দৌড়
হাডুডু খেলা
দাড়িয়াবান্দা
গোল্লাছুট ও বম খেলা
বউচি খেলা
ডাংগুলি
ঘুটি-দাড়া
কানামাছি

www.pathagar.com

লুকোচুরি
বাঘবন্দি
কড়িখেলা
লাটিম খেলা
কুৎকুৎ খেলা
ছড়া খেলা
গাচ্ছা খেলা
ওপেন টু বায়স্কোপ
গরুর দৌড় ও গরুর লড়াই

লোকপেশাজীবি গ্রুপ (folk groups) ২০৩-২০৮
লোকচিকিৎসা (folk medicine) ২০৯-২১০
লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ২১১-২১২
ধাঁধা (riddle) ২১৩-২২০
প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverbs) ২২১-২২৬
লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২২৭-২৩৬
লোকভাষা (folk language) ২৩৭-২৪০

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

মেঘনা, ডাকাতিয়া, ধনাগোদা নদীর কোল জুড়ে ১৭০৪.০৬ বর্গ কিমি আয়তনের ঘন সবুজ ভূখণ্ডের নাম চাঁদপুর। এই ভূখণ্ডের বুকে পরম যতন আর আদরের মাঝে বসবাস ২৬,০০,২৬৩ জন মানুষের। আকাশের চাঁদ জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে পড়ে এই সবুজ ভূখণ্ডে। আচ্ছাদিত করে রাখে হাজার বছরের বিকশিত সভ্যতার এক সমৃদ্ধ জনপদকে। স্নিগ্ধ আলোর উৎস হচ্ছে চাঁদ, লোকালয়, নিকেতন আলয় অথবা গ্রাম, জনপদ হচ্ছে পুর। এ দুয়ের সমন্বয়ে গড়া জনপদ হচ্ছে চাঁদপুর।

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

১৭৭৯ খ্রি. ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণে নরসিংহপুর (যা বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন) নামক স্থানে চাঁদপুরের অফিস-আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বর্তমান স্থান হতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এ এলাকা বর্তমানে বিলীন হয়েছে। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল (কিছু অংশ) বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলে ছিল। এ অঞ্চলে তিনি একটি শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ঐতিহাসিক জে. এম. সেনগুপ্তের মতে, চাঁদরায়ের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর। অন্যমতে, চাঁদপুর শহরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কারো মতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লি থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদীবন্দর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে নাম হয়েছে চাঁদপুর। তিনি বাস করতেন পুরিন্দপুর এলাকায়। হাজীগঞ্জের ফিরোজশাহী মসজিদ মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। যেটি ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর নির্মাণ করেছেন বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়। হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন অলিপুর গ্রামে প্রখ্যাত মোগল শাসক আব্দুল্লাহর প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল। এখানে রয়েছে বাদশাহ আলমগীরের নামাঙ্কিত আলমগীরি পাঁচগম্বুজ মসজিদ, শাহাজাদা সুজা স্থাপিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মোগল আমলের বীর সেনানায়কদের শানবাঁধানো মাজার। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান চাঁদপুর প্রাচীন বঙ্গে সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষদিকে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়ান সাং সমতট রাজ্যে আগমন করেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি সমতটকে সমুদ্র তীরবর্তী নিম্ন আদ্র-ভূমি রূপে বর্ণনা করেছেন যা এই অঞ্চলকে বোঝায়। প্রাচীন বাংলার গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এলাকার কোনো স্বতন্ত্র আদিনাম সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

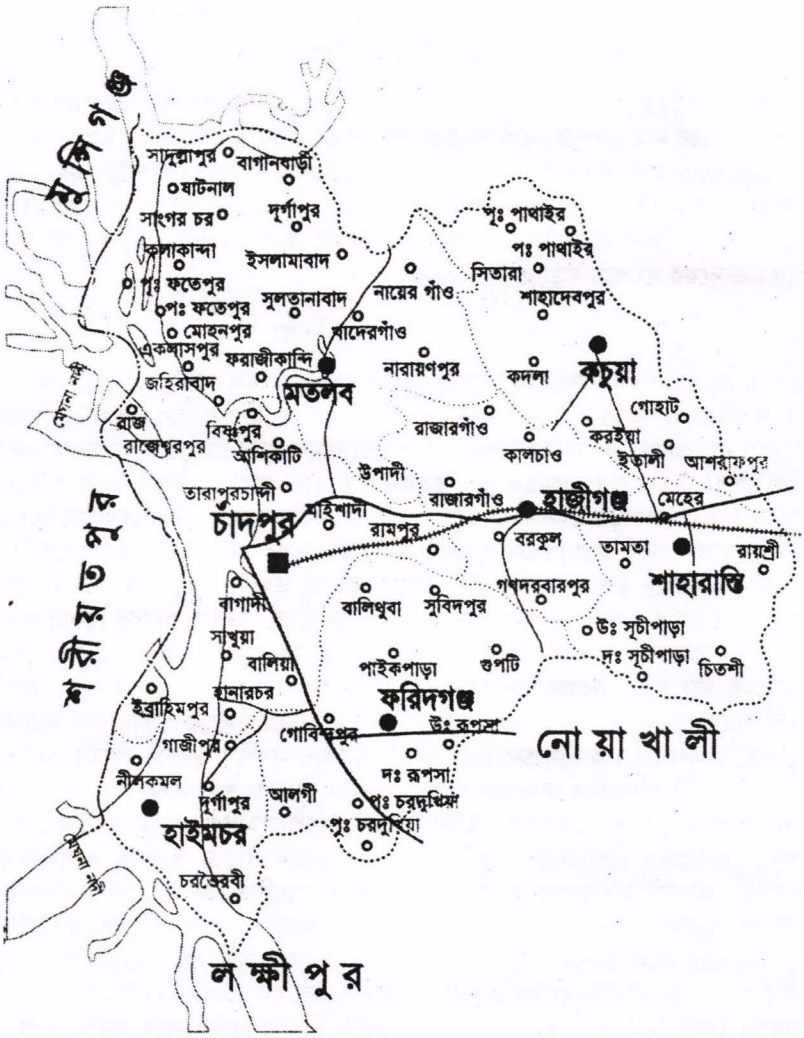

চাঁদপুর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

খ. এক নজরে চাঁদপুর জেলা

আয়তন : ১৭,৪০৬ বর্গ কিলোমিটার।

জনসংখ্যা : মোট : ২৬,০০,২৬৩ ; পুরুষ : ১৩,৫৪,৭৩২ ; মহিলা: ১২,৪৫,৫৩১

মোট ভোটার সংখ্যা : মোট : ১৪,১১,৬০৬ ; পুরুষ : ৭,৩৬,৯৩৭ ; মহিলা : ৬,৭৪,৬৬৯ ।

উপজেলা : ০৮টি ; চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ।

থানা : ৮টি ; চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব দক্ষিণ ও মতলব উত্তর।

পৌরসভা : ৭টি ; চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, ছেঙ্গারচর ও মতলব।

ইউনিয়ন : ৮৭টি।

গ্রাম : ১৩৬৫ টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারি কলেজ ০২টি; বেসরকারি কলেজ ৪৫টি; পলিটেকনিক ০১টি; টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ০১টি; মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৪৯টি; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭টি; বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯টি; সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৮৬টি; রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২৭টি; আনরেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি; কমিউনিটি বিদ্যালয় ৯৩টি; প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ০১টি;

মৌজা : ১০৪১ টি

নদী

মেঘনা : দৈর্ঘ্য : ১৪১.৫ নটিক্যাল মাইল। চাঁদপুর জেলার মধ্যে প্রবাহিত ৪০ নটিক্যাল মাইল। ডাকাতিয়া : দৈর্ঘ্য : ১২৫ নটিক্যাল মাইল। চাঁদপুর জেলার মধ্যে প্রবাহিত ৭০ নটিক্যাল মাইল। ধনাগোদা : দৈর্ঘ্য : ২৫ নটিক্যাল মাইল। চাঁদপুর জেলার মধ্যে ২৫ নটিক্যাল মাইল।

বদ্ধ জলমহাল ২০ একরের উর্ধ্বে ও অনুর্ধ্ব ২০ একর : মোট বদ্ধজলমহাল-১৫৫টি; ২০ একরের উর্ধ্বে - ১০টি ; অনুর্ধ্ব ২০ একর - ১৪৫টি।

হাট বাজার : মোট হাটবাজার ২১২টি। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার হচ্ছে, পুরাণ বাজার, নতুন বাজার, বাবুরহাট বাজার, কচুয়া বাজার, রহিমানগর বাজার, ফরিদগঞ্জ বাজার, রূপসা বাজার, হাজীগঞ্জ বাজার, সুচিপাড়া বাজার, বেগম বাজার, ওয়ারুক, মতলব বাজার, নায়েরগাঁও বাজার, নারায়নপুর বাজার, খাজুরিয়া বাজার, সুজাতপুর বাজার, ঠাকুর বাজার, ছেংগারচর বাজার, সাচার বাজার।

জমি সংক্রান্ত তথ্য : মোট জমি ১,৬৭,০০৯ হে.; মোট আবাদি জমির পরিমাণ ১,৬৫,১১৪ হে.; নিট ফসলি জমি ৯৮২৬৩ হে.; আবাদি জমি ১০৮৫৩০ হে.; সাময়িক পতিত জমি ১০২৬৭ হে.; একফসলি জমি ২২৭১৬ হে.; দুইফসলি জমি ৫৬৬৮৭ হে.; তিনফসলি জমি ১৮৩৩১ হে.; তিনের অধিক ফসলি জমি ৬২৯ হে.।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস : ৭২টি

পাকা রাস্তা : ২৮৫ কি.মি.। কাঁচা রাস্তা : ২,৩৬০ কি.মি.।

রেলপথ : ৪১ কি.মি. ; নৌ-পথ : ২০৩ কি.মি.।

নৌ-বন্দর : ১টি।

দর্শনীয় স্থান : বড়স্টেশন মোলহেড নদীর মোহনা (চাঁদপুর সদর); জেলা প্রশাসকের বাংলোয় অবস্থিত দুর্লভ জাতের নাগলিঙ্গম গাছ ; চাঁদপুর জেলার ঐতিহ্যের প্রতীক ইলিশ চত্বর; প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ এলাকা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন মুক্তিযুদ্ধের স্মারক।

আদিবাসী, জনগোষ্ঠী : ত্রিপুরা ; মোট জনসংখ্যা : ৩২২৭; পুরুষ: ১৫০৪; মহিলা : ১৭২৩

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ১৫২৬ জন প্রতি বর্গ কি.মি.

সংসদীয় আসন : ০৫টি। (১) ২৬০, চাঁদপুর-১- কচুয়া উপজেলা ও মতলব (দ.) এর একাংশ (২) ২৬১, চাঁদপুর-২- মতলব উত্তর ও মতলবব দক্ষিণ (৩) ২৬২, চাঁদপুর-৩- চাঁদপুর সদর ও হাইমচর (৪) ২৬৩, চাঁদপুর-৪- ফরিদগঞ্জ। (৫) ২৬৪, চাঁদপুর-৫- হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি

শিক্ষা : গড় হার ৬৮%।

স্বাস্থ্য : ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ০১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-০৭টি, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (ICDDRB) ০১টি (মতলব দক্ষিণ), মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ০৩টি, চক্ষু হাসপাতাল ০১টি, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ০১টি, ডায়াবেটিক হাসপাতাল ০১টি, রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল ০১টি, রেলওয়ে হাসপাতাল ০১টি, বেসরকারি হাসপাতাল (ক্লিনিক) : রেজিস্টার্ড-২০টি, আন রেজিস্টার্ড : ০২টি, বেসরকারি ডেন্টাল ক্লিনিক ৩টি, বেসরকারি ডায়াগনিস্টিক সেন্টার : রেজিস্টার্ড-৯২, আনরেজিস্টার্ড-১৫টি

কৃষি : ধান, পাট, গম, আখ, আলু, সরিষা, সুপারি, সয়াবিন, মরিচ, শাকসব্জি।

মেঘনার তীরে চাঁদপুর পুরাণবাজার ব্যবসাকেন্দ্র

www.pathagar.com

উপজেলা ও ইউনিয়ন

চাঁদপুর জেলার মোট উপজেলা : ৮ টি, মোট ইউনিয়ন : ৮৮ টি

চাঁদপুর সদর উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) বিষ্ণুপুর (২) আশিকাটি (৩) কল্যাণপুর (৪) শাহ মাহামুদপুর (৫) রামপুর (৬) মৈশাদী (৭) তরপুরচন্ডী (৮) বাগাদী (৯) বালিয়া (১০) লক্ষীপুর (১১) ইব্রাহিমপুর (১২) চান্দ্রা (১৩) হানারচর (১৪) রাজরাজেশ্বর

ফরিদগঞ্জ উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) পশ্চিম বালিখুবা (২) পূর্ব বালিখুবা (৩) পূর্ব সুবিদপুর (৪) পশ্চিম সুবিদপুর (৫) পূর্ব গুপ্টি (৬) পশ্চিম গুপ্টি (৭) উত্তর পাইকপাড়া (৮) দক্ষিণ পাইকপাড়া (৯) উত্তর গোবিন্দপুর (১০) দক্ষিণ গোবিন্দপুর (১১) পূর্ব চর দুঃখিয়া (১২) পশ্চিম চর দুঃখিয়া (১৩) দক্ষিণ ফরিদগঞ্জ (১৪) দক্ষিণ রূপসা (১৫) উত্তর রূপসা

হাইমচর উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) গাজীপুর (২) গাজীপুর (৩) উত্তর আলগী দূর্গাপুর (৪) দক্ষিণ আলগী দূর্গাপুর (৫) নীলকমল (৬) চর ভৈরবী

হাজীগঞ্জ উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) উত্তর রাজারগাঁও (২) বাকিলা (৩) উত্তর কালচোঁ (৪) দক্ষিণ কালচোঁ (৫) হাজীগঞ্জ (৬) পূর্ব বড়কুল (৭) পশ্চিম বড়কুল (৮) হাটিলা পূর্ব (৯) উত্তর গন্ধর্ব্যপুর (১০) দক্ষিণ গন্ধর্ব্যপুর (১১) পশ্চিম হাটিলা

কচুয়া উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) সাচার (২) পাথৈর (৩) বিতারা (৪) সহদেবপুর (পশ্চিম) (৫) সহদেবপুর (পূর্ব) (৬) উত্তর কচুয়া (৭) দক্ষিণ কচুয়া (৮) কাদলা (৯) কড়ইয়া (১০) উত্তর গোহাট (১১) দক্ষিণ গোহাট (১২) আশ্রাফপুর

মতলব দক্ষিণ উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) উত্তর নায়েরগাঁও (২) দক্ষিণ নায়েরগাঁও (৩) খাদেরগাঁও (৪) নারায়ণপুর (৫) উত্তর উপাদী (৬) দক্ষিণ উপাদী

মতলব উত্তর উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) ষাটনল (২) বাগানবাড়ী (৩) সাদুল্যাপুর (৪) দূর্গাপুর (৫) কলাকান্দা (৬) মোহনপুর (৭) এখলাছপুর (৮) জহিরাবাদ (৯) পূর্ব ফতেহপুর (১০) পশ্চিম ফতেহপুর (১১) ফরাজীকান্দি (১২) ইসলামাবাদ (১৩) সুলতানাবাদ (১৪) গাজরা

শাহরাস্তি উপজেলা

ইউনিয়নের নাম : (১) দক্ষিন টামটা (২) উত্তর টামটা (৩) উত্তর মেহের (৪) দক্ষিণ মেহের (৫) উত্তর সূচিপাড়া (৬) দক্ষিণ সূচিপাড়া (৭) পূর্ব চিতষী (৮) দক্ষিণ রায়শ্রী (৯) উত্তর রায়শ্রী (১০) পশ্চিম চিতষী

www.pathagar.com

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মুসলিম শাসন এবং মোগল আমল

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র বাংলা মুসলিম শাসনের অধিকারে আসার সাথে সাথে এ অঞ্চল স্বাভাবিকভাবে মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশেষ করে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এ অঞ্চল শাসন করেছেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে জীন ডি. ব্যারোসের মানচিত্রে নদী তীরবর্তী 'ট্রপো'র অবস্থান দেখানো হয়েছে। উক্ত 'ট্রপো' তৎকালীন ত্রিপুরা জেলা বা কুমিল্লা অঞ্চল। সুতরাং বর্তমান চাঁদপুরের ভৌগলিক অবস্থান নিকট ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। ১৬৫২ সালে পর্তুগীজ নাবিক স্যানসন দ্যা আবেভিল অঙ্কিত বান্দের নাম চিহ্নিত স্থানে একটি বড় নদী বন্দর ছিল এবং সেটি চাঁদপুর বন্দর ছিল। জে. এফ. ব্রাইনি সি. এস- এর মতে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডারমল ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল প্রশাসনের জন্য ১৯টি বিভাগের প্রবর্তন করেন। এ ১৯টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হল সোনারগাঁও সরকার এবং এর মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেরশাহের আমলে বিভিন্ন পরগণায় ভাগ করা হয়।

ব্রিটিশ আমল ও তৎপরবর্তী

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র এঁকেছেন তাতে কেবলমাত্র ত্রিপুরা জেলাই দেখানো হয়নি- চাঁদপুর ও কুমিল্লার সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৫৮ সালে নবগঠিত ত্রিপুরা জেলার ১১টি থানার অধীন ১৫টি আউটপোস্ট ছিল। মতলব ছিল হাজীগঞ্জের একটি আউটপোস্ট। ১৮৮৭ সালে মতলব আউটপোস্টটি হাজীগঞ্জ থেকে কেটে নেওয়া হয়। তখন এ জেলা চারটি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। তা হলো– সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর। তখন ২১টি থানা ও ৩৬২টি ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল। চাঁদপুর মহকুমায় ৫টি থানা ছিল। তা হলো- চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও মতলব। ১৯৮৪ সালে চাঁদপুর জেলা হয়। তৎকালে মতলব উপজেলায় ২২টি ইউনিয়ন বিদ্যমান ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার্থে গেজেট নং উজে-২/২পি-২৩/২০০২/৪৭১ তারিখ ১৭-০৯-২০০২ এর মাধ্যমে মতলব উপজেলাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে মতলব নামে একটি উপজেলা রেখে ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে মতলব উত্তর নামে নতুন আরেকটি উপজেলা গঠন করা হয়।

চাঁদপুর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের (চরাঞ্চলসমূহ) ইতিহাস

চাঁদপুর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের সঠিক ইতিহাস কারো জানা নেই। ইতিহাসবিদদের মতে, কোনো এক সময় এই ভূখণ্ডস্থলে নদী ছিল, কেউ বলেন সাগর ছিল, কেউ বলেন নদী। অধিকাংশ মনে করেন, এ ভূখণ্ড এক সময় নদী ছিল। ভূ-খণ্ডের বয়স কারো মতে ১শ' আশি বছর, কারো মতে ২শ' থেকে ৩শ' বছর, কারো মতে ৪শ' বছর। তবে

www.pathagar.com

অনেকেই বলেছেন প্রায় ৩শ' থেকে ৪শ' বছরের মধ্যে হবে। এ ভূ-খণ্ডের ইতিহাস জানতে হলে এবং এর বয়স নিরূপণ করতে হলে কিছু যুক্তি প্রমাণ থাকতে হয়। ভূ-খণ্ডটির বয়স কত এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও এটা বলা যায় যে, এ স্থল এক সময় নদী গর্ভে ছিল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেন, কুমিল্লায় (সাবেক ত্রিপুরা জেলা) যখন ইউনিভার্সিটি ছিল (বৌদ্ধ বিহার) অর্থাৎ রাজা আনন্দদেবের শাসনামলে এই স্থলে সাগর ছিল এবং এই সাগরের নাম ছিল লম লম সাগর। এটা প্রায় আটশত বছর পূর্বের কথা।

এই সাগরপথে রাজা আনন্দদেবের কাছে এসেছিলেন প্রখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এবং শাহ মাহমুদ বোগদাদী। এখানে সাগর ছিল এই তথ্য সঠিক এই ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কুমিল্লার লোকসাহিত্যে বন্দনার অংশে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণে লম লম সাগরের কথা পাওয়া যায়। নদী এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেখানে নদী আছে সেখানে নদীর তীর বা পাড় থাকে। আবার এর মাঝে জেগে উঠে চর। চর নদীকে বিভক্ত করতে পারে। নদীতে যত চর ভাসে সে পরিমাণে নদীর শাখা হয় এবং নদীর পাড় হয়। নদীর বুকে ভেসে উঠা চর সমতল নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। সাধারণত, লোকজন উঁচু এলাকায় বসবাস করে। আর তুলনামূলক নিচু অংশে ফসল ফলায়। বর্ষা বা বন্যায় পানি উঠে না এমন জায়গাতেই মানুষ গৃহ নির্মাণ করে এবং কালক্রমে সেখানে গ্রাম গড়ে উঠে। বসবাসের উপযোগী উঁচু জায়গাগুলোকে সাধারণত কান্দা বলা হয়। কান্দায় লোকজনের বসবাস শুরু হলে সেটাকে কান্দিও বলা হয়। জরিপ করেও তাই পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে দেখা যায় যেখানেই জনবসতি সেটাই কান্দি বা কান্দা হিসেবে পরিচিত। চরেও একসময় বসবাস শুরু হয়। এখানে রয়েছে প্রায় শতাধিক চর বা চক এবং প্রায় ১শ' কান্দা, কান্দি, ভিটি বা পাড়। এগুলোর মধ্যে ওটারচর, ঠাকুরচর, বালুচর (ছেঙ্গারচর), ছেঙ্গাচর, শিকিরচর, চরচারিয়ানী, ছোটো কেনাচক, বড় কেনাচক, বড়চর, ঘাষিরচর, ব্রাহ্মণচক, পাঠানচক, ভাইগারচর, পাহাড়ের চক, চরলতুরদি, বাহেরচর, চরপালালোকদি, নীলেরচর, শিকিরচর, বোরচর, কাওয়ারচর, চরকাশিমপুর, চরউমেদ, চরহারিগো, চরঝাউ, মহিষমারীরচর, বালুরচর (আমিরাবাদ), চরমাছুয়া, ছোটো হলদিয়ার চর, বড় হলদিয়ার চর, ভাসানচর, বড়চরকালিয়া, ছোটো চরকালিয়া, নয়াচর, পুটিয়ারচর, চরসুগন্ধী, নামছরি, চরইদ্রিস, চরওয়েবস্টার, চরএলেন, চরইলিয়ট, ধনারচক, চরশিবপুর, নিদচরি, চরবারুয়া এবং মালাইরকান্দি, ছৈয়ালকান্দি, দুলালকান্দি, ঘনিয়ারপাড়, তিতারকান্দি, আদুর ভিটি, বিলাইখারকান্দি, চান্দ্রাবিলেরকান্দি, ভিলায়কান্দি, ডেকুরভিটি, মেহেরুল্লা প্রধানের কান্দি, আছান আলী প্রধানের কান্দি, কান্দু সরকারের কান্দি, মুল্লুক মাঝিরকান্দি, চাঁন সরদারকান্দি, ঢালীকান্দি, মোল্লাকান্দি, কেশাইরকান্দি, রায়েরকান্দি, নয়াকান্দি, বারুরকান্দি, বালুয়াকান্দি, খন্দকারকান্দি, চান্দ্রাকান্দি, ফৈলাকান্দি, পদুয়ারপাড়, সোসাইরকান্দি, গোপালকান্দি, নয়াকান্দি, মোক্তারকান্দি, মমরুজকান্দি, সোনাইরকান্দি, আবুরকান্দি, রাজুরকান্দি, মনুরকান্দি, নবাইরকান্দি, শিকারীকান্দি, মুন্সিকান্দি, মিঠুরকান্দি, খাগকান্দা, ভিতিকান্দি, ঋষিকান্দি, হিজলাকান্দি, মজুমদারকান্দি, বনিকিয়াকান্দি, কলাকান্দা, আনিরপাড়, ফতুয়াকান্দি, নাসিরাকান্দি, উলুকান্দা,

www.pathagar.com

নান্দুরকান্দি, শাহাবাজকান্দি, সানাতেরকান্দি, মাইজকান্দি, ডাকুরকান্দি, নয়া কান্দি, সিপাহী কান্দি, নজর মোহাম্মদের কান্দা, টরকী কান্দা, আমুয়া কান্দা, ফৈলাকান্দি, রাঢ়ীকান্দি, দিঘলীপাড়, কাজীকান্দি, নবুরকান্দি, নমকান্দি, কাচারীকান্দি, সরকারকান্দি, ফরাজীকান্দি, ফরিদকান্দি, গোরাইরকান্দি, কোয়ারকান্দি, বলাইর কান্দি, আমুয়াকান্দি গ্রামগুলো দিয়ে ধারণা করা যায় ভূ-খণ্ড এক সময় নদী ছিল।

এই এলাকার মাটি বেঁলে প্রকৃতির। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার মাটি নিয়ে পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই মাটি এবং নদীর তলদেশের মাটি একইরূপ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় এই ভূ-খণ্ড স্থল নদী ছিল। এ অঞ্চলে নতুন বাড়িঘর নির্মাণ কিংবা পুকুর পুস্করিণী খননের সময় নদীতে ডুবে যাওয়া ব্যবহার্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। গত ২০০২ সালে মান্দারতরী গ্রামে পুকুর খনন করতে গিয়ে মাটির নিচে নৌকা পাওয়া গেছে। এ ভূখণ্ডস্থল দীর্ঘদিন একই অবস্থায় ছিল এমন নয়। প্রমত্তা মেঘনার অবিরাম ভাঙ্গনে নিকট ভূখণ্ডের রূপ কাঠামোর পরিবর্তনও ঘটেছে দ্রুত। কোনো স্থানের বয়স নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে অনেক সময় প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাকীর্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সে হিসেবে এখানে তেমন কোনো পুরাকীর্তি পাওয়া যায় না। তবে ঘনিয়ারপাড় উপজেলা সংলগ্ন ১টি, গজরা গ্রামে ১টি এবং রাঢ়ীকান্দি গ্রামে ১টি; মোট ৩টি পুরনো বটবৃক্ষ ছিল। রাঢ়ীকান্দি এবং গজরার বটবৃক্ষ দুটি কেটে ফেলা হয়েছে। উপজেলা সংলগ্ন গাছটি এখনও আছে যা ২'শ বছরের পুরানো বলে অনেকের ধারণা।

ছোটো হলদিয়া গ্রামের মসজিদটি (ছোটো মসজিদ)-কে ৬ ঘইরা মসজিদ বলা হতো। মসজিদ নির্মাণকালে এই গ্রামে ৬টি পরিবার বা বংশ ছিল বলে জানা যায়। এগুলো হলো– সরকার, শিকদার, খাঁ, প্রধানীয়া, ভূঁইয়া এবং বেপারী। মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেবের পেছনে ১টি কাতার (সারি) ছিল এবং কাতারটিতে ৬ জন নামাজি দাঁড়াতে পারতেন। এমন একটি পরিত্যক্ত মসজিদ রয়েছে চাঁদপুর সদর উপজেলার ছোটো সুন্দর গ্রামে। প্রায় ১'শ বছর যাবত মসজিদটি নামাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওরঙ্গজেব এই ধরনের অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন প্রায় কাছাকাছি সময়ে। সে হিসেবেও মসজিদটির বয়স প্রায় ২৫০ থেকে ২৬০ বছর। এই কীর্তিগুলো দ্বারা অনুমান করা যায়, এই অঞ্চল বহু পুরাতন নয়। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে এই ভূখণ্ডের বয়স ৪০০ বছরের নিচে। বাংলার সর্বপ্রথম সরকারিভাবে মানচিত্র অংকন করেন 'জেমস রেনেল'। তিনি ২শ' ২৭ বছর পূর্বে ১৭৭৯ সালে ত্রিপুরা জেলার মানচিত্র অংকন করেন। ত্রিপুরা জেলার মানচিত্রে মতলব উত্তর উপজেলার এই ভূখণ্ডটিতে তখন মানুষের বসবাস ছিল এবং এগুলো মানচিত্রে দেখা যায়। সুতরাং ধরে নেয়া যায় এখানে বসবাস আরো পূর্বে থেকে।

১৬৬০ সালে অংকিত ব্যান্ডেন ব্রুক এর ম্যাপে এ ভূখণ্ডটি চোখে পড়ে। ঈসা খাঁর রাজধানী সোনার গাঁ বন্দরের পশ্চিমে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ বন্দর দীর্ঘদিনের পুরাতন। মতলব উত্তর ভূখণ্ড থেকে এর উৎপত্তি অনেক আগের। এখান থেকে মতলব উত্তর উপজেলা প্রায় ৪০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। ব্র্যান্ডেন ব্রুক এর মানচিত্রে যে লেখা রয়েছে তা ইংরেজি টাইপের হলেও আজকের ইংরেজির সাথে মিল নেই। বানানে রয়েছে পার্থক্য, উচ্চারণ করেও আজকের ব্যবহৃত শব্দের সাথে মিলে না।

www.pathagar.com

চাঁদপুরের চরাঞ্চল

চাঁদপুরের মেঘনা নদীর বক্ষে ৩৮টি ছোটো-বড় চর রয়েছে। এই চরগুলো হাইমচর, চাঁদপুর সদর, মতলব দক্ষিণ ও মতলব উত্তরের আওতাধীন। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে চরের মানুষেরা বেঁচে থাকে। নদী যেমন তাদের জীবন কেড়ে নেয়, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে একাকার করে। আবার এই নদীতেই তারা জীবিকার সন্ধানে নামে। ইলিশ জেলেরা বেশিরভাগই চরের মানুষ। চরের সহজ-সরল মানুষগুলোর রয়েছে বিচিত্র জীবন। জন্মেই তারা জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফসল বলতে সামান্য কিছু ধান, মরিচ ও বিভিন্ন তরকারি চরে ফলে। যোগাযোগের মাধ্যম নৌকা। বিয়ে শাদীতে পালকির ব্যবহার এখনও প্রচলিত। শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা এখানে খুব একটা নেই। এরা ঘরে ঘরে আজ সৌরবিদ্যুতের কল্যাণে টেলিভিশন দেখে। মূল ভূ-খণ্ড থেকে দূরে চরের অবস্থান হওয়ার কারণে এখানে আভ্যন্তরীণ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে। সংস্কৃতির চর্চা চলতে পুঁথি পাঠ, কবির লড়াই, খেলাধুলা বলতে হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে।

লগগিমারা চরের একটি পরিবার

ঘ. ভূমি ব্যবস্থাপনা

সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:) সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্য যে কয়েকটি সুবাহ্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল তার মধ্যে সুবায়ে বাঙ্গলা ছিল একটি । অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলাদ্বয় এবং শ্রীহট্ট জেলা সুবে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে কুমিল্লা জেলার ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই সুবাহ্ সে সময় ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। সেগুলি হল- (১) আরদবুজ ওরফে টান্ডা (২) জান্নাতাবাদ বা লখনৌতি (৩) ফতেহাবাদ (৪) মাহমুদাবাদ (৫) খলিফাতাবাদ (৬) বগলা বা বাকলা

www.pathagar.com

(৭) পূর্ণিয়া (৮) তাজপুর (৯) ঘোড়াঘাট (১০) পাঞ্চরা (১১) বারাকাবাদ (১২) বাজুহা (১৩) সোন্নারগাঁও বা সোনারগাও (১৪) সিলহেট বা শ্রীহট্ট (১৫) মদারণ বা মান্দারণ।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ তালিকায় বর্তমান কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সোনারগাঁও সরকারে মোট ৫২টি পরগণা ছিল বলে কুমিল্লা জেলার ইতিহাসে দেখা যায় এবং এই সরকার বছরে মোট ১,০৩,৩১,৩৩৩ দাম ২,৫৮,২৮৩ টাকা ১৩ দাম (৪০ দামে = ১ টাকা) রাজস্ব পরিশোধ করে। ৫২টি পরগণার মধ্যে ২০টি পরগণা ও সরকার শ্রীহট্টের সতের খণ্ডল এই মোট ২১টি পরগণা কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ছিল।

১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য মোঘলদের শাসনাধীনে আসে এবং সরকার উদয়পুর নামক আর একটি সরকারের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বর্তমান কুমিল্লা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ সমগ্র পূর্ব বাংলার ভূমি রাজস্যের ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার সাধিত হয় এবং বিভিন্ন পরগণার রাজস্ব নূতন করে নির্ধারিত হয়। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহ্ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০খ্রিঃ) বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পুনঃগঠন করেন। এই রাজস্ব তালিকাকে বাংলার দ্বিতীয় রাজস্ব তালিকা বলা হয়। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ রাজস্ব তালিকা পুনঃগঠন করেন এবং সেটি ছিল মোঘল আমলের বাংলার তৃতীয় রাজস্ব তালিকা। মুর্শিদ কুলী খাঁ সুবে বাঙ্গলাকে মোট ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করেন। চাকলাগুলি ছিল নিম্নরূপ : (১) বন্দর বালাশোর (২) হিজলী (৩) মুর্শিদাবাদ (৪) বর্ধমান (৫) হুগলী বা সাতগাঁও (৬) ভূষণা (৭) যশোর (৮) আকবর নগর (রাজমহল) (৯) ঘোড়াঘাট (১০) কড়িবাড়ি (১১) জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) (১২) শ্রীহট্ট (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। ১৭২৮ খ্রিঃ তাঁর রাজস্ব তালিকা ভিত্তিক বর্তমান কুমিল্লা জেলার পরগণাগুলির তালিকা প্রস্তুত কালে সেটি পরবর্তীকালে জেমস্ গ্রান্ট নামক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই তালিকার উপর ভিত্তি করে কৈলাস চন্দ্র সিংহের রচিত 'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস নামক গ্রন্থে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

মি. ওয়েবস্টার প্রণীত ত্রিপুরা জেলার গেজেটিয়ারে (৮২-৮৩পৃ.) দেখা যায় ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে কি সমসময়ে বার্ষিক ৯৯৮৬০ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ত্রিপুরার রাজা কল্যাণ মানিক্য উদয়পুর সরকার মোঘলদের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পূর্বে ১৬১৮খ্রি. নুরুল্লাহ খান নামক এক ব্যক্তিকে উদয়পুর সরকারের মোঘল ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নিজ নামানুসারে নূরনগর নামক একটি পরগণার সৃষ্টি ও নামকরণ করেছিলেন এবং সেখানে নূরনগর নামক শহরও স্থাপন করেছিলেন। সেটি কসবা নামে পরিচিত। জেমস গ্রান্টের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কুমিল্লা জেলা গেজেটিয়ারে যে তালিকা দেখানো হয়েছে তাতে কৈলাস সিংহের তালিকার সঙ্গে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

এখানে কৈলাস চন্দ্র সিং এবং জেলা গেজেটিয়ারের তালিকা দু'টি তুলনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় তালিকার চাকলে জাহাঙ্গীরনগরের অধীনস্থ বগাজীর (১) বেলসক (২) পুরচন্ডী (৪) বুরেক কোনিল (৫) সরকার সোনারগাঁয়ের অধীনস্থ মেহেরকুল (৬) মনোহরপুর (৭)

www.pathagar.com

শাহজাদপুর (৭) কৈলাস চন্দ্র সিংহের তালিকায় নেই। আবার কৈলাস চন্দ্র সিংহের তালিকায় উল্লিখিত উত্তর শাহ্পুর (১) করদী (৯) কাদবা (১৩) আমিরাবাদ (১৪) বেদরাবাদ (১৫) রায়পুর (২২) চৌদ্দগাঁও (২৯) জেলা গেজেটিয়ারের তালিকায় নেই। আলোচনায় দেখা যায় একই পরগণা একেক সময় একেক চাকলা বা সরকারের অধীনে ছিল।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ উদদৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ১৭৮১ সালে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হলে রেসিডেন্ট লিক সাহেবের হাতে এর শাসনভার সমর্পিত হয়। (ত্রিপুরা জেলা গেজেটিয়ারের প্রণেতা মি. ওয়েবস্টারের বর্ণনায় দেখা যায়, ত্রিপুরা জেলা ১৭৯০ খ্রি. গঠিত হয়েছিল।) তখন বলদা খাল ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা ময়মনসিংহ জেলার অধীনে ছিল। কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ঈসা খানের বংশধরদের জমিদারি ছিল এসব পরগণা। ১৭৮৭ সালে মি. প্যাটারসন নামক কোম্পানির একজন কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে গঙ্গামণ্ডলকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে পৃথক করে ত্রিপুরার রেসিডেন্টের অধীনে দেওয়া হয়। ১৭২২ সালে দেশে পাঁচসালা বন্দোবস্ত শুরু হয় (১৭৭২-৭৭) এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা বন্দোবস্তের (১৭৭২-৮২) পর ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত একসালা বন্দোবস্ত চলতে থাকে। এদিকে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দশসালা বন্দোবস্ত আইন পাশ করা হলেও এ জেলায় (ত্রিপুরা) এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয় বলে মি. ওয়েবস্টার জেলা গেজেটিয়ারে (৮৪ পৃ.) জানা যায় (কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃ. ৩১২)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে এবং পরে এ জেলায় পরগণার সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে পরগণাগুলিকে ইচ্ছামতো বিভক্ত করা হয়েছিল বলে মি. ওয়েবস্টারের উদ্ধৃতি দিয়ে কুমিল্লা জেলার ইতিহাসে বলা হয়। মি. স্মার্ট এ জেলার ১৬৫টি পরগণা এবং মি. ব্রাউন ১২২টি পরগণার কথা উল্লেখ করেছেন। কৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থে (৫১০-১৩ পৃ.) বর্তমান কুমিল্লা জেলার পরগণাগুলির যে তথ্য রয়েছে–

জমিদার ও জমিদারি

বোয়ালিয়া : ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর মহব্বতপুরের রায় মজুমদার ও বোয়ালিয়ার দে চৌধুরী তখন তালুকদার ছিলেন। মতলব পৌরসভার বোয়ালিয়া গ্রাম নানাদিক দিয়েই সমৃদ্ধশালী ছিল। বোয়ালিয়ার গ্র্যাজুয়েট বাড়িতে ৫০ জন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এ বাড়ির কেউই সরকারি চাকুরি করেননি। সকলেই শিক্ষকতা করতেন। কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন এ বাড়ির। বোয়ালিয়ার দানশীল ও ধার্মিক জমিদার রাজকুমার চৌধুরী মতলবের জগন্নাথ মন্দির ও মসজিদের জন্য জায়গা দান করেন। জমিদারপুত্র ললিতমোহন রায় চৌধুরী বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বাজার ও ডাকঘর স্থাপন করেন।

কাচিয়ারা : এ গ্রামের কাঞ্চনমালা মতান্তরে কাঞ্চনরাজার দিঘি নামে একটি প্রকাণ্ড দিঘি রয়েছে। এখনো রাজবাড়ির অনেক ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে এ কাঞ্চন রাজার দিঘি খনন করা হয়। এর আয়তন ১২.৪৩ একর। এর পশ্চিম

www.pathagar.com

পাশে কাচিয়ারা রাজবাড়ি, যেখানে ৩টি পরিখা রয়েছে। দিঘির পানি সেচে কমানো যায় না। রাজা বা জমিদারদের বিলাসিতার অনেক চিহ্ন আছে। দাতব্য বা জনসেবার কোনো চিহ্ন নেই। নাহার বাড়ি যেখানে পানির নহর ছিল, এখনও বিদ্যমান। এইখানেই কাঞ্চনমালার প্রেম উপাখ্যান রচিত হয়েছে। কাঞ্চন রাজা ও দরিদ্র চাষীর মেয়ে মালার অসম প্রেম কাহিনি এই দিঘিকে ঘিরে আজো লোকমুখে বিরাজমান।

নওয়ারা মহল : পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নবাব শায়েস্তা খান ৭৬৮টি রণতরী বিশিষ্ট একটি নৌবাহিনী সৃষ্টি করেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১১২ মহলের জায়গীর ভূমি নির্দিষ্ট করে দেন। কুমিল্লা জেলার বরদাখাত ও সরাইল পরগণায় নওয়ারা মহল ছিল। কিন্তু এ নৌবহর কতকাল স্থায়ী ছিল এবং নওয়ারা মহলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিক সেই কাজেই ব্যয়িত হত কিনা সে সম্পর্কে কোনো সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। মি. ওয়েবস্টার বলেন যে, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নওয়ারা রাজস্ব আদায়, কিভাবে আদায় করা হত সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান হয় এবং কালেক্টরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সমুদয় রাজস্ব মুদ্রায় আদায় করা হত এবং নবাবের কোনো কর্মকর্তাকে এর কোনো অংশ দেওয়া হতো না।

মেহার : কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রাজা উপাধিধারী কায়স্থ গোত্রের দাস বংশীয়গণ মেহার পরগণার মালিক ছিলেন তাঁদের গুরুবংশে সর্ববিদ্যা বা সর্বানন্দ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাধনার স্থানে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল বলে তিনি বলেন (রাজমালা ৪২৬ পৃ.)।

মেহার বা মেহের একটি অতি প্রাচীন স্থান। মহারাজা দামোদর দেব ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমতট মণ্ডলের বৈশগ্রাম বিষয়ের মেহার গামে ২৫ জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছিলেন বলে জানা যায় এবং এটি মেহার তাম্রশাসন নামে বিখ্যাত।

সর্ববিদ্যা বা সর্বানন্দ ঠাকুরের পীঠস্থানের নিকটবর্তী শ্রীপুর গ্রামে বিখ্যাত মুসলমান সাধক শাহরাস্তির মাজার আছে। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর একজন ধর্ম প্রচারক বলে পরিচিত। মেহার পরগণা মুসলমানদের জমিদারিতে পরিণত হয় বলে কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেছেন। তবে এটি কবে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

রাস্তিশাহ (রঃ) এর মাজার

www.pathagar.com

রাজা টোডরমলের তালিকায় মেহার পরগণার রাজস্ব ছিল ১৫২০ টাকা মাত্র। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের তালিকায় এই জমা ৭৮৯৪ টাকা ছিল বলে দেখা যায়। সে সময়ে এই পরগণার মালিক ছিলেন 'হিংরাজ দুনা' নামক জনৈক মুসলমান জমিদার। তাঁর কোনো পরিচয় জানা যায় না। পরে এই জমিদারি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে অনেক মালিকের হাতে পড়ে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কলকাতার ঠাকুর বংশ এই পরগণার অধিকাংশ জমিদারির মালিক হন।

নারায়ণপুর : ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের টোডরমলের আসলি তুমার জমাতে সায়ের পাওনাসহ এই পরগণার রাজস্ব ছিল মোট ২৩,৫১৯ টাকা। এতে ধারণা হয় যে, সম্রাট শেরশাহের আমলে এই পরগণার সৃষ্টি হয়েছিল।

দে বংশীয় কায়স্থ রামদেব ও কামদেব নামক দুই ভ্রাতা এই পরগণা ও বোয়ালিয়ার আদি জমিদার ছিলেন এবং তাঁদের বংশধরগণ এ জমিদারি বহুকাল ধরে ভোগ করেন বলে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন (রাজমালা ৪২৭পৃ.)। এর পরে এই জমিদারির বেশ কিছু অংশ এক মুসলমান জমিদারের অধিকারে আসে। আগা সাদেকের পৌত্রীয় স্বামী মীর্জা হোসেন আলী ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং তিনি ওয়ারিস সূত্রে নারায়ণপুর পরগণার একাংশের মালিক হন এবং বেশির ভাগ সময় তিনি সেখানেই সাধন-ভজনে লিপ্ত থাকতেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, তিনি ছিলেন শেখ দারার দৌহিত্র। তাঁর ও অন্যান্য মুসলমান জমিদারদের সম্পত্তি কিছুকাল পরে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়।

সিংহের গাঁও : ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত রাজা টোডরমলের তুমার জমাতে এ পরগণাকে সেখের গাঁও বলা হয়েছে এবং এর রাজস্ব ছিল ৩৪০৩৬৫ দাম। আর ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের তালিকায় এর রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১৪৩৯৭ টাকা। কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই জমিদারির ইতিহাস যা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ : মোঘল সুবাদার মানসিংহের অনেক অনেক আগে রাজা মানসিংহ নামক এক ব্যক্তি সিংহের গাঁয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন রাজা শ্রীনাথ লস্কর। শ্রীনাথের চার পুত্র, মহেশচন্দ্র, রামচন্দ্র খাঁ, রাজা নিশ্চিন্তচন্দ্র মৌলিক ও রাজা প্রসন্নচন্দ্র মৌলিক। এঁদের জমিদারি বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং দুই আনা এগার গণ্ডা অংশের মালিক এবং রূপসা গ্রামে বসবাসকারী এ বংশের যে জমিদার ছিলেন তিনি কোনো কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন। রূপসার বর্তমান জমিদার পরিবার সেই বংশের দৌহিত্র বংশ। তাঁরা কালক্রমে এ পরগণায় আরও বহু অংশ কিনে নেন এবং এ পরগণার প্রধান জমিদার হিসাবে পরিচিত হন। সিংহ বংশীয় অন্যান্য জমিদার কালক্রমে তাঁদের জমিদারি হারিয়ে ফেলেন। করৈতলীর বসু জমিদারগণ সিংহ বংশের একটি শাখা থেকে উদ্ভূত।

কৈলাস চন্দ্র সিংহ যে বর্ণনা দিয়েছেন, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে মনে হয় যে, মোগল আমলের সামান্য আগে জনৈক মানসিংহ কর্তৃক একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর পুত্র যে মুসলমান আমলের একজন সেনা বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন, তা তাঁর লস্কর উপাধি থেকেই বোঝা যায়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জমিদারির প্রায় ৪.৫ আনা অংশ সরকার বাকির দায়ে খরিদ করে নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি রূপসা পরিবার ও অন্যান্যদের অধীনে ছিল।

www.pathagar.com

মহবতপুর : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ পরগণা সিংহের গাঁও পরগণায় অংশ ছিল এবং সেই পরগণার কিছু অংশ, বরদীয়া ও বোয়ালিয়া পরগণা নিয়ে এই পরগণার সৃষ্টি হয় ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের আগে। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত রাজস্ব তালিকায় এর রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৬৪৫৬ টাকা। ঢাকা নিবাসী শেখ সাহেব নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ পরগণার জমিদারি লাভ করেন। তাঁর বংশধরগণ ঢাকায় অবস্থানরত থেকেই এ জমিদারি ভোগ করেন এবং প্রধান কর্মচারীদেরকে নগদ মাইনের পরিবর্তে এক এক বৃহৎ তালুক প্রদান করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে এসব তালুক তাঁদের নামেই খারিজ হয়ে যায়। 'আঁধার মানিকের ব্রাহ্মণ বংশীয় হরি নারায়ণ চৌধুরী, বরদীয়ার দাস মজুমদার, মহবতপুরের রায় মজুমদার, বোয়ালীয়ার দে চৌধুরী, করদীর কর চৌধুরী, আষ্টার বর্ধন মজুমদার, খেরুদিয়ার দে চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের গুপ্তগন ও গোবিন্দিয়ার বসুগণ প্রধান তালুকদার ছিলেন।" [রাজমালা ৪৩৮ পৃ. ।]

টোরা : রাজা টোডরমলের জবানবন্দিতে এ পরগণার নাম তুরা এবং এর বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২৬২২ টাকা (১০৪৯১০ দাম)। এতে মনে হয় যে, এ পরগণা শের শাহের সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের তালিকায় এ পরগণার রাজস্ব ধরা হয়েছিল ১৪৩৮১ এবং ইবরাহীমপুর নামক আর একটি পরগণা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরগণা সৃষ্টির পর থেকেই এটি ঢাকা নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের জমিদারি ছিল। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে খালসা রাজস্ব ১৩,২১২ টাকা ও জায়গীর রাজস্ব ১,০৮৮ টাকা ছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মোট রাজস্ব ছিল ৪৯,৫৮৮ টাকা।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে টোরা ও ইবরাহীমপুর পরগণার জমিদার (মেঘনার পূর্বদিকে অবস্থিত) রসুল কাসেম সুফিয়া (Russel Kassim Shuffia, to east of Migna) ছিলেন বলে জেম্‌স গ্রান্টের পঞ্চম রিপোর্ট থেকে জানা যায়। রসুল কাশেম ও সুফিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার গোলাম নবী যে এ জমিদারির মালিক ছিলেন, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি ১১৯১ হিজরি (১৭৭৭ খ্রি.) নারায়ণগঞ্জ কদম রসুলে ইমারত নূতন করে তৈরি করেছিলেন বলে একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে। তাঁর চার পুত্র ছিল এবং তাঁদের নাম ছিল (১) গোলাম আলী, (২) গোলাম মোস্তফা, (৩) গোলাম মোহাম্মদ ও (৪) গোলাম রসুল। তাঁরা এ জমিদারি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত ভোগ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জমিদারির ১$\frac{৩}{৪}$ আনারও বেশি অংশ নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এরপরে এ জমিদারি আদি মালিকদের হস্তচ্যুত হয়ে নতুন মালিকের অধিকারে আসে।

কাদবা, আমিরাবাদ ও বেদরাবাদ : কৈলাস চন্দ্র সিংহ রাজমালা গ্রন্থে (৪৩৭ পৃ.) এ তিনটি পরগণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, দিল্লির সম্রাটের পুত্র (আজিমউশ-শান?) ছত্র মাণিক্যের (নক্ষত্র রায়) পুত্র উৎসর রায়কে এ তিনটি পরগণা দান করেছিলেন। এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়। কারণ, ১১৩৫ (১৭২৮ খ্রি.) সালের তুমার জমাতে উৎসর রায়ের পুত্র রাজা বিজয় নারায়ণ রায়কে এ পরগণাগুলির মালিক হিসাবে পাওয়া যায়। সে সময়ে পরগণা তিনটির রাজস্ব ছিল ৯৯২৬ টাকা।

www.pathagar.com

পরে এই জমিদারির সামান্য অংশ ছাড়া বাকি অংশ উৎস রায়ের বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়। তখন মহারাজ কাশিচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের ম্যানেজার মিঃ কোরজন প্রথমে এই জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। পরে কলিকাতা নিবাসী মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা এটি ক্রয় করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। খুব সম্ভব জমিদারি প্রথা বিলোপ পর্যন্ত এই পরিবারের অধীনেই এই জমিদারি ছিল।

করদী : কর বংশীয় কায়স্থগণ এ পরগণার আদি জমিদার ছিলেন বলে কৈলাস চন্দ্র সিংহ রাজমালা গ্রন্থে (৪২৬পৃ.) বলেছেন। এর পরে ব্রাহ্মণ চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ এর মালিক হন এবং আরও পরে জমিদারিটি তাঁদের অধিকারচ্যুত হয় এবং পরগণাটি তখন একটি তপে হিসাবে মহবতপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজা টোডরমলের তুমার জমাতে এই পরগণার উল্লেখ আছে এবং এর রাজস্ব ছিল তখন ৮৯৫৯০ দাম। ১৭২৮খ্রিস্টাব্দের তুমার জমাতে এর রাজস্ব ছিল ৩০৫৮ টাকা। এ পরগণা শেরশাহের আমলে সৃষ্ট হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে সম্পূর্ণ পরগণা নিলামে বিক্রি হয়ে যায়।

পুরচণ্ডী : *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে পুরচণ্ডী পরগণার রাজস্ব ধরা হয়েছিল ১২০১০০ দাম অর্থাৎ ৩০০২ টাকা ২০ দাম। ধারণা করা যায় যে, এ পরগণা শেরশাহের আমলে সৃষ্ট হয়েছিল। ১৭২৮ সালের তুমার জমাতে এর রাজস্ব ধরা হয়েছিল ৪১০২ টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে প্রস্তুত পরগণা তালিকায় পুরচণ্ডীর রাজস্ব ৫৮৯৮ টাকা ছিল বলে দেখা যায়। কৈলাস চন্দ্র সিংহের মতে (রাজমালা ৪২৪পৃ.) 'কায়স্থ কুল জাত দে বংশীয় পুরন্দর' এ পরগণার আদি জমিদার ছিলেন। চণ্ডীপ্রসাদ ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই দুই ভাইয়ের নামের আদি অংশ (পুরন্দরের 'পুর' এবং চণ্ড প্রসাদের 'চণ্ডী') নিয়ে নাকি এই পরগণার নামকরণ করা হয়েছিল। শ্রীপুরের বিখ্যাত ভূঁইঞা কেদার রায় পুরন্দরের কন্যাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলে শ্রীপুর ত্যাগ করে দু'ভাই মেঘনার পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৈলাস বাবু বর্ণিত এ ঘটনা কতটুকু সত্য, তা বলা কঠিন। চাঁদ রায়-কেদার রায় সম্রাট আকবরের সমসাময়িক লোক। সেক্ষেত্রে পুরচণ্ডী পরগণার সৃষ্টি আকবরের রাজত্বের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়। অথচ, শেরশাহের তালিকা অবলম্বনে আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত পুরচণ্ডী পরগণা যে শেরশাহের আমলে সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই পরগণার নয় আনা অংশ পুরন্দরের ও সাত আনা অংশ চণ্ডীপ্রসাদের সন্তানগণ পেয়েছিলেন বলে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেছেন। এই পরগণার জমিদারদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে এই জমিদারির $^{১}/_{৪}$ অংশ খালসা ভূমি ছাড়া বাকি অংশ ১৮৩৬-৮০ সালের মধ্যে নিলামে বিক্রি হয়েছিল বলে সরকারি দলিলপত্রে জানা যায়।

চাঁদপুর : ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত টোডরমলের তুলমার জমাতে চান্দপুর নামক ১,২০,০০০ দাম অর্থাৎ ৩০০০ টাকা বার্ষিক রাজস্বের একটি পরগণার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী রাজস্ব তালিকায় পরগণা হিসাবে এর উল্লেখ দেখা যায় না। এই

www.pathagar.com

পরগণা সম্পর্কে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন, "তৎকালে চাঁদপুর একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। দেশীয় বণিকগণ এ স্থানে বাণিজ্যার্থে সম্মীলিত হইতেন। সেই চাঁদপুর এক্ষণে মেঘনা গর্ভে শায়িত রয়েছে।"

কাসিমপুর, মাছুয়া খালা ও ইকতাদপুর : টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় এ তিনটি পরগণার নাম নেই। তবে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব তালিকায় কাসিমপুর-মাছুয়া খাল পরগণার রাজস্ব ২,৯৪৮ টাকা এবং ইকতাদপুরের রাজস্ব ২,৭৩৭ টাকা ছিল বলে দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে) এ তিনটি পরগণাকে মিলিতভাবে এবং এগুলির রাজস্ব ৪,৩৪৩ টাকা ছিল বলে দেখান হয়েছে। পরগণাগুলি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের পরে এবং ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কায়স্থ নাগ বংশীয় চৌধুরীগণ এ তিনটি পরগণার জমিদার ছিলেন বলে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন এবং ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের তালিকায় নরোত্তম নামক যে জমিদারকে দেখা যায়, তিনি এ বংশজাত ছিলেন বলে তাঁর অভিমত। তখন এ পরগণা তিনটির মোট রাজস্ব ছিল ৯,৮৪৪ টাকা। এই জমিদারির বেশির ভাগ পরে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এককালে চৌধুরীরা খুবই পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ১৬টি পরিখাবেষ্টিত এঁদের অট্টালিকা সমূহের ধ্বংসাবশেষ কৈলাস চন্দ্র সিংহ দেখেছেন বলে রাজমালায় উল্লিখিত আছে।

নয়াবাদ : সম্রাট আকবরের পরে এবং ১৭২২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এ পরগণা সৃষ্টি হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে এ পরগণার রাজস্ব ছিল ৩,০৪১ টাকা এবং ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৪,৮২৯ টাকা। 'কায়স্থ শ্যাম চৌধুরীগণ' এ পরগণার আদি জমিদার ছিলেন বলে কৈলাস চন্দ্র সিংহ বলেন। এ বংশে চাঁদ ও গজেন্দ্র নামে দুই ছিলেন এবং চাঁদের পর গ্রামে তাঁরা বাস করতেন। চাঁদের বংশধরগণ উত্তর শাহপুর ও গজেন্দ্রের বংশধরগণ নয়াবাদের অধিকারী হয়েছিলেন। পরে তাঁদের জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। কাসিমপুর-মাছুয়া খালের বিখ্যাত নাগ বংশীয় জমিদারদের একটি শাখা ঢাকা জেলার বারদী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদেরই একজন নয়াবাদ পরগণার জমিদারি ক্রয় করেছিলেন। মতান্তরে বারদীর নাগ বংশীয়গণই এ পরগণার আদি জমিদার এবং তাঁদের পূর্বপুরুষ নয়ানন্দ নাগ ছিলেন আদি জমিদার এবং তাঁর নামানুসারেই এ পরগণার নাম হয়েছিল নয়াবাদ।

ঙ. ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিচয়

ভৌগোলিক অবস্থান ও আয়তন : ২৩০২৯ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩০৪ উত্তর অক্ষাংশ, ৯০০৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০০৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

পরিচিতি : ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুর জেলার ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে খুব প্রাচীন বলা যেতে পারে না। এ জেলার অধিকাংশ ভূ-তাত্ত্বিক গঠন মোটামুটিভাবে সমকালীন। সুতরাং এ জেলার ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস অপেক্ষাকৃত নবীন। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনকেও খুব বেশি জটিল বলা যায় না।

www.pathagar.com

টমা ওয়াটারের মানচিত্রে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলের এ স্থানে তিতাস ও সম্ভবতঃ গোমতী নদী দু'টিরই গতিপথ, আর এর দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্রের অবস্থান দেখানো হয়েছে। সম্ভবতঃ বর্তমান চাঁদপুর জেলার কিয়দংশ এবং নোয়াখালী জেলার পশ্চিমাংশ নিয়েই তখনকার দিনের শ্রীক্ষেত্র গঠিত হয়েছিল। এই নিয়ে মতভেদ আছে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের জীন্ ডি ব্যারোসের মানচিত্রে আমরা প্রথম ট্রপোর অবস্থান লক্ষ্য করি। নদীতীরে অবস্থিত চাঁদপুর জেলা ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ। এই ট্রপোই যে ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চল, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ থাকতে পারে না।

বর্তমান কালের প্লাবন সমভূমি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত ও প্রতি বছর এর দ্বারা সমৃদ্ধ। মোটের উপর প্রাকৃতিক ভূগঠনে নদী প্রাচীনকাল থেকেই অবদান রেখে আসছে। এ কারণে এখানে নদী-নালার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান নদী প্রবাহ চাঁদপুর জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এগুলি হচ্ছে : ক. জেলার উত্তরাংশে ধনাগোদা-গোমতী প্রবাহ, খ. মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ডাকাতিয়া প্রবাহ, গ. জেলার পশ্চিম সীমান্ত এলাকা ঘেঁষে প্রবাহিত মেঘনা নদী। এগুলির মধ্যে গোমতী, ডাকাতিয়া মেঘনা প্রবাহেই শেষ হয়েছে। মেঘনা নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এ সমস্ত নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অনেকগুলি খাল-বিল। উপ-নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বড় খালগুলির অনেকটাই বর্তমানে কৃত্রিম হলেও এককালে এগুলি ছিল কোনো না কোনো মরা নদীর খাত।

প্রাকৃতিক বিভাগ

ভূ-তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক নিয়ামকগুলি বিশ্লেষণ করে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তার উপর ভিত্তি করে এ জেলাকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হচ্ছে, (ক) লালমাইর সমভূমি (Lalmai Deltaic Plain), (খ) চান্দিনা সমভূমি (Chandina Deltaic Plain) ও মেঘনা প্লাবন সমভূমি (Meghna Flood Plain)।

(ক) লালমাইর সমভূমি : উত্তরে শ্রীহট্ট জেলার সাহাজি বাজার থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে নোয়াখালী ও কুমিল্লা প্রায় সীমান্তে অবস্থিত দত্তসার নামক স্থান পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের পশ্চিম দিক দিয়ে একটি রেখা টানা যায়, তবে সেই রেখার পূর্ব দিকের স্থান লালমাই সমভূমির অধীনে পড়বে। সাহাজি বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে এই রেখা দক্ষিণে ইটাখোলার পাশ দিয়ে মাধবপুরের বেশ পূর্বদিক দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় নিয়ে মুকুন্দপুরের অনেক পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে সিঙ্গার বিল, আখাউড়া ও গঙ্গাসাগরকে বাম পাশে এবং কসবাকে ডান পাশে রেখে লালমাইর-ময়নামতি পাহাড়ের ডান পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে দীঘল গাঁওয়ের কাছ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বাঘমারার কাছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়ে দত্তসারে শেষ হয়েছে।

(খ) চান্দিনা সমভূমি : লালমাই সমভূমির পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত চান্দিনা সমভূমি লালমাই সমভূমির প্রায় সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করছে। উত্তরে নাসিরনগর থানার পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে উত্তর-দক্ষিণে একটি রেখা টানলে সেই রেখা নাসিরনগর থানাকে

www.pathagar.com

বাম পাশে রেখে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। প্রাচীনকালে এ সমভূমি ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিতাস প্রভৃতি নদীর পলি দ্বারা গঠিত হয়। পরে ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদী গতি পরিবর্তন করে অনেক পশ্চিমে সরে যায় এবং তিতাস নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বর্তমান অবস্থার আগে এখানে একটি পলি-প্লাবন সমভূমি গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে পরিত্যক্ত নদীর উঁচু পাড় প্রাকৃতিক কারণে মিলে গিয়ে প্রায় সমভূমিতে পরিণত হয়েছে।

(গ) মেঘনা প্লাবন সমভূমি : চান্দিনা সমভূমির পশ্চিম পাশ থেকে মেঘনা নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত প্রায় সমান্তরাল রেখায় এই সমভূমি অবস্থিত। নাসিরনগর থানার কিছু অংশ, নবীনগর থানার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ, বাঞ্ছারামপুর থানার সমগ্র অংশ, মুরাদনগর থানার পশ্চিমাংশ, হোমনা থানার সমুদয় অংশ, দাউদকান্দি ও মতলবগঞ্জ থানার বেশিরভাগ অংশ ও চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ থানার প্রায় সমগ্র অংশ নিয়ে এই বিভাগ গঠিত। মেঘনা, ভাকাতিয়া ও ধনাগোদা নদী কর্তৃক বাহিত পলি ও কর্দম দ্বারা এই বিভাগ গঠিত।

এর কোনো কোনো অংশ কিছুটা প্রাচীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবীনগর থানার বেশ কিছু অংশ, বাঞ্ছারামপুর থানার সামান্য কিছু অংশ, মুরাদনগর থানার সামান্য কিছু অংশ ও দাউদকান্দি থানার কিছু অংশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাকি অংশ অপেক্ষাকৃত নবীন। এখানে এমন এলাকা আছে, যেখানে ভাঙ্গাগড়ার কাজ এখনও চলছে। মেঘনা নদী নতুন নতুন ধারায় বইছে।

মেঘনা প্লাবন সমভূমির প্রায় সবটাই অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি। প্রায় সমগ্র অঞ্চল ৫ থেকে ২৫ ফুট পানির নিচে চলে যায় বর্ষাকালে। জেগে থাকে শুধু গ্রামগুলি। মাটি ভরাট করে গ্রামগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্ষাকালে চারদিকে জলবেষ্টিত গ্রামগুলিকে দ্বীপের মত দেখায়। অতি প্লাবনে সেসব গ্রামও অনেক সময় পানির নিচে চলে যায়।

চ. নৃতাত্ত্বিক ও বর্ণভিত্তিক বিবরণ

বাঙালি এক সংকর জাতি। চাঁদপুর জেলার অধিবাসীদের সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ চাঁদপুর জেলার একজন দীর্ঘদেহী ও সুন্দরদেহী ও সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট মানুষকে যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, তার উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, কি তারও কিছু বেশি। তার মাথাটি লম্বা ধরনের (Dolichocephalic) হলেও গোলের দিকে (meso-cephalic) বেশ ঝোঁক আছে। তার কপাল উন্নত হলেও উপরের দিকে ক্রমাবনত কিন্তু ভ্রুযুগল সুগঠিত। আয়ত চক্ষু দু'টির রঙ কালো। নাকটি লম্বা ও খাড়া এবং নাসারন্ধ্র সংকীর্ণ (lepto-rhine nose)। ঠোঁট দুটি বেশ পাতলা এবং মুখের ফাঁক সংকীর্ণ। তার চিবুক হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে এবং চোয়ালের হাড় অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার বাহু দু'টি বেশ দীর্ঘ এবং হাতের আঙ্গুলগুলি দীর্ঘ ও সামনের দিকে সরু। তার মাথার উপরে ঢেউ খেলানো বা প্রায় কোঁকড়ান যে চুল আছে, সেগুলির রঙ ঘনকৃষ্ণ। তার দাঁড়ি-গোঁফ যা আছে, তা অতি সামান্য। তার গাঁয়ের রঙ ঘোর কালো। তার দেহে লোম নেই বললেও চলে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, আদি নর্ডিক, ভেড্ডিড, আলপাইন বা ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গলীয়, এমন কি নিগ্রো নরগোষ্ঠীর রক্তধারার সমন্বিত প্রভাব তার দেহের মধ্যে স্থান পেয়েছে। তবে নর্ডিক ও ভেড্ডিড রক্তধারার প্রভাবই বেশি।

www.pathagar.com

তার একজন অতি নিকট আত্মীয়, তার আপন চাচাত বা খালাত ভাইকে যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, তার উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন কি চার ইঞ্চির বেশি নয়। তার মাথাটি একদম গোলাকার (mesocephalic) এবং ললাট বেশ উন্নত। নাকটি লম্বা এবং উঁচু হলেও বেশ মাংসল এবং নাসারন্ধ্র বেশ স্ফীত। ঠোঁট দু'টি বেশ মোটা এবং মুখের ফাঁক বেশ বড়। চিবুক ও চোয়ালের হাড় বেশ সুগঠিত। তার সারা গায়ে অজস্র লোম আছে এবং সারা মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফ। মাথাভর্তি কালো চুলগুলি কোঁকড়ান বা ঢেউ খেলান। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। এতে দেখা যাবে যে, হোমোআলপিনাস বা ভূমধ্যসাগরীয় মানুষের রক্ত ধারার প্রভাব তার মধ্যে বেশি থাকলেও আদি নর্ডিক, ভেড্ডিড ও মোঙ্গলীয় রক্তধারার কিছু কিছু প্রভাবও তার মধ্যে আছে।

আবার তারই একজন নিকটতম আত্মীয়কে যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে, তার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। কাল কোঁকড়ান চুলে ভর্তি মাথাটি বেশ লম্বা (dolichocephalic)। চোখ দু'টি বেশ ছোটো। নাকটি ছোটো ও চ্যাপ্টা এবং নাসারন্ধ্র বেশ স্ফীত। ঠোঁট দু'টি পাতলা ও মুখের ফাঁক মাঝারি ধরনের। এতেই বোঝা যায় চাঁদপুর জেলার অধিবাসীরাও সংকর জাতিভুক্ত।

ছ. নদ-নদী

মেঘনা নদী : মেঘনা নামে কোনো স্বতন্ত্র নদী কোথাও উৎপন্ন হয়নি। ভারতের আসাম ও মেঘালয় পর্বতসমূহ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদী শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে কুমিল্লা জেলায় প্রবেশ করেছে। এসব নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুশিয়ারা, সুরমা, বওলাই, মোগরা ও মনু। ভৈরবের পরে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের মৃতপ্রায় একটি প্রবাহ মেঘনায় এসে মিশেছে। এরপর মুন্সীগঞ্জের নিকট লক্ষ্যা নদীর (প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রেরই আর একটি শাখা) স্রোত এসে মেঘনায় মিশেছে। চাঁদপুরের উত্তরে পদ্মা (গঙ্গা) এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভৈরবের পরে মেঘনা নদী পশ্চিম-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলা ও কুমিল্লা জেলার এবং পরে প্রায় দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুর ও শরীয়তপুর জেলার সীমারেখা নির্দেশ করেছে। এর পরে মেঘনার গতিপথ দক্ষিণ-পূর্বমুখী চাঁদপুর জেলা অতিক্রম করে নোয়াখালী ও ভোলা জেলার সীমারেখা নির্দেশ করে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

মেঘনা একটি বিরাট নদী। এর বিরাটত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, যেসব নদী মিলে এ নদীর সৃষ্টি করেছে, সেগুলি সংখ্যাই শুধু অধিক নয়, এগুলি বর্ষাকালে প্রচুর বারিপাতের জন্য প্রবল জলধারাও সৃষ্টি করে। আসাম ও মেঘালয় প্রভৃতি পার্বত্য এলাকার অসংখ্য উপনদী এসে মিশে সেসব নদীকে আরও প্রবল করে তোলে। মেঘনার সৃষ্টিকারী এ সব নদী শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলায় হাওর নামে পরিচিত এক বিরাট নিম্নভূমিতে এসে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ এক সাগরের সৃষ্টি করে এবং পরে আশুগঞ্জ ও ভৈরব বাজারের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন এর স্রোতধারা বেড়ে যায় স্বাভাবিক কারনেই। বর্ষাকালে মেঘনার জলধারার পরিমাণ প্রায় ৪,০০,০০০ কিউসেক, কিন্তু শীতকালে তা কমে গিয়ে মাত্র ৯৫,০০০ কিউসেকে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

মেঘনার পানি অতি স্বচ্ছ ও সুপেয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, যেসব নদী দ্বারা মেঘনার জলধারা সৃষ্ট, সেগুলি যে অঞ্চলে উৎপন্ন হয়েছে এবং যেসব স্থান দিয়ে এগুলি প্রবাহিত হয়েছে, সেসব স্থানে ক্রিস্টাল শিলা ও সিলিকার প্রাধান্য দেখা যায়। ফলে পানিতে পলি জাতীয় পদার্থ তুলনামূলক কম থাকে। তদুপরি পূর্বে উল্লিখিত হাওর এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে নদীগুলির স্রোতধারা প্রায় নিশ্চল ও শান্ত রূপ ধারণ করে। তখন পানির মধ্যস্থিত পলিগুলি নিচে পড়ে যায় এবং পানি স্বচ্ছ হয়ে যায়। মেঘনার পানিতে পলি কম থাকে বলে যে অঞ্চল দিয়ে এ নদী প্রবাহিত, সেখানকার নিম্নভূমি ভরাট হতে অনেক সময় লাগে।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রুক (Von Den Broucke) যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে, মেঘনার বর্তমান প্রবাহ ছাড়া আরও একটি বিশাল ধারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ দিক থেকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে ফেণীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

চাঁদপুরের উপর দিয়ে দেশের ৯০ ভাগ নদ নদীর পানি বঙ্গপোসাগরে প্রবাহিত হয়। ফলে মেঘনা মোহনা বর্ষার এই সময়টাতে হয়ে উঠে ভয়ংকর।

গোমতী নদী : ত্রিপুরা রাজ্যে তিচ্না উর্ধ্ব ভাঁজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুমিল্লা শহরের ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত বিবির বাজারের নিকট এটি কুমিল্লা জেলায় প্রবেশ করেছে। কুমিল্লা থেকে জাফরগঞ্জ, দেবীদ্বার, কোম্পানিগঞ্জ ও মুরাদনগর পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম মুখে এবং মুরাদনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে গোমতী নদী দাউদকান্দির নিকট কলাতিয়া নামক মেঘনার একটি শাখার মধ্যে পড়েছে। দাউদকান্দি ও কলাতিয়া উর্ধ্ব ভাঁজের মধ্যবর্তী এলাকায় এর মোহনা অবস্থিত বলে নদীটির মোহনা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বর্ষায় নদীটি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রচুর পানি বহন করে এনে এ জেলায় প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি করত। বেশ কিছুকাল আগে থেকেই নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে কুমিল্লা শহর ও শহরের পশ্চিম দিকের কৃষি-ভূমি বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা হচ্ছে। তবে নদীটি প্রচুর পলিমাটি বহন করে আনে এবং বাঁধের কারণে দুই তীরের কৃষিক্ষেত্রে ছেড়ে দিতে না পেরে সেই পলি নদীবক্ষেই নিক্ষেপ করে। এ কারণে নদীর গভীরতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ফলে প্রায়ই বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে হয়। জেলার সমভূমি অঞ্চলেই মাতারা, মারিচা প্রভৃতি নদী গোমতীতে এসে মিশেছে।

সাধারভাবে পরিচিত গোমতীর এ ধারা ছাড়াও আরও একটি জলস্রোত গোমতী নামে পরিচিত। মেঘনার কলাতিয়া শাখার সঙ্গে গোমতী যেখানে মিশেছে, সেই মিলিত স্রোত মাইল দুই-এক দক্ষিণে এবং দাউদকান্দি থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে মেঘনায় গিয়ে পড়েছে। সেই বাঁকের মুখে ধনাগোদা নামক একটি শাখার সৃষ্টি করেছে। সেই ধনাগোদা শাখা নদীটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে বেশ কয়েক মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর বোয়ালজুরি নামক একটি খালে এসে মিশেছে। এ খাল হাজীগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে ধনাগোদার সঙ্গে মিশেছে। মতলব বাজারের উত্তরে ধনাগোদা অনেক বাঁকের সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

মতলবের পশ্চিমে ও চাঁদপুরের উত্তরে মূল মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মতলব বাজারের পশ্চিমে এটি গোমতী নামে পরিচিত। এতে মনে হয় যে, মেঘনার কলাতিয়া শাখা সৃষ্ট হবার আগে গোমতী নদী দাউদকান্দিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে বেষ্টন করে বর্তমান ধনাগোদার খাত দিয়ে মেঘনায় পতিত হত।

রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, মেঘনা নদীর প্রধান ধারা বর্তমান কলাতিয়া খাত দিয়েই প্রবাহিত হত এবং গোমতী নদী দাউদকান্দির পূর্বদিকে মেঘনাতে পতিত হত। কিন্তু মেঘনা নদীর সঙ্গে মিশে গিয়ে তা দাউদকান্দির পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে পূর্বদিক দিয়ে একটি স্বতন্ত্র স্রোত বজায় রেখে মতলবগঞ্জের উত্তরে মেঘনার আরও কয়েকটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনাতে পতিত হত। চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সঙ্গে মেঘনার মিলনের আগে খুব সম্ভব এটিই ছিল গোমতীর সর্ব দক্ষিণ দিকের গতিধারা।

ধনাগোদা কোম্পানিগঞ্জ পর্যন্ত বর্তমান ধারায় প্রবাহিত হয়ে বর্তমান নদী ও সিদ্ধেশ্বরী খালের গতিপথে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে কালা ডুমুরিয়া খালের গতিপথে ইলিটগঞ্জ অতিক্রম করে দক্ষিণ মুখে কিছদূর অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী গতি ধারণ করে বোয়ালজুরি খালের গতিপথে প্রথম ধারার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

অপর ধারা কোম্পানিগঞ্জের কিছু পশ্চিমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে একটি বর্তমানে নাম না জানা ক্ষীনকায়া নদীর গতিপথ ধরে দাউদকান্দির পশ্চিম দিকে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত না হয়ে ধনাগোদা নদীর পথ ধরে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বোয়ালজুরি খালের সাথে মিলিত হতো।

ডাকাতিয়া নদী : কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এ নদীর উৎপত্তি স্থল ছিল, বলা যেতে পারে। এ নদী কুমিল্লা জেলায় প্রবেশ করে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ধারা দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে ছোটো ফেণী নাম ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় ধারাটি লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বাগমারা নামক স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে গিয়ে পরে দক্ষিণমুখী গতি ধারণ করে লাকসাম হয়ে চিতোষীর পূর্বদিকে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়ে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম মুখে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। হাজীগঞ্জ থেকে অসংখ্য বাঁকের সৃষ্টি করে পশ্চিম দিকে চাঁদপুর পর্যন্ত গিয়ে চাঁদপুরের পশ্চিমে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আগে ডাকাতিয়া চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় না পড়ে চাঁদপুরের কিছু পূর্বে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে অসংখ্য বাঁকের সৃষ্টি করে ফরিদগঞ্জ থানা ও নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানা হয়ে দক্ষিণ দিকে মেঘনা নদীতে গিয়ে পড়ত। দক্ষিণ দিকের এ ধারাটি এখন বেশ ক্ষীণ। ১৮৭২ সালে চাঁদপুর শহরের দক্ষিণ দিকে একটি খাল কেটে মেঘনার সঙ্গে ডাকাতিয়াকে যোগ করা হয়। ফলে এটিই ডাকাতিয়ার প্রধান ধারা হয়ে পড়ে।

চান্দিনা থানার বড় খাল এবং সেই খালের সঙ্গে সংযুক্ত দক্ষিণ দিকের কার্জন খাল লাকসাম ও চিতোষীর মধ্যবর্তী স্থানে ডাকাতিয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের আরও কয়েকটি খাল ডাকাতিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আছে। লালমাই পাহাড়ের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত গুঙ্গিয়া-জুড়ি ছড়া এই পাহাড়ের কয়েক মাইল দক্ষিণে

www.pathagar.com

ডাকাতিয়ার সঙ্গে মিশেছে। ডাকাতিয়া নদীর দৈর্ঘ্য-২০৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশের কুমিল্লা, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই নদী। নদীটি ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে কুমিল্লা-লাকসাম চাঁদপুর হয়ে মেঘনা নদীতে মিশেছে। যা লক্ষ্মীপুরের হাজিমারা পর্যন্ত বিস্তৃত। চাঁদপুর থেকে এই ডাকাতিয়া নদী যোগ হয়েছে কুমিল্লার গোমতীর সঙ্গে, যা ২৩০.২০ অক্ষাংশে এবং ৯১০.৩১ দ্রাঘিমা বিস্তৃত। নদীটি বামদিকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ফেনী নদীতে মিশেছে।

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। এটি হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মার সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৫৭১ ফুট (৪৭৯ মিটার) এবং গড় গভীরতা ৯৬৮ফুট (২৯৫ মিটার)।

রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। উৎপত্তিস্থল হতে ২২০০ কিলোমিটার দূরে গোয়ালন্দে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মিলিত প্রবাহ পদ্মা নামে আরো পূর্ব দিকে চাঁদপুর জেলায় মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। সবশেষে পদ্মা-মেঘনার মিলিত প্রবাহ মেঘনা নাম ধারণ করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়।

জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় : হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৮৫ সালে দানবীর জনাব হাসান আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব হাসান আলী লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছিল। তাই স্কুলটির নাম হাসান আলী জুবলী উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এটি সরকারি হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। জমিদার আহমেদ রেজা চৌধুরী এখানে একটি মুসলিম ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। সেখানেই বর্তমানে চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ রয়েছে।

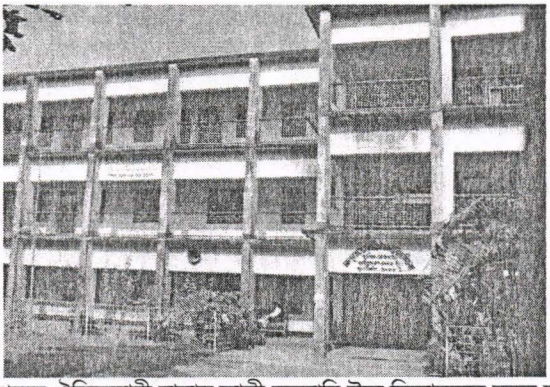

চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন

www.pathagar.com

চাঁদপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ : চাঁদপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সারাদেশে একটি সুপরিচিত কলেজ। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ১৫ জুন ১৯৪৬ সালে কলেজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি শাখা হিসাবে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাযুদ্ধের পরই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ার শাখাটি চাঁদপুর কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী। বর্তমানে এ কলেজ হতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মিহির লাল সাহা। কলেজটির সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩টি আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে। ১. ছাত্রদের জন্য জিয়া ছাত্রাবাস ও শেরে বাংলা ছাত্রাবাস ২. ছাত্রীদের জন্য শেখ হাসিনা ছাত্রীনিবাস।

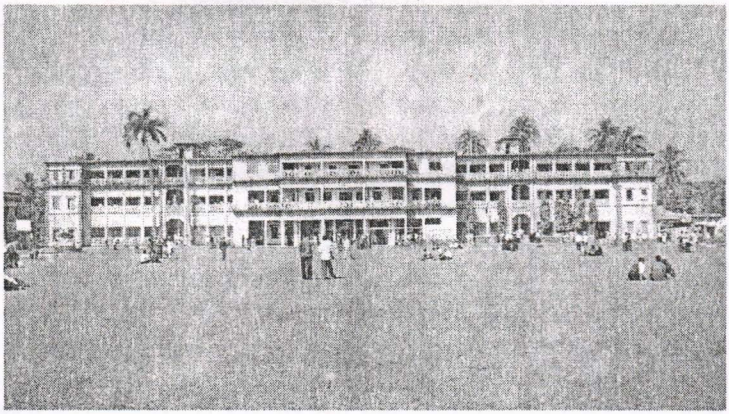

চাঁদপুর সরকারি কলেজের দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাস ও ভবন

ঝ. জেলার ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক নির্দশন সমূহ

পুরাকীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

চাঁদপুর-এর কচুয়া, হাজীগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশ ও শাহরাস্তি উপজেলার মেহের শ্রীপুর অঞ্চলটি সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলার সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ্-এর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৩৪৯) দেওয়ান ফিরুজ খান লস্কর এর খনন করা দীঘির পশ্চিম পাড়ে ৭৭৫ হিজরিতে একটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। এ মসজিদই সম্ভবত বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার সর্ব প্রাচীন মসজিদ। এটি হাজীগঞ্জ উপজেলার সামান্য উত্তরে পিরোজপুর গ্রামে অবস্থিত। চাঁদপুর জেলার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাজীগঞ্জ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হাজী মনিরুদ্দিন শাহ (মনাই গাজী) এর হাজী দোকান এর সুখ্যাতিতে গড়ে উঠা বাজার থেকে হাজীগঞ্জ শব্দের উৎপত্তি ঘটে। জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হাজীগঞ্জে অবস্থিত ঐতিহাসিক বড় মসজিদ স্থাপিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ খ্রিঃ)। হাজীগঞ্জের ৬ মাইল পশ্চিমে অলিপুর গ্রাম। এ

www.pathagar.com

গ্রামে দুটি প্রাচীন মসজিদ আছে। একটি শাহ সুজার আমলে নির্মিত সুজা মসজিদ। অপরটি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত আলমগীর মসজিদ। এটি নির্মাণ করেছিলেন ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে মোঃ আবদল্লাহ। আলীগঞ্জের মাদা্হ খাঁ নামের এক দরবেশের নামে ১৭৩৮ খ্রিঃ স্থাপিত হয় বর্তমান মাদা্হ খাঁ মসজিদ। ১৩৫১ সালে মেহের শ্রীপুর অঞ্চলে এসেছিলেন বিখ্যাত আউলিয়া হযরত রাস্তি শাহ। ১৩৮৮ খ্রিঃ তিনি ইন্তেকাল করেন। মেহের শ্রীপুর-এ তাঁর মাজার অবস্থিত। বিখ্যাত হিন্দু সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর এ মেহেরেই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সিদ্ধি লাভের স্থানটিতেই গড়ে উঠেছে মেহের কালীবাড়ী। হযরত রাস্তি শাহ্ এর নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় শাহরাস্তি। এটিই এখন শাহরাস্তি উপজেলা নামে পরিচিত। চাঁদপুর শহরের ৬ মাইল পূর্বে শাহতলী গ্রামটি বাগদাদ থেকে আগত দরবেশ শাহ মোহাম্মদ সাহেবের নাম থেকে হয়েছে। তিনি সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ধর্ম প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি সুলতানের নিকট থেকে জমি লাভ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চাঁদপুর মহকুমার প্রথম মঠ স্থাপিত হয়েছিল বাবুরহাটের কাছে বর্তমান মঠখোলায়। বাবুর হাট তখনও স্থাপিত হয়নি। নাসিরকোট গ্রামটি হাজীগঞ্জ উপজেলা সদর হতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নবাব সিরাজ-উদ দৌলার সময় কচুয়া থানার আলীয়ারায় ক্ষত্রীয় রাজা অযোধ্যারাম ছেদ্দা নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তাকে দমনের জন্য সেনাপতি নাসির খানকে প্রেরণ করেন। নাসির খান এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। যুদ্ধে ছেদ্দা পরাজিত ও নিহত হন। কোট অর্থ দুর্গ। তাই নাসির খানের দূর্গের জন্যই এই গ্রামের নাম হয় নাসিরকোট। ১৮৮২ সালে ঢাকা নবাবদের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় চাঁদপুর শহরের প্রথম মসজিদ বেগম মসজিদ। হাজীগঞ্জের লক্ষী নারায়ন জিউর আখড়া স্থাপিত হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ। চাঁদপুর কালীবাড়ী স্থাপিত হয় ১৮৮৩ খ্রিঃ। ১৮৮৫ সালে আসাম বেঙ্গল রেলপথের চাঁদপুর শাখা নির্মিত হয়। পরে আই.জি.আর.এস.এন কোম্পানির ষ্টিমার ঘাট স্থাপিত হয়। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সারা ভারতে চাঁদপুরের পরিচিতি ছিল। এটি ছিল পাট ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র। চাঁদপুরকে এক সময় বৃটিশ ভারতের গেটওয়ে টু ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া বলা হতো। চাঁদপুর জেলার চালিতাতলীর এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট এ জেলার সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জি.পি ওয়াইজ মেঘনা তীরবর্তী শ্রীরামদী- ব্রাহ্মণচর, নাছিমপুর, ভড়ঙ্গারচর এবং আকানগর নামক স্থানগুলোতে কুঠি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করেছিলেন। ১৮৬৬ সনে এই নীল চাষের পূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু নীল চাষীদের দূর্বার প্রতিরোধের মুখে ১৮৭৩ সালে এ অঞ্চল থেকে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। বেশির ভাগ নীল কুঠি এখন মেঘনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে ফরিদগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জে এখনও কিছু নীল কুঠি আছে। মতলব উপজেলার একটি গ্রামের নাম মতলবগঞ্জ। এটি বৈরাগী বাজার নামে পূর্বে পরিচিত ছিল। প্রায় ১৫০ বছর আগে কিছু বৈরাগী এ জায়গায় বসতি স্থাপন করে এবং তখন পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন এলাকায় আসতে শুরু করে। পরে এ জায়গা বাজার হিসেবে গড়ে উঠে এবং বৈরাগীবাজার নাম ধারণ করে। এভাবে জায়গাটিতে বাজার সৃষ্টি হয় এবং ধনাগোদা নদীর তীরে একটি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর গড়ে উঠে। প্রায় ৮০/৯০ বছর আগে পার্শ্ববর্তী দীঘলদি গ্রামের জনৈক মোতালেব জমাদারের নাম অনুসারে বৈরাগী বাজারকে মতলবগঞ্জ বাজার নামকরণ করা হয়। এভাবে গড়ে উঠা মতলবগঞ্জ বাজার বর্তমানে মতলব উপজেলার উপজেলা হেড কোয়াটার্স।

বাবুরহাট মঠের দেয়ালচিত্র

তিন গম্বুজ মসজিদ

হাজীগঞ্জ উপজেলার কালোচোঁ উত্তর ইউনিয়নের ফিরোজপুর গ্রামে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নসম্পদ। প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৪৪ সালে অর্থাৎ হিজরি ৭৪৫ সনে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ফৌজদার, দেওয়ান ফিরোজ খান লস্কর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট অনুপম সুন্দর মসজিদ ও একটি বিশালাকার দিঘি খনন করেন। ফিরোজ খান লস্করের দাঁড়া নামে একটি নৌপথ তৈরি করেন। যে পথটি বোয়ালজুড়ী খাল হয়ে ধনাগোদা ও ডাকাতিয়াকে সংযুক্ত করেছে।

মেহের কালীবাড়ি : বিখ্যাত হিন্দু সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর শাহরাস্তি উপজেলার মেহের শ্রীপুর অঞ্চলে সিদ্ধিলাভ করছিলেন। সিদ্ধিলাভের স্থানটিতে গড়ে উঠেছে মেহের কালীবাড়ি। প্রতি বছর এই মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মেলা বসে। যতদূর জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ৮ শ' বছর পূর্বে এটি স্থাপিত হয়। বাংলা সন হিসেবে ৬০৯ অব্দ

www.pathagar.com

আনুমানিক। জানা যায় যে, ভারতের বর্ধমানস্থ পূর্বস্থলী গ্রামের অধিবাসী বাসুদেব গঙ্গা তীরে তপস্যা করার সময় অলৌকিক আদেশ পান যে, ''এই স্থানে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে না। তুমি মেহেরপুর গ্রামে মা তারা আশ্রমে গিয়ে তপস্যা কর। সেখানে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে'' আদেশ পেয়ে বাসুদেব শাহরাস্তির মেহেরপুর গ্রামে এসে তপস্যা রত হন। সে সময়ে শিবানন্দ নামে প্রভাবশালী জমিদার বসবাস করতেন মেহেরপুরে। তিনি পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর গ্রামে বাসুদেবের জন্যে বাড়ি তৈরি করে দিলেন। শিবানন্দ তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বাসুদেব মদ্যপান করতেন। শিবানন্দ এই খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলে বাসুদেব অভিশাপ দেন যে, জমিদারের শিরচ্ছেদ হবে। শুনে শিবানন্দের মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরে যান। এদিকে খবর আসে যে, দিঘি খননের সময় দু'দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছে। শুনে শিবানন্দ দেখতে গেলেন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে শিবানন্দের শিরচ্ছেদ হলো। খবর পেয়ে রাণী নিজে ছুটে গেলেন দেখতে। রাণী বাসুদেবের কাছে তার বংশ রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। বাসুদেব রাণীকে সান্তনা দিলেন। বাসুদেবের আশীর্বাদে রাণীর এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। তার মাথায় জট ছিল। তাই তার নাম রাখা হলো জটাধারী।

বাসুদেবের প্রধান শিষ্যের নাম হলো পূর্ণানন্দ। প্রধান শিষ্য পূর্ণানন্দকে সাথে নিয়ে বাসুদেব অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন। অবশেষে এলেন কামাখ্যায়। সেখানে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, স্বর্গীয় দেবতা তাকে আদেশ করে বলছেন যে, তুমি পরজন্মে স্বীয় পৌত্ররূপে জন্ম নিবে এবং তুমি তখন পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করবে। তারপর বাসুদেব সেখানে দেহ ত্যাগ করেন।

কথিত আছে যে, মেহেরপুর গ্রামে তার পুত্রবধূর ঘরে বাসুদেব সর্বানন্দ নামে পুনর্জন্ম লাভ করেন। সর্বানন্দ ছিলেন অত্যন্ত অবোধ ও অশিক্ষিত। ফলে সর্বমহলেই সে ছিলেন অবহেলিত। কিন্তু তিনি ছিলেন গুরু বংশের লোক। একদিন জমিদার সর্বানন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন্ তিথি? সর্বানন্দ বললেন, পূর্ণিমা। কিন্তু সেদিন ছিল অমাবস্যা। কথা শুনে সবাই হাসাহাসি শুরু করলো এবং নানা রকম বিদ্রুপ করলো। রাজা চিরদিনের জন্যে তার প্রাসাদ সর্বানন্দের জন্যে নিষিদ্ধ করলেন। শিষ্যদের এই হেন উপহাসে সর্বানন্দ মনে নিদারুণ কষ্ট পেলেন। তিনি মনের কষ্টে গৃহত্যাগ করলেন। অনেক তীর্থ পরিভ্রমণের পর পৌষ সংক্রান্তির রাতে কালীমাতা তাকে দেখা দিলেন। দেবীর দয়ায় সর্বানন্দের সিদ্ধিলাভ হলো। সেদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তি। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এইখানে পৌষ সংক্রান্তিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা উপলক্ষে মেলা বসে প্রতি বছর। কালীমাতা স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন বলে এখানে কোনো কালীমূর্তি স্থাপন করা হয় না। প্রতি বছর কার্তিক মাসে কালীপূজা হয়, পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে আসে অসংখ্য পুণ্যার্থী, মায়ের পায়ে প্রণতি জানান, মনের বাসনা পূরণের জন্যে প্রার্থনা করেন। কালীগাছের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ভক্তরা সংগীত পরিবেশন করেন। ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হয় চারদিক। ভক্তরা সারারাত ধরে নাচে-গানে আনন্দে মাতোয়ারা হন। এ সময় মানত করে ভক্তরা পাঠা বলি দেন।

www.pathagar.com

মেহার কালীবাড়ির ঐতিহাসিক কালীগাছ

হযরত শাহ রাস্তি ও তাঁর দরগা : চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলাধীন শ্রীপুর গ্রামে হযরত রাস্তি শাহ্ (রঃ)-এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এই মহান ইসলাম প্রচারক রাস্তি শাহ্ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাঁর জন্ম ইরাকের বাগদাদ শহরে। তিনি ছিলেন হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন বড়পীর সাহেবের ভাগ্নে। মাজারে রক্ষিত একটি বোর্ড থেকে জানা গেছে, তাঁর জন্ম ১২৩৮ খ্রিঃ এবং তিনি এদেশে আগমন করেন ১৩৪১ সালে। বহু অলৌকিক ঘটনা এলাকাবাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়ে তিনি ১৩৮৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত শাহজালালের সাথে যে ৩১২ জন আউলিয়া এদেশে আসেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন এদেশে আসেন তখন দিল্লির সুলতান ছিলেন ফিরোজ শাহ্ এবং বাংলার সুবেদার ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। রাস্তি শাহের অন্যতম সহচর ছিলেন সৈয়দ আহমেদ তানভী। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম ইয়েমেন আসেন ৭৩৮ বঙ্গাব্দে। ইয়েমেন থেকে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ইসলাম প্রচারে এদেশে আসেন। ইয়েমেন হতে এদেশে আসেন বলে অনেকে তাঁকে ইয়েমেন বংশোদ্ভূত বলেও থাকেন।

www.pathagar.com

এদেশে আসার সময় তাঁর অন্যতম সহচর ছিলেন তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ্ মাহবুব। হযরত রাস্তি শাহ্ ছিলেন অকৃতদার। তাঁর ছোটো ভাই শাহ্ মাহবুব বিয়ে করেন আশ্রাফপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে। আশ্রাফপুর বর্তমানে কচুয়া উপজেলায় অবস্থিত। সেখানেও রয়েছে একটি অতি প্রাচীন তিন গম্বুজ মসজিদ। রাস্তি শাহের মৃত্যুর সাড়ে তিনশ' বছর পর সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির আদেশে কাজী গোলাম রসুল একটি তিন গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। মাজারের উত্তর দিকে যে দিঘিটি অবস্থিত, তার খননকার্য নিয়েও নানা কথা এলাকায় প্রচলিত। রাস্তি শাহের বংশধর বলে দাবিদার শ্রীপুর মিয়াবাড়ির লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, এক সময় বহু সংখ্যক লোক রাস্তি শাহের মুরিদ হতে এলে, এলাকায় তীব্র পানি সঙ্কট দেখা দেয়। এই পানি সমস্যার সমাধান করতে রাস্তি সাহেব একটি দিঘি খননের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এক রাতেই জ্বীন দ্বারা ২৮ একর সম্পত্তিতে দিঘিটি খনন করতে শুরু করেন। ভোর হলেই জ্বীনরা চলে যাবে। তখনো দিঘিটির উত্তর পাড় বাঁধানো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। এমনি সময়েই শোনা গেলো ফজর নামাজের আজানের সুর। এক এক করে জ্বীন সব চলে গেলো। উত্তর পাড় আর বাঁধানো হয়নি। আজো সেই অবস্থাতেই রয়েছে। এছাড়া ভিন্ন একটি বিংবদন্তিও এই দিঘি খনন বিষয়ে প্রচলিত আছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সে বক্তব্যটি হলো : কালীদেবীর সাথে রাস্তি শাহ্ (রঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মতোই উক্ত দিঘি খননে প্রয়াসী হন। কালীদেবী নাকি বলেছিলেন, এক রাতে এতো বড়ো দিঘি খনন করা সম্ভব হবে না। এতে জেদ ধরে রাস্তি শাহ্ (রঃ) আধ্যাত্মিক সাধনা বলে জ্বীন আনয়ন করে এই দিঘি খনন করতে থাকেন। দিঘি খননের অগ্রগতি দেখে কালী বিস্মিত হয়ে যান এবং সন্দিহান হয়ে পড়েন যে, রাস্তি শাহ্ (রঃ) শেষ পর্যন্ত কামিয়াব হতে যাচ্ছেন? তৎক্ষণাৎ তিনি মোরগের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। তখন উক্ত দিঘির শুধুমাত্র উত্তর পাড়টুকু বাঁধানো বাকি। মোরগের ছদ্মবেশে তিনি ভোর হবার ইঙ্গিত করলেন এবং ভোর হয়েছে মনে করে জ্বীনেরা খননকার্য সমাপ্ত না করেই ফিরে যায়। সেই থেকে অদ্যাবধি উত্তর পাড় আর বাঁধানো হয়নি।

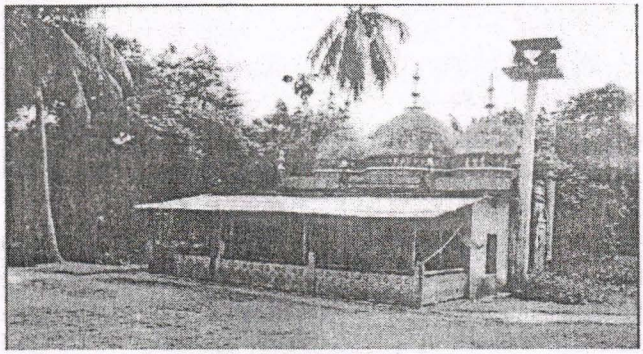

ঐতিহাসিক শাহরাস্তি মসজিদ

সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে (১৩৫১-১৩৮৮) রাস্তি শাহের খানকা শরীফের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকার ৬৪ একর সম্পত্তি লাখেরাজ দান করেন। দীর্ঘদিন পরও এই শ্রীপুরেই তার বংশধরগণ বংশ পরম্পরায় মাজারসহ ৬৪ একর সম্পত্তি দেখাশুনা

www.pathagar.com

করে আসছেন। শ্রীপুর মিয়াবাড়ি নামের বাড়িতে রাস্তি সাহেবের বংশধর বাস করে আসছেন। বর্তমানে তারা আলাদাভাবে ৫টি বাড়ি করেছেন। পাঁচ বাড়ির পাঁচজন কর্ণধার হচ্ছেন সর্বজনাব আব্দুল ওহাব মিয়া, মৌলভী আবিদুর রহমান মিয়া, মোঃ বদিউল আলম মিয়া, মজিবুল হক মিয়া এবং মফিজুল হক মিয়া। এই মাজার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক দু'শ' দশ টাকা হারে অনুদান (ভাতা) দিতো। মাঝখানে হেনরী মেডকাফ যখন কুমিল্লার ডিএম (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলেন, তখন হযরত রাস্তি শাহের উত্তরসুরি হযরত গোলাম রেজার সাথে ঝামেলা হলে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য তা চুকে যায়। আজো তার বংশধরগণ সেই দু'শ' দশ টাকা হারে বার্ষিক ভাতা পাচ্ছেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এখানে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চদশ শতকের পর্তুগিজ দুর্গ সাহেবগঞ্জ

পর্তুগিজ সেনাপতি এন্টেনিও ডি সিলভা মেনজিস ১৫৪০-৪৬-এর মধ্যে এ দুর্গটি নির্মাণ করেন। পর্তুগিজরা এ অঞ্চলে জলদস্যুতা করত। শের শাহের আমলে পাঠান সেনাপতি খিজির খানের সাথে এখানে পর্তুগিজদের যুদ্ধ হয়েছিল। খিজির খান জলদস্যুদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাদেরই (পর্তুগিজ) বংশধরদের বংশধর এখনও এখানে বসবাস করছে। চাঁদপুর জেলা সদর থেকে ডাকাতিয়া নদী পার হয়ে চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ধরে ষোল কি. মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলেই ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদর। উপজেলার সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন ১৬ নং রূপসা। এই রূপসা ইউনিয়নের একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদের নাম সাহেবগঞ্জ। এখানে রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক পর্তুগিজ দুর্গ। এই দুর্গটি পাঁচ শতাধিক বছর পূর্বে স্থাপন করেছিলেন এক পর্তুগিজ দুর্ধর্ষ সেনানায়ক এন্টেনিও ডি সিলভা (মেনজিস)। ১৫৪০ থেকে ১৫৪৬ সালের মধ্যে সিলভা এটি নির্মাণ করেন। তখন সুবে বাংলা পাঠান সম্রাট শের শাহের শাসনাধীনে ছিল। জনশ্রুতি আছে, পর্তুগিজদের দমনকালে শের শাহের সেনাপতি খিজির সম্রাটের আসল নাম অর্থাৎ ফরিদ এই নামানুসারেই এক নয়াবসতি স্থাপন করেন। এর নাম ফরিদগঞ্জ। তখন ফরিদগঞ্জের অবস্থান ছিল সমুদ্র তীরবর্তী। পর্তুগিজ সেনা তথা লুটেরাদের তাড়া করতে করতে নৌ-বহর নিয়ে খিজির খান এখানে আসেন। খিজির খান চলে যাওয়ার পর বাংলার অপর পাঠান শাসক, মাহমুদ শাহের সেনাপতি হামজা খানের সহায়তায় পর্তুগিজরা সমুদ্রোপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্য কুঠির আড়ালে কিছু সংখ্যক দুর্গ স্থাপন করে। সাহেবগঞ্জ তেমনি একটি দুর্গ। এই দুর্গটি স্থাপনের প্রায় তিনশ' বছর পরে কিছুদিন নীলকুঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই স্থানীয় জনগণ এটিকে সাহেবগঞ্জ নীলকুঠি হিসেবেই জানে। ইতিহাসের একটি অধ্যায় ঢাকা পড়ে যায় নীলকুঠির আবরণে। ঢাকা পড়ে যায় পর্তুগিজদের নির্মম অত্যাচার আর অসহায় বঙ্গবাসীর অনেক করুণ ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে কোনো পর্যটক বা ইতিহাসবিদ ভেবে দেখলেন না, নীলকুঠি এতো বৃহৎ আকারের হয় না। নীল কুঠিতে হাতীশালা থাকে না, থাকে না সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ মিনার অথবা সৈনিকদের জন্যে গার্ড শেড বা সেনাচৌকি, থাকে না কোনো সুড়ঙ্গ পথ। সাহেবগঞ্জ দুর্গটি বিস্তৃত প্রায় দু'শ' একর। এখানে আজ

www.pathagar.com

অবধি বিদ্যমান ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথ, একটি পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু পর্যবেক্ষণ মিনার, পাহারাদারদের ব্যবহৃত চৌকি, বিভিন্ন পর্যায়ের সৈনিকদের আবাসের ভগ্নাংশ। ইতোমধ্যে দুর্গ এলাকার ভেতরে অনেক বাড়িঘর উঠেছে। স্থানীয় জনসাধারণ এবং প্রত্নসম্পদ লুণ্ঠনকারী তস্কররা ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এ প্রত্নসম্পদের বিভিন্ন স্থাপনার ইট। দুর্গে রয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ মিনার বা টাওয়ার। এই মিনারটি দুর্গের একমাত্র অক্ষত স্থাপনা। এটির অবস্থান দুর্গের দক্ষিণে এবং দুর্গের বর্ধিত অংশে একটি অনুচ্চ মাটির ঢিবির ওপর। এর বর্তমান উচ্চতা ১৫.৬০ মি. এবং পাদদেশের পরিধি ১০.০৩ মি.। চারটি ধাপে ঊর্ধ্বগামী এ মিনারের প্রতিটি অংশেই এর পরিধি হ্রাস পেয়েছে। এর ছাদ একটি গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি ধাপের পশ্চিম ও পূর্বদিকে খিলান দরজা রয়েছে। মিনারের ভেতরের অংশে চুনা-সুড়কির প্রলেপ রয়েছে। মিনারটির ভেতর অংশে এক সময় একটি শিলালিপি ছিল। এখন এর অস্তিত্ব না থাকলেও নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া শিলালিপিটির অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব। মিনারটি সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তিনটি বক্তব্য প্রচলিত আছে, প্রথমত, এটি একটি চেরাগদানী বাতিঘর ছিল, দ্বিতীয়ত, পর্তুগিজ সেনারা দূরবর্তী জলসীমার স্বপক্ষীয় নৌ-যান অথবা শত্রু নৌ-যান দূরবীনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করত, তৃতীয় মত, এটি দুর্গের স্বাভাবিক স্থাপনার একটি অংশ, শত্রুসেনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এটি সুড়ঙ্গ পথে দুর্গের অন্য অংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

সাহেবগঞ্জ দুর্গের হাতিশালার ধ্বংসাবশেষ

ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য একটি মোগল গ্রাম অলিপুর ও দুটি মসজিদ-স্থাপত্য শৈলীর অনুপম নির্দশন

গ্রামটির অবস্থান : চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন ৫নং হাজীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম অলিপুর। চাঁদপুর-কুমিল্লা মহাসড়কের কৈয়ারপুল নামক স্থানে

www.pathagar.com

যানবাহন থেকে নেমে কৈয়ারপুল-ওটতলী সড়ক দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রায় ২ কিলোমিটার গেলে দেখা যায় ডাকাতিয়া কোলে অলিপুর গ্রাম। রাস্তাটি ডাকাতিয়ার খেয়া হয়ে ফরিদগঞ্জের রূপসা পর্যন্ত চলে গেছে। তৎকালীন কুমিল্লা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী এ সড়ক নির্মাণ করেন। জনাব রেজা চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমেদের নামে সড়কটির নামকরণ করা হয় পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দিন সড়ক। ওই সময় (সম্ভবতঃ ১৯৩৫-৩৮ সালে) অলিপুর গ্রামটি ছিল ৬নং হাজীগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাবেক এমপি মরহুম আঃ রবের পিতা আমিন মিয়া। গ্রামটির তিন পাশেই বহমান ডাকাতিয়া। এক সময় ডাকাতিয়া নদী প্রমত্তা ছিল। অলিপুর বাজারটি খুব খ্যাতনামা ব্যবসাকেন্দ্র, বন্দর ছিল। ডাকাতিয়ার স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসার সাথে সাথে অলিপুর বাজারটিও বন্দরের মর্যাদা হারিয়েছে। বর্তমানে অস্থিসারশূন্য কঙ্কালরূপে বিদ্যমান। একটি ছোট্ট গ্রাম্য বাজার হিসেবে কোনোরূপে টিকে আছে। অলিপুর গ্রামটি হাজীগঞ্জ থানার পশ্চিম-দক্ষিণের সর্বশেষ গ্রাম। এ গ্রামের লাগ পশ্চিমেই চাঁদপুর সদর থানার মনিহার গ্রাম। এর পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে সম্পূর্ণ এবং পশ্চিম ও উত্তরে কিয়দংশ ডাকাতিয়া নদীর অবস্থান বলা যায়। এ গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ডাকাতিয়া নদী পেরুলেই ফরিদগঞ্জ থানার সুবিদপুর উত্তর ইউনিয়নের বদরপুর গ্রাম এবং পূর্ব পাশে সমেশপুর গ্রাম। উত্তর পাশে রয়েছে হাজীগঞ্জ থানা উচ্চঙ্গা ও বলাখাল গ্রাম।

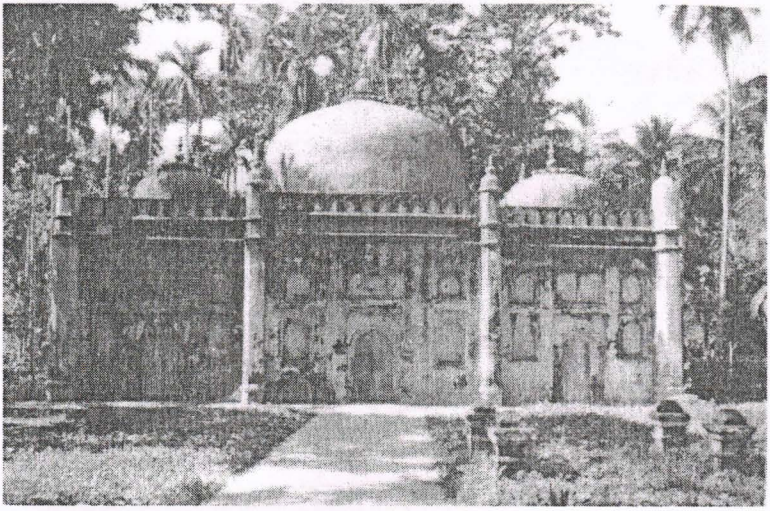

অলিপুর পাঁচ গম্বুজ আলমগীরি মসজিদ (১৭০২ খ্রি.)

অলিপুর গ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রামটির গোড়াপত্তন হয়। চতুর্তিকে নদী পরিবেষ্টিত ছিল বলে মোগলরা সমৃদ্ধ নৌ-পথের কারণে এ গ্রামটিতে তহসিল কাচারি গড়ে তোলে। এখান থেকে টোরা পরগণার খাজনা

www.pathagar.com

আদায় পরিচালনা করা হতো। মেঘনার পূর্বপাড় থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের লাকসাম পর্যন্ত এই পরগণা বিস্তৃত ছিল। পরগণাটি বেশ কিছু তহসিল কাচারীতে বিভক্ত ছিল। অলিপুল ছিল তেমনই একটি তহসিল। অলিপুর গ্রামেই থাকতেন উক্ত পরগণার একজন তহসিলদার। যিনি খাজনা আদায়ের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতেন। ১৫২৬ সালে মোগল বাদশা বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লি অধিকার করে ভারতে মোগল শাসন কায়েম করেন। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদ-পদবীর ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালে মোগল সম্রাট আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে সারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। কিন্তু সুবে বাংলায় তাঁর শাসন ততো সুদৃঢ় ছিল না। কিন্তু তদীয় পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেই সুবে বাংলায় মোগল আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। কেন্দর, সুবা, পরগণা, তহসিল চার স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেন। টোরা পরগণার একটি সমৃদ্ধ তহসিল ছিল অলিপুর। তহসিলদার ছিলেন মহকুমা প্রশাসকের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এ প্রশাসকের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এখানে মোগলদের ঘোড় সওয়ারসহ পদাতিক সৈন্যরা থাকতো। ১৬টি ঘোড়া পাশাপাশি একসঙ্গে দৌড়ানোর মতো বিস্তৃত রাস্তার (গোপাট) অস্তিত্ব কয়েক বছর পূর্বেও এই গ্রামে দৃশ্যমান ছিল। এ গ্রামের বাংলা বাড়ি থেকে ডাকাতিয়া নদীর তীরে কাজী বাড়ি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটারব্যাপী এ গোপাটটির অবস্থান ছিল। এখনো থাক্ নকশায় এ গোপাটের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা আছে। কাজী বাড়ির কাজীরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এখন কাজী বাড়িতে কাজীরা না থাকলেও তাদের পুকুর (কাজির আন্দি) আজো রয়েছে, যা গ্রামবাসীদের নিকট স্বচ্ছ পানির আধার হিসেবে খ্যাত। একটি তহসিল (মহকুমা) পর্যায়ের প্রশাসনিক স্তরে যে সব কার্যালয় থাকার দরকার তার সবকিছুই অলিপুরে বিদ্যমান ছিল। পুরানো দলিল-দস্তাবেজ খুঁজে বের করলে গ্রামটিকে আজো শনাক্ত করা যায়। গ্রামটির উত্তর-পশ্চিম অংশে রয়েছে 'বাংলা বাড়ি'। আজকাল সার্কিট হাউস বলতে যা বোঝায় তখন 'বাংলা বাড়ি' ছিল তা-ই। পরিদর্শনের জন্যে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিরা ডাকাতিয়া নদী দিয়ে এসে এ বাড়িতে থাকতেন। নদী থেকে বাড়ি পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা ছিল। তহসিলদার থাকতেন গ্রামের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে চারপাশে যেভাবে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান। প্রশাসকের বাড়ির সবচেয়ে নিকটে (পশ্চিমে) রয়েছে বরকন্দাজ (পাহারাদার) বাড়ি, আরো পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মোল্লা (মসজিদের মোতওয়াল্লী) বাড়ি, তার সংলগ্ন কাজী (বিচারক) বাড়ি, পূর্ব পাশে পাটওয়ারী (কেরানী) বাড়ি, মজুমদার (হিসাবরক্ষক) বাড়ি, পূর্ব-দক্ষিণে মীর (কোষাগার রক্ষক বা নাজির) বাড়ি, তার পূর্ব পাশে মুন্সী (দলিল লিখক) বাড়ি এবং বাড়ির উত্তর পাশে অলিপুর বাজার ও বন্দর। এসব নামে বাড়িগুলো এখনও পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে যারা বসবাস করছেন তারা সবাই অন্যস্থান থেকে আগত। অলিপুর বাজারে ব্যবসা করত হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন সাহা ও পোদ্দার, মৃৎশিল্পের কারিগর কুমোর, কামারের বাড়িও রয়েছে এ গ্রামে। ডাকাতিয়া নদীকে জীবিকা নির্বাহের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণকারী মৎস্যজীবী দাস ও নৌকার চালক মাঝিদের বাড়িও রয়েছে এ গ্রামে।

www.pathagar.com

গ্রামের 'থাক্-নকশায় প্রশাসকের বাড়িসহ তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়ির সাথে সংযোগ রক্ষাকারী গোপাটগুলোও দেখা যায়। এভাবে কাগজপত্র ও দলিলাদি পর্যালোচনা এবং কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে না যাওয়া কিছু নির্দশন গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও শত শত বছরের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের কৈয়াপুর বাস স্টপেজ থেকে তিন মাইল দক্ষিণে এলেই একটি সুন্দর দিঘির পাড়ে ৫০০ গজ দূরত্বে দু'টি প্রাচীন মসজিদ। একটির নাম শাহ সুজা মসজিদ এবং অপরটির নাম শাহী বা আলমগিরি মসজিদ। একটি থেকে অপরটি ৫৪ বছরের প্রাচীন। শাহসুজা মসজিদকে স্থানীয়ভাবে 'পাঞ্জেগানা মসজিদ' এবং শাহী বা আলমগিরি মসজিদকে 'জুমা মসজিদ' নামে অভিহিত করা হয়।

শাহী মসজিদের প্রায় সমান্তরালে মাত্র ২০০ মিটার উত্তরে সুজা মসজিদের অবস্থান। স্থানীয় মসজিদ কমিটি সংস্কার করতে গিয়ে মূল আকার-আকৃতির কিছুটা বিকৃতি ঘটিয়েছে। মসজিদটি মোগলদের প্রচলিত স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত অর্থাৎ তিনগম্বুজ বিশিষ্ট। এটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মসজিদ অর্থাৎ 'পাঞ্জেগানা মসজিদ' হলেও বর্তমানে এতে শাহী মসজিদের ন্যায় জুমার নামাজ আদায় করা হয়। এ মসজিদের সামনে রয়েছে বড় পুকুর ও তার পূর্ব পাড়ে ঈদগাহ। জনশ্রুতি আছে, এ ঈদগাহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত হয়েছে। বর্তমান সংস্কারের আওতায় পড়ে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। মোগল সম্রাটদের তৈরি মসজিদগুলোতে সাধারণ মসজিদের মূল ভবন ছাড়াও খোলা পাকা চত্বর থাকে এবং দেওয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে। এখানে এগুলো নেই, আজান দেওয়ার জন্যে কোনো পাকা মিনারও নেই। হয়তো কালের আবর্তে ওগুলো হারিয়ে গেছে। হয়তো কোনো ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে। অথবা বাংলার প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কথা মনে রেখে নির্মাতারা এগুলো নির্মাণ করেননি। শাহী (বড়) মসজিদটি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামলে স্থানীয় প্রশাসক আবদুল্লাহ কর্তৃক ১৭০২ খ্রিঃ (১১০৪ হিজরিতে) নির্মাণ করা হয় অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীরও অধিক পূর্বে। এ মসজিদ নির্মাণের ৫৪ বছর পূর্বে (১০৭৭ হিঃ, ১৬৪৮ খ্রিঃ) ছোটো মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কুমিল্লা জেলার ইতিহাস গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা এ মসজিদটি নির্মাণ করেন বলে এটি সুজা মসজিদ নামে সমধিক পরিচিত। মসজিদের দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট ও প্রস্থ ২৪ ফুট এবং দেয়ালের ঘনত্ব বা পুরুত্ব ৫ ফুট। উল্লেখ্য, শাহ সুজা এ মসজিদ নির্মাণের ১০ বছর পর ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার মোগলটুলিতেও প্রায় অনুরূপ তবে এর চাইতে একটি বড়ো মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৬০৮ সালে ঢাকা নগরীর পত্তন হয়, তার আগেই টোরা পরগণার সৃষ্টি হয়। মসজিদ দু'টির নির্মাণের ইতিহাস অনেকটা জনশ্রুতি নির্ভরই ছিল। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে এ মসজিদ দু'টিকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির বরাত দিয়েই পরিবেশিত হয়েছে। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জানা যায়, ফারসি ভাষায় এর লিখিত ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন পাক-ভারত যুদ্ধ চলছিল তখন ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের কীর্তিগাঁথা ও স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা নিয়ে গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। লাহোর শহরে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরে

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার প্রাচীন লোকালয়সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নজরে আসে অলিপুর আলমগিরি মসজিদ ১৯৬৫ সালের ৩১ বছর পর। ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চ আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অলিপুর শাহী মসজিদ সংস্কার কাজ হাতে নেন। শুরু হয় শেকড় অনুসন্ধান কাজ। ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারকল্পে সরকার ইতিমধ্যে এটিকে একটি পুরাকীর্তির মর্যাদা দিয়ে সংস্কার করেছেন। মসজিদের ৬০ ফুট পূর্বে রয়েছে একটি বড় পুকুর। এই পুকুরটি মসজিদ নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষই খনন করেছিলেন। সাধারণ মোগল স্থাপত্যরীতির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এ মসজিদে। সাধারণতঃ মোগলরা তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদই তৈরি করত। কিন্তু এ মসজিদের আছে পাঁচ গম্বুজ। হয়তো শাহ্ সুজা থেকে আওরঙ্গজেবের কীর্তিকে আলাদা করার প্রচেষ্টা অথবা তহসিলদারের পদমর্যাদা বৃদ্ধির কারণে। মসজিদের প্রধান দরজার ওপরে স্থাপিত রয়েছে ১.১০ ফুট দীর্ঘ ও সাড়ে এগার ইঞ্চি প্রস্থের ফারসি ভাষায় লিখিত শিলালিপি। এ শিলালিপির ক'টি লাইনের অনুবাদ হচ্ছে : (১) পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবু'দ নেই এবং মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর নবী (৩) মহামতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে (যাঁর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষায় অনেক রাজন্যবর্গ আশ্রয় নিত) (৪) উপাসনালয়ের গুণাবলি প্রকাশের জন্যে পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটে। আমি যখন এর প্রতিষ্ঠার কথা জানতে চাইলাম, অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর আমাকে এর সাল জানালো (৫) মসজিদটি নির্মিত হয় আমি আবদুল্লাহ্ কর্তৃক (৬) (যে চার সংগী- বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর অনুগামী)। ১১০৪ হিজরিতে শিলালিপির বর্ণনা অনুযায়ী নির্মাণকারী একজন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ছিলেন। মসজিদের নির্মাতা আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় তিনি একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বান যখন বাংলার গভর্নর (সুবেদার) ছিলেন (১৬৯৬-১৭০৬ খ্রিঃ) তখনই আবদুল্লাহ্ নির্মাণ করেন এ মসজিদ। মসজিদের ১০০ মিটার পূর্বে একটি পুরাতন ইটের মাজার আছে। বর্তমানে অপরিকল্পিত সংস্কারে আগের অবয়ব ঠিক নেই। এখানে আছে আবদুল্লাহর সমাধি। শুনেছি মাজারের গায়ে শিলালিপি ছিল, বর্তমানে নেই। ১৭০৭ সালে মহামতি আওরঙ্গজেব পরলোকগমন করেন। অর্থাৎ মসজিদটি ১৭০২ সালে নির্মাণের পাঁচ বছর পর। ১৯৬৫ সালের ৪ নভেম্বর পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা জনাব এ. কে. এম. আমজাদ হোসেন 'Concept of Pakistan' সাময়িকীতে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেন। প্রতিবেদনে তিনি শাহী মসজিদটিকে তাঁর গবেষণায় 'আলমগিরি মসজিদ' হিসেবে অভিহিত করেন। আলমগিরি (শাহী) মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫২.৮ ফুট ও প্রস্থ ২৯.৯ ফুট। মোগল স্থাপত্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এ মসজিদের চারটি অষ্টকোণাকার মিনার রয়েছে। মসজিদের ছাদে দুপাশে দুটি করে ৪টি ছোটো গম্বুজ এবং মাঝে একটি বড়ো গম্বুজসহ মোট ৫টি গম্বুজ রয়েছে। পশ্চিম পাশের দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। ইমাম সাহেব মধ্যবর্তী যে মিহরাবে অবস্থান করে নামাজ পড়ান সেটিই বড়ো এবং দু'পাশের দু'টি ছোটো। মসজিদের ভেতরে রয়েছে অষ্টভুজাকৃতির দুটি বিশাল (স্থূল) স্তম্ভ (পিলার)। যেগুলোর বেড় বা পরিধি কমপক্ষে আট হাত। আর মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় আড়াই হাত (প্রায় ৪ ফুট)। মসজিদটিতে মূলত কোনো জানালা ও ভেন্টিলেটার নেই। পূর্ব দেয়ালে

www.pathagar.com

তিনটি দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে যে ৪টি দরজা ছিল সেগুলোকে বর্তমানে জানালায় রূপান্তর করা হয়েছে। মসজিদের চারদিকের দেয়ালের মধ্যে পূর্ব দেয়াল ছাড়া তিনদিকের দেয়ালই সমতল। পূর্বদিকের দেয়ালে এক সময় ছিল নানা কারুকাজ। ১৯৯৮ সালের বন্যার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটিকে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে সংস্কার করেছে। মসজিদের ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুজা মসজিদটির কোনো প্রকার সংস্কার করা হয়নি। সুজা মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব আলমগিরি মসজিদের চেয়ে বেশি। মসজিদ দুটোর পার্শ্বে রয়েছে আরেকটি স্বচ্ছ পানির দিঘি, যার পাড়গুলো পূর্বে পাহাড়সম উঁচু ছিল। গ্রামের জনসাধারণ এখান থেকে বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ পেতো। দিঘিটির দক্ষিণ পাড়ে একটি দীর্ঘ শান বাঁধানো ঘাট ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই অজ্ঞতাবশতঃ গ্রামের লোকজন ঘাটটি ভেঙ্গে ইটগুলো তুলে ফেলে। বর্তমানে খনন কাজ ছাড়া এটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুস্কর। দিঘির পশ্চিম পাড়েই রয়েছে একটি মাজার। জনশ্রুতি রয়েছে, এখানে এসে আল্লাহর সাহায্য চাইলে প্রার্থনাকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেশের অন্যান্য মাজারের মতো এখানে সাধু বাবারা অনুপস্থিত। দিতে হয় না কোনো নজর নেওয়াজ। মাজারটি মূল আকার-আকৃতি হারিয়েছে। সমাধিতে ৪ জন অলির মাজার রয়েছে এটা সঠিক। এ ৪ জন অলির নামে গ্রামটির নাম অলিপুর হয়েছে বলে অধিকাংশ গ্রামবাসীর নিশ্চিত ধারণা। প্রতি বছর ২৫ মাঘ চার অলির মাজারে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ দুটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে প্রচুর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে যার সবটুকুই ক্রমান্বয়ে নানাজনের দখলে চলে গেছে। যেগুলো আর উদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রায় একশ' বছর পূর্বে এ মসজিদের মোতওয়াল্লী ছিলেন সৈয়দ দাইমউদ্দিন মোল্লা।

১৬৪৮ সালে অলিপুর গ্রামে শাহ সুজার পদার্পণ ঘটে। তিনি তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন। তার আগমন উপলক্ষে এই লোকালয়ে প্রথম তিন গম্বুজ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদটি নির্মাণের ১০ বছর পর আওরঙ্গজেব সম্রাট হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। আওরঙ্গজেব ৪৯ বছর দিল্লির সম্রাট ছিলেন। তাঁর আমলে অলিপুর এলাকায় বর্ধিষ্ণু লোকালয় ছিল এবং অমাত্যবৃন্দের নামাজ আদায়ের স্থান সঙ্কুলানের জন্যে ১৭০২ সালে দ্বিতীয় মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। চাঁদপুর শহরের সৃষ্টি দু'শ' বছরের নয়, প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বে। অলিপুর বড় মসজিদটির আঙ্গিনায় পাথরের তৈরি একটি বিষ্ণু মূর্তি অঙ্কিত বেদী আছে, যা প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বের তৈরি। মসজিদ বাড়িটির নামও ঠাকুরবাড়ি।

তথ্য সূত্র

১. একেএম আমজাদ হোসাইন, কনসেপ্ট অব পাকিস্তান, ৪ নভেম্বর, ১৯৬৫।
২. কাজী শাহাদাত, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ২৭ মে ১৯৯৯।
৩. কাজী শাহাদাত, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ, ২ আগস্ট ১৯৯৯।
৪. আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, স্মারক নং- চ-১০/৯৫।
৫. লেখকের পৈত্রিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি।
৬. চাঁদপুর জেলার পুরাতন থাক্-নকশা।

www.pathagar.com

লোহাগড়া মঠ

ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে 'লোহাগড়া' গ্রামের মঠটি কিংবদন্তির সাক্ষী হিসেবে এখনো দণ্ডায়মান। পরম প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের দু'ভাই 'লোহা' ও গহড়' এতোই প্রভাবশালী ছিল যে, এরা যখন যা ইচ্ছা তা-ই করতেন এবং তা প্রতিফলিত করে আনন্দ অনুভব করতেন। এই দুই ভাইয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম রাখা হয় 'লোহাগড়'। জনৈক ব্রিটিশ পরিব্রাজক 'লোহাগড়' গ্রাম পরিদর্শনে গেলে তাদের আভিজাত্য দেখে বিমুগ্ধ হন। কথিত আছে, ওই পরিব্রাজকের জন্যে নদীর কূল হতে তাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা, যার প্রস্থ ২ হাত, উচ্চতা ১ হাত, দৈর্ঘ্য ২০০ হাত সিকি ও আধুলি মুদ্রা দিয়ে নির্মাণ করেন। (এটি বর্তমানে বিলুপ্ত) সাধারণ মানুষ এদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভয়ে চলাফেরা পর্যন্ত করত না। বাড়ির সামনে দিয়ে ডাকাতিয়া নদীতে নৌকাগুলো নিঃশব্দে যাতায়াত করতে হতো। ডাকাতিয়া নদীর কূলে তাদের বাড়ির অবস্থানের নির্দেশিকা স্বরূপ সুউচ্চ মঠটি নির্মাণ করেন। তাদের আর্থিক প্রতিপত্তির নিদর্শন স্বরূপ মঠের শিখরে একটি স্বর্ণদণ্ড স্থাপন করেন। এর লোভে মঠের শিখরে ওঠার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন বলে শোনা যায়। এই বৃহৎ স্বর্ণদন্ডটি পরবর্তীকালে ঝড়-তুফানে মঠ শিখর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীতে পড়ে যায়। লোকমুখে শোনা যায়, এই স্বর্ণদন্ডটি প্রায় আড়াই মণ ওজনের ছিল। লোহাগড়ের এই দুই ভাইয়ের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। মঠটি দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাইয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপের নীরব সাক্ষী হয়ে। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে, ১৭৫৭ সালের কিছুকাল আগে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সভাসদ রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ নবাব রাজত্বের আদায়কৃত খাজনার বিপুল অর্থসহ পালিয়ে ফরিদগঞ্জ এলাকার এক অত্যাচারী জমিদারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই জমিদার পরিবারের বসবাস ছিল বর্তমান লোহাগড় গ্রামে। ফরিদগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ৫ কিলোমিটার।

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ

উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদগুলোর অন্যতম, জুমাতুল বিদার বৃহত্তম জামাতের মসজিদ হিসেবে খ্যাত, চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে বিশাল এলাকাজুড়ে অবস্থিত হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ। মসজিদটি নিয়্যত-মানতের অর্থে পরিচালিত আহমাদ আলী পাটওয়ারী ওয়াক্ফ এস্টেটের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি দ্বীনের সম্প্রসারণ ও মানব কল্যাণে সামাজিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এটি। বাংলা একাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে মকিম উদ্দিন (রঃ) নামে এক বুজুর্গ অলিয়ে কামেল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরব ভূমি হতে সপরিবারে চাঁদপুরের বর্তমান হাজীগঞ্জ অঞ্চলে আসেন। তাঁর নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ হয় মকিমাবাদ। তাঁরই বংশের শেষ পুরুষ হাজী মনিরুদ্দিন (মনাই হাজী) (রঃ) কর্তৃক সুন্নাতে রাসূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দোকান হতে হাজী দোকান, তা থেকে হাজীর বাজার এবং পরবর্তীকালে আজকের হাজীগঞ্জ গড়ে ওঠে। মনাই হাজী (রঃ)-এর প্রপৌত্র হাজী আহমাদ আলী পাটওয়ারী (রঃ) হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও ওয়াকীফ। হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদটি একচালা খড়ের এবাদতখানা থেকে খড়ের দোচালা ও তারপর দোচালা টিনের মসজিদ। পর্যায়ক্রমে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন হযরত মাওলানা আবুল ফারাহ জৈনপুরী (রঃ)-এর পবিত্র হাতে পাকা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করানো হয়। কাজ

www.pathagar.com

সমাপ্তির পর মর্মর পাথরের মূল মসজিদটিতে বাংলা ১৩৪৪ সনের ১০ অগ্রহায়ণ প্রথম জুমার নামাজের আযান দেয়া হয়। উক্ত জুমার নামাজে উপস্থিত হন অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী একেএম ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, নওয়াব মোশারফ হোসেন ও নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ্ সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উক্ত দিবসে নামাজের ইমামতি করেন পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল বাশার জৈনপুরী (রঃ)।

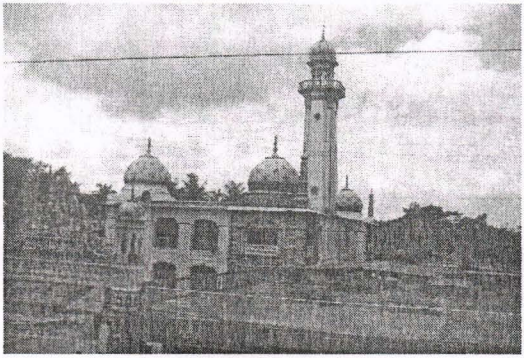

ঐতিহাসিক হাজীগঞ্জ মসজিদ

অঙ্গীকার

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র জলভরা মনোরম রেলওয়ে লেইক এর মধ্যখানে স্বাধীনতা ভাস্কর্য 'অঙ্গীকার' নির্মাণ করা হয় ১৯৮৮-১৯৮৯ সনে। চাঁদপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এস.এম. সামছুল আলম ১ আষাঢ় ১৩৯৫, ১৪ জুন ১৯৮৮ তারিখে ভাস্কর্যটি নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রথমে ভাস্কর্যটির নাম ছিল 'স্বাধীনতা স্মরণী' পরে নামকরণ করা হয় 'অঙ্গীকার'। মুক্তিযোদ্ধার সবল হাতে ধরা উর্ধ্বমুখী স্টেনগান, মুক্তিযোদ্ধার আঙ্গুল রয়েছে ট্রিগারে; বিজয়ের প্রত্যয় ব্যক্তি করছে। নীচে স্বচ্ছ জলরাশি উপরে নীল আকাশ, দারুন নান্দনিক এক পরিবেশ। ১৩৩৬ বাংলা সনের ১৯শে বৈশাখ রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ ভাস্কর্যটির উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রফেসর আবদুল্লাহ খালেদ ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন।

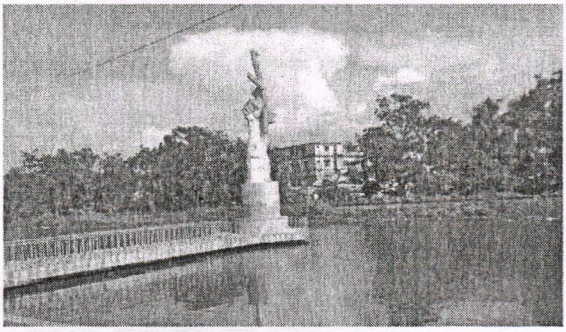

চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'অঙ্গিকার'

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ভাস্কর্য 'শপথ'

চাঁদপুর শহরের কোর্ট স্টেশনের উত্তর পার্শ্বে পাঁচ রাস্তার সঙ্গম স্থলে স্বাধীনতা ভাস্কর্য 'শপথ' নির্মাণ করেন চট্টগ্রাম চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন আচার্য। মূর্যালের নক্সা প্রণয়ন করেন যৌথভাবে শিল্পী চন্দ্র শেখর দে ও স্বপন আচার্য। চাঁদপুর পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান জননেতা ইউসুফ গাজী ভাস্কর্যটির পরিকল্পনা করেন। উঁচু বেদির ওপর গোলাকার একটি স্তম্ভের গায়ে বাংলাদেশের অর্জন ও সম্ভাবনাকে মুর্যালে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মাঝে ধাতব পাত দ্বারা নির্মিত ফুটন্ত শাপলা ফুলের ভেতর ফোয়ারার সংযোজন করা হয়েছে। রাতে বৈদ্যুতিক রঙ্গীন আলোর মধ্যে দিয়ে যান্ত্রিকভাবে জলের ফোয়ারা স্বর্গীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ভাস্কর্যটিকে উদ্বোধন করা হয় ৫ শ্রাবণ ১৪০৭ মোতাবেক ২০ জুলাই ২০০০ খ্রি.।

মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র

চাঁদপুরে একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র আছে। এটি চাঁদপুর শহরের অদূরে ষোলঘর নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের মৎস্য পোনা উৎপাদনের নিমিত্তে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আইসিডিডিআরবি

আইসিডিডিআরবি মতলব উপজেলায় অবস্থিত বিদেশি সাহায্যে নির্মিত একটি কলেরা নিরাময় কেন্দ্র। এটি আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত একটি হাসপাতাল। মতলব উপজেলার মেঘনা-ধনাগোদা নদীবেষ্টিত ১৪টি ইউনিয়নকে কলেরা প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলে অসংখ্য লোক পূর্বে কলেরায় অকালে মৃত্যুবরণ করত। বর্তমানে আইসিডিডিআরবি'র ইনডোর এবং আউটডোরে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে কলেরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থল

চাঁদপুর শহরের সর্বপশ্চিমে রেলওয়ে বড়ো স্টেশনের নিকটে পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থল অবস্থিত। এই মিলনস্থলে সূর্যাস্তের দৃশ্য সাগর-সৈকতের দৃশ্যকেও হার মানায়।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ সেন এই মন্দির ১২৭৭ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় লোকদের নিকট হতে জানা যায়, গঙ্গা গোবিন্দ সেন রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্যে ভারতের শ্রীক্ষেত্রে যান। অনেক চেষ্টা করার পরেও তিনি জগন্নাথ দেবকে দেখতে না পেয়ে মনের দুঃখে কান্নাকাটি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন 'তুমি দুঃখ করিও না, আমি নিজেই তোমার আবাসস্থল সাচারে নিজ বাড়িতে আবির্ভূত হইব'। তখন গঙ্গা গোবিন্দ বাড়িতে আসেন এবং কয়েকদিন পর তার বাড়ির দিঘিতে অলৌকিকভাবে ভেসে আসা নিম কাঠ দেখতে পান, যা' দ্বারা কচুয়ার বিখ্যাত সাচারের রথ এবং দেব-দেবী নির্মিত হয়।

www.pathagar.com

মনসামুড়া

এই মুড়া কচুয়া থানায় অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত স্থানে ১৩টি বাঁশঝাড় আছে। উক্ত ঝাড়ের চারদিকে অনেক সাপের গর্ত আছে। জানা যায়, হিন্দুদের মনসা দেবীর সেখানে অবস্থান। হিন্দুরা প্রতি বছর চৈত্র মাসে এই মুড়ায় পূজা-অর্চনা করে। এই উপলক্ষে মেলা বসে। হিন্দুরা অনেক মানত করে এবং দুধ-কলা দিয়ে পূজা করে। শুধু তাই নয়, এই বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ কেউ কাটে না।

সাহার পাড়ের দিঘি

কচুয়া উপজেলার রহিমানগর বাজার হতে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে কচুয়া-কালিয়াপাড়া সড়কের পূর্ব পার্শ্বে এই দিঘি অবস্থিত। ৬১ একর আয়তন বিশিষ্ট এই দিঘির সুউচ্চ পাড় এবং পাড়ের ওপর সুবৃহৎ বৃক্ষরাজির চমৎকার দৃশ্য, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জানা যায়, বহুকাল পূর্বে এই এলাকায় কড়িয়া রাজা নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে কড়ির মুদ্রা প্রচলিত ছিল। একদা কড়িয়া রাজা ব্যাপক আয়োজনভিত্তিক এক পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে পানীয় জলের সংকট নিরসনকল্পে এবং নিজের নামকে কালজয়ী রাখার মানসে কড়ির বিনিময়ে একটি দিঘি খনন করেন। এর দিঘির নাম কড়িয়া রাজার দিঘি নামকরণ করেন। তার ইচ্ছা পূরণার্থে তার মন্ত্রী সাহাকে এই দিঘি খনন করার নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী সাহা নির্দেশ পেয়ে দিঘি খনন করান। দিঘি খনন কাজে অংশ নেয় বহু নর-নারী। যারা খনন কাজে অংশ নেয় তাদেরকে প্রতি খাঞ্চি মাটি কাটার বিনিময়ে এক খাঞ্চি করে কড়িমুদ্রা দেয়া হয়। দিঘি খনন শেষে মন্ত্রী সাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার নামে দিঘির নাম প্রচার করেন। দিঘি নামকরণে মন্ত্রীর চাতুরিপনার খবর পেয়ে কড়িয়া রাজা ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মন্ত্রীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলেও এই দিঘির নাম মন্ত্রীর নামে অর্থাৎ সাহার পাড়ের দিঘিই লোকমুখে থেকে যায়।

ছোটো সুন্দর গ্রামের পরিত্যক্ত এক গম্বুজ ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ

চাঁদপুর জেলা শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার পূর্বে ডাকাতিয়া নদীর কোল ঘেঁষে সুন্দর একটি গ্রাম। নাম ছোটো সুন্দর। এ গ্রামে একটি দিঘি আছে। দিঘির চারপাশ জনবসতিহীন। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নানা গাছ ও লতাগুল্মের একটি বড় ঝোঁপ রয়েছে। এই ঝোঁপের ভেতর লুকিয়ে আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর প্রত্নসম্পদ। এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ছোটো মসজিদ। দেয়ালগুলো চল্লিশ ইঞ্চি পুরু। মেহরাব রয়েছে, রয়েছে বাতি জ্বালানোর জন্যে কার্নিশ। সবই অটুট। মাত্র ছয়/সাত জন লোক এখানে নামাজ পড়তে পারতো। একটি বিশাল ঝির গাছের শেকড় সমস্ত মসজিদটি ঢেকে ফেলেছিল। গত দুই শতাব্দী এখানে কেউ নামাজ পড়েছে বলে মনে হয় না। মসজিদটি সংস্কার করে দর্শনার্থীদের দেখার সুযোগ করে দিলে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে এদেশবাসী। লোকে মসজিদটিকে জীনের মসজিদ বলে থাকে।

উজানী বখতিয়ার খাঁ মসজিদ

কচুয়া উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে উজানী গ্রাম। বর্তমানে এ গ্রামে আছে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা। মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে আছে একটি দিঘি। তার

www.pathagar.com

পশ্চিম পাড়ে আছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য মসজিদ। এটি বক্তার খাঁ শাহী মসজিদ নামে খ্যাত। এক সময় উজানী গ্রামটি বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। ক্বারী ইব্রাহিম সাহেব বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি একজন অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তিনি এ মসজিদটিকে ব্যবহার্য করে তোলেন। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে আছে, ''পরম দয়ালু আল্লাহ্তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ এক, তাহার কোনো শরীক নাই। মোহাম্মদ তাহার রাসূল। বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ গাজীর শাসনামলে খাদেম আবুল হোসেন খাঁর পুত্র ইলিয়াস খাঁর পৌত্র''। উল্লেখ্য যে, এই উজানী গ্রামেই আছে হযরত নেয়ামত শাহের দরগাহ। যিনি হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর একজন সংগী ছিলেন। উজানী গ্রামে একজন বিখ্যাত ফৌজদার ছিলেন। তার নাম ছিল বখতিয়ার খাঁ। তিনি মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণ সাল ১৭৭২। উজানী একটি প্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামের নাম পাওয়া যায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে 'উজানী নগর' হিসেবে। শোনা যায়, বেহুলা লখিন্দরের লোহার তৈরি বাসরঘর এ গ্রামে ছিল। যা মাটির নিচে ডেবে গেছে। বেহুলার শীল নোড়ার কথিত অংশবিশেষ এখনো এ গ্রামে রয়ে গেছে। লোকজন এখনো এগুলো দেখতে আসে। উজানী নগর পুঁথি সাহিত্যের অমর রচয়িতা দোনা গাজীর কর্মস্থল ছিল।

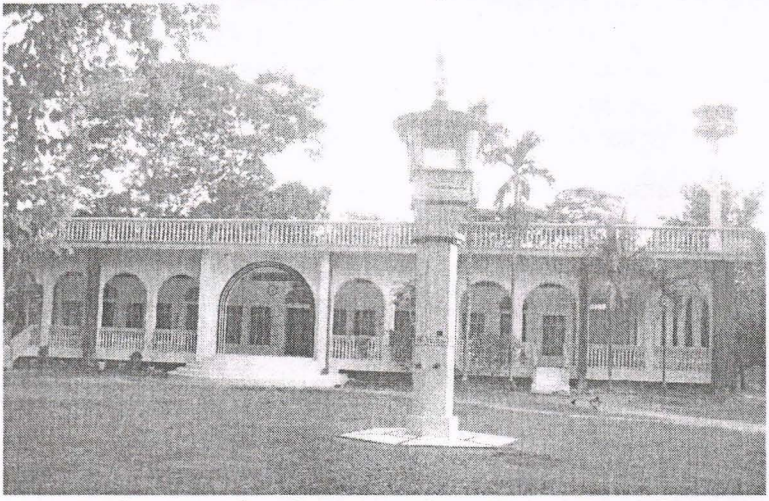

নবরূপে উজানী বখতিয়ার খাঁ মসজিদ। (বড় মসজিদের ভিতরে পুরাতন মসজিদ রয়েছে)

নাটেশ্বর রায়ের দিঘি

শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী ইউনিয়নের সর্বশেষ সীমায় রয়েছে নাটেশ্বর রাজার ত্রিশ একর আয়তনবিশিষ্ট দিঘি। এটির উত্তর পাড়ে রয়েছে কোতোয়াল হায়াতে আবদুল করিম নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ। পূর্ব পাড়ে রয়েছে শাহ শরীফ বোগদাদীর মাজার। জনশ্রুতি রয়েছে, হযরত শাহ শরীফ বোগদাদী ছিলেন হযরত শাহজালালের অনুগামী। নাটেশ্বর রায়ের স্ত্রী শাহ শরীফ বোগদাদীর শিষ্য ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

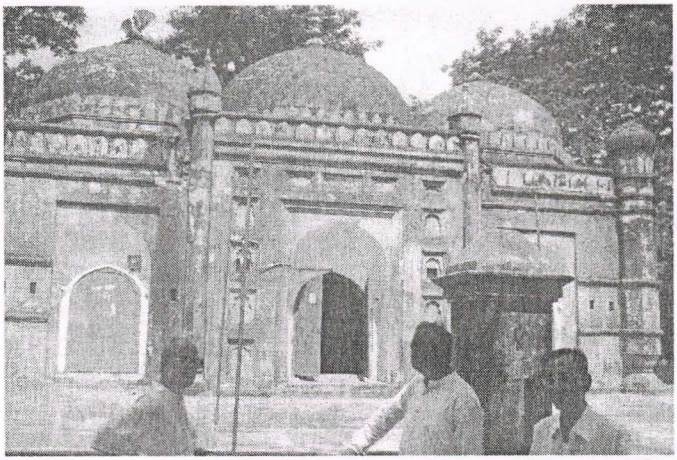

ঐতিহাসিক নাটেশ্বর দিঘির পাড়ে হায়াতে আবদুল করিম মসজিদ (১৩৪০ খ্রি.)

কড়ইতলী জমিদার বাড়ি (ফরিদগঞ্জ)

কড়ইতলী গ্রামে রয়েছে এক অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি। বাড়িতে রয়েছে দুর্গামন্দির, ভগ্ন ত্রিতল প্রাসাদ, মনসা মন্দির, আঁধার মানিক ও সুড়ঙ্গপথ। ১২২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল জেলার অধিবাসী হরিশচন্দ্র বসু নিলাম সূত্রে কড়ইতলী জমিদার বাড়িটি ক্রয় করেন এবং ৪১.১০ একর জমির ওপর এই বিশাল বাড়িটি নির্মাণ করেন। ১২৯০ সালে শতায়ু হরিশচন্দ্র বসু পরলোক গমন করেন। তার পুত্র গোবিন্দ বসু জমিদারির মালিক হন। অত্যাচারী এই জমিদারের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ হীনবল হয়ে পড়ে এবং ভারত স্বাধীন হলে ১৯৫১ সালে তারা জনরোষে পড়ে রাতের অন্ধকারে বিষয় সম্পত্তি ফেলে রেখে ভারতে পলায়ন করে।

ভিঙ্গুলিয়া মসজিদ (হাইমচর)

হাইমচরের ভিঙ্গুলিয়া গ্রামের মল্লিক বাড়িতে রয়েছে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও মসজিদের প্রাঙ্গণে রয়েছে কিছু বাঁধানো প্রাচীন কবর। লোকে বলে, মলুকজান বিবির মসজিদ। শিলালিপি থেকে যতদূর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তাতে জানা যায়, মসজিদটি ঈসা খাঁর আমলে জালালপুরের মল্লিক খেতাবপ্রাপ্ত কোনো শাসক নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ির চারপাশে পরিখা খনন করা আছে। লোকে বলে, মল্লিক বাড়ি। জনশ্রুতি আছে, মেঘনায় বিলীন হওয়া হিঙ্গুলিয়া গ্রামেও অনুরূপ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ছিল। ভিঙ্গুলিয়া মসজিদে একটি শিলালিপি আছে। 'চাখতা মুল্লুকে জাঁহার রেজামন্দির জন্য মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণকারীকে শত জান্নাত দান করা হবে।' - ১. প্রথমে পরম দয়ালুময় আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি। ২. আল্লাহ্ এক, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রাসূল ৩. এই মোবারক মসজিদ জগতের মালিকের সন্তুষ্টির জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ৪. মসজিদ স্থাপনকারী শত জান্নাত পাইবে। উপরে দেখ ইতিহাসের তারিখ ১১০০ হিজরি সনে পৌঁছাইয়াছে।

www.pathagar.com

মসজিদের পাশে একটি পাকা কবর রয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় আরো দুটো পাকা কবর রয়েছে।

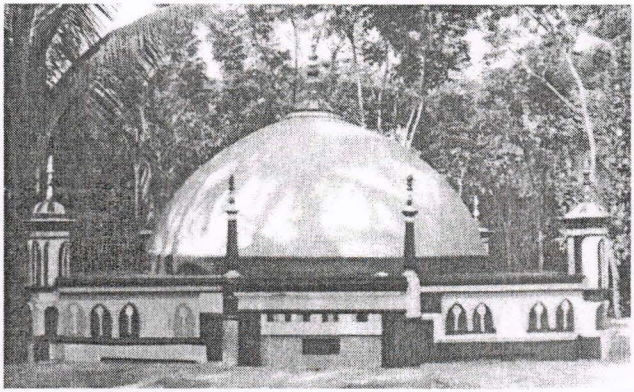

৫শত বছরের পুরাতন ভিঙ্গুলিয়া মসজিদ হাইমচর

পালগিরি মসজিদ (কচুয়া)

এখানে একটি এক গম্বুজ মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি পাঁচশ' বছরের প্রাচীন। এখানে রয়েছে বিরাট আকারের অসম্পূর্ণ দিঘি। দিঘির পাড়ে থানা বিবি ও দুলাল রাজার কবর, পাকাঘাট। মসজিদের অদূরে রয়েছে দু'টি প্রাচীন পাকা কবর। অনুমান করা হয় এটি নির্মাতার কবরই হবে। দুলাল রাজার দিঘিটি ১৯ একর। মসজিদের পূর্ব পাশে একটি প্রাচীন নৌপথ ছিল। ক্যাপ্টেন আঃ রব খন্দকারের দাদা জাহানী খন্দকার ১৮০২ সালে মসজিদটি ঝোঁপের মধ্যে দেখতে পেয়ে পুনঃসংস্কার করেন। ক্যাপ্টেন আঃ রব ৯৮ সালে ৮১ বছর বয়সে মারা যান। দুলাল রাজা ও থানা বিবি সম্পর্কে মামা শ্বশুর ও ভাগ্নে বউ ছিলেন। প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও তাদের বিয়ে হয়নি বলে জনশ্রুতি আছে। মসজিদ থেকে সামান্য দূরে দুলাল রাজা ও থানা বিবির বাঁধানো কবর রয়েছে।

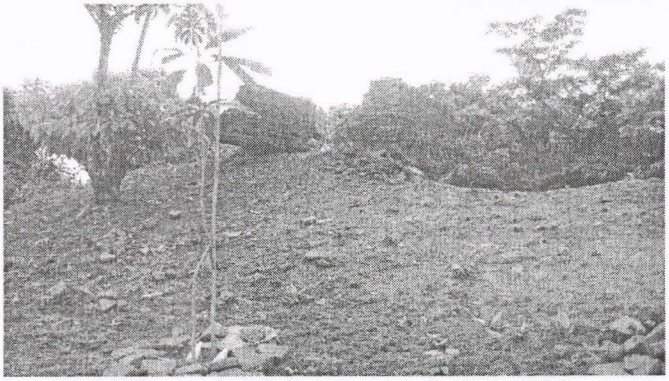

পালগিরি দুলাল রাজা ও থানা বিবির দিঘির পাড়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘাট

www.pathagar.com

দারাশাহী তুলপাই মসজিদ (কচুয়া)

কচুয়া উপজেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দারাশাহী তুলপাই গ্রামে রয়েছে নাগরাজ রাম রায়ের কন্যা রামেশ্বরী দেবী ও হযরত দারাশাহের অমর প্রেমের স্মৃতিতে নির্মিত তিন গম্বুজ মসজিদ, শেখ দারা রামেশ্বরীর ত্রিতল ভগ্নপ্রসাদ। ষোড়শ' শতাব্দীতে সুদূর আরব দেশীয় এক যুবক প্রশাসক দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে বর্তমান কচুয়ার তুলপাই অঞ্চলে আসেন। তিনি নাগরাজ কন্যা রামেশ্বরী দেবীর প্রেমে পড়েন এবং এক যুদ্ধের পর নাগরাজাকে পরাজিত করে রামেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। বর্তমানে দারাশাহী তুলপাই গ্রামে তার মাজার রয়েছে। প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর মাহ্ফিল হয়। দারাশাহের স্মৃতিতে তাঁর মৃত্যুর দু'শ বছর পর নির্মিত মসজিদের শিলালিপিতে আছে, ''মহান আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। আল্লাহ্ এক। মোহাম্মদ তার রাসূল। নুরুজ্জামান দ্বারা মসজিদটি ১২০২ হিজরি সনে স্থাপিত।'' নুরুজ্জামান রামেশ্বরী ও দারাশাহের অধঃস্থন পুরুষ। বর্তমানে দারাশাহী তুলপাই গ্রামে এদের কোনো বংশধর নেই।

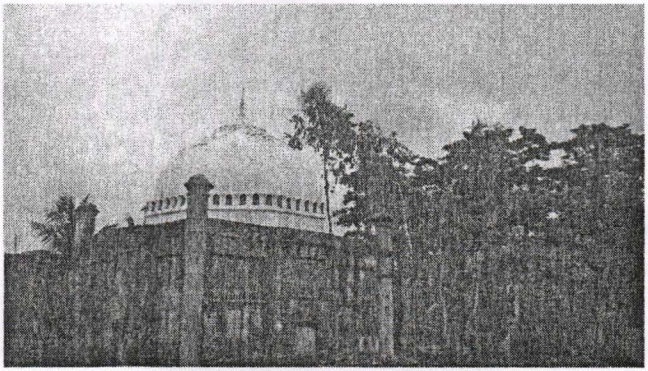

রামেশ্বরী-দারাশাহী তুলপাই মসজিদ (কচুয়া)

দারাশাহি তুলপাই মসজিদের শিলালিপি

www.pathagar.com

আশ্রাফপুর মসজিদ (কচুয়া)

আশ্রাফপুরের তিন গম্বুজ মসজিদ। যেখানে রয়েছে আরবদেশীয় বণিকদের কবর। এখানে রয়েছে নিমাই দিঘি। মসজিদটি বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এখানে অনেকগুলো প্রাচীন পাকা কবর রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, এগুলো আরবীয় বণিকদের তৈরি। লোকে বলে থাকে সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।

মির্জা হোসেন আলী মসজিদ, নারায়ণপুর (মতলব দঃ)

নারায়ণপুর বাজারে রয়েছে বরদাখাতের জমিদার মির্জা হোসেন আলীর এক গম্বুজ মসজিদ ও দিঘির উত্তর পাড়ে পাঁচ শতাধিক বছরের প্রাচীন কালীবাড়ি। কোল ঘেঁষেই বোয়ালজুরি খাল।

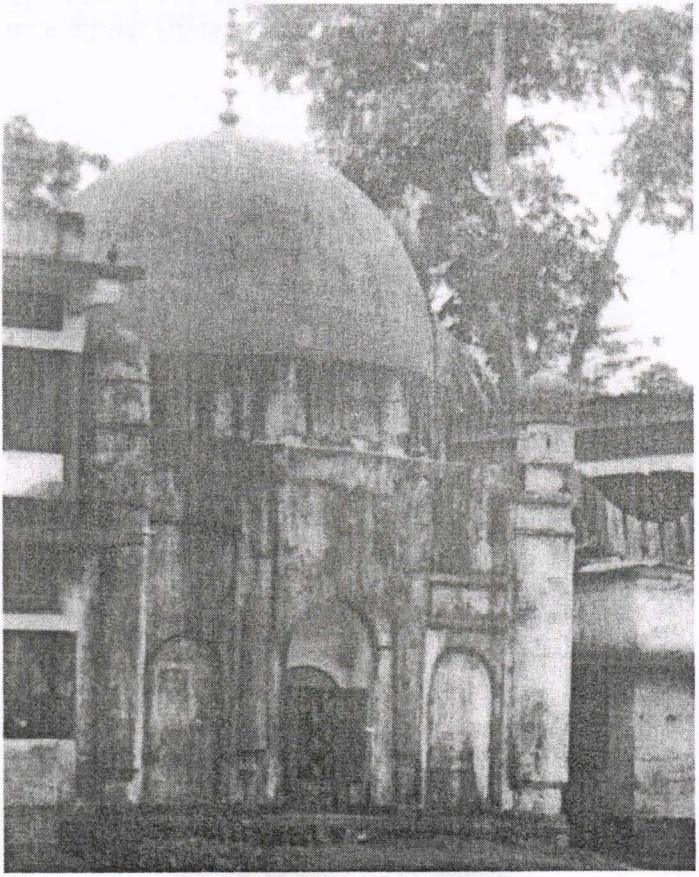

নারায়ণপুর বাজারে অবস্থিত মির্জা হোসেন আলী মসজিদ (১৭৭২ খি.)

www.pathagar.com

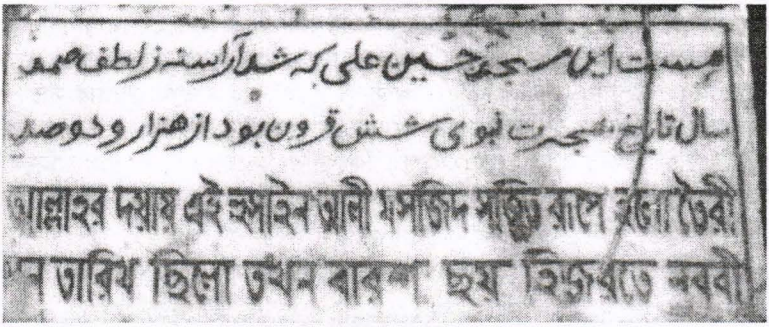

মির্জা হোসেন আলী মসজিদের শিলালিপির বঙ্গানুবাদ

রাগৈ মসজিদ (শাহরাস্তি)

রাগৈ গ্রামে রয়েছে শেরশাহের আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি জনৈক আন্তি মজুমদার পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি রয়েছে, ''পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। ২। আল্লাহর কোনো শরীক নাই। ৩। আইনুদ্দিনের মতোই আল্লাহর ঘর নির্মাণ করিলেন। ৪। মাথা ও কপাল স্পর্শ করিয়া আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। পুনঃনির্মাণ ১২১৪ হিজরি নববী।''

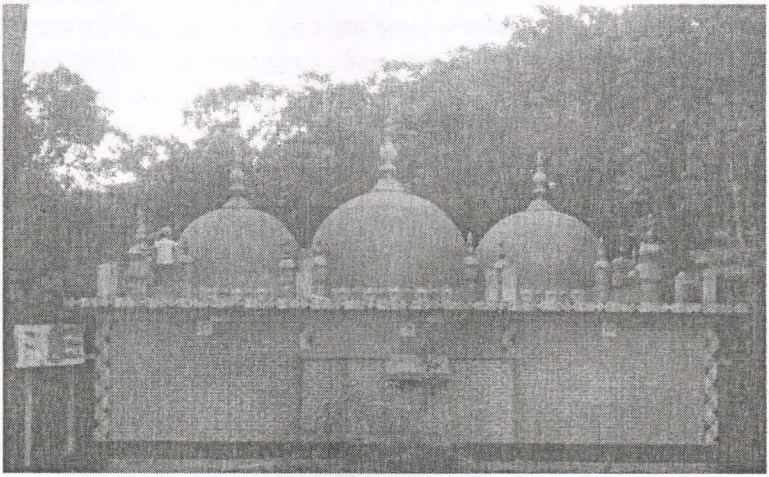

শের শাহের আমলে নির্মিত (১৫৫৬ খ্রি) (আন্তি মজুমদার কর্তৃক পুনঃনির্মিত)

শাহ মাহমুদের (রঃ) মাজার (চাঁদপুর সদর)

হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (রঃ)-এর মাজার (শাহ মাহমুদ) শাহতলী রেল স্টেশনের নিকটবর্তী খন্দকার বাড়িতে অবস্থিত। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ সাল) নিকট হতে শাহতলী মৌজাটি

www.pathagar.com

নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে লাভ করেন। শাহ মাহমুদ বাগদাদী জাহাজ যোগে বাগদাদ শহর থেকে চাঁদপুর এসেছিলেন। এই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি রাস্তি শাহের সমসাময়িক শাহ মখদুম দৌলার সাথে পূর্ব বাংলায় এসেছিলেন। এখানে রয়েছে অনেকগুলো মাজার, তার মধ্যে পাগলা বিবির মাজার, পীর আলীসহ অন্যদের মাজার। কিংবদন্তি আছে, হযরত শাহ মাহমুদ এ অঞ্চলে প্রথম প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আনয়ন করেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। তার সময়ে এটি একটি চর অঞ্চল ছিল। বছরের প্রায় সময় এলাকাটি পানিতে ডুবে থাকতো।

মাদ্দাখাঁ মসজিদ, আলীগঞ্জ (হাজীগঞ্জ)

হাজীগঞ্জ উপজেলা সংলগ্ন একটি প্রাচীন মাজার ও মসজিদ রয়েছে। মাজারটি আলী আলী মর্দান খানের। তিনি হযরত শাহজালালের সময় তার সাথী হিসেবে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আলীগঞ্জ এলাকায় এসেছিলেন। হযরত মাদ্দা খাঁর মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর ১৭৩৮ সালে একটি মসজিদ স্থাপিত হয়। মাজারটি দীর্ঘসময় অচিহ্নিত ছিল।

উত্তর মৈশাদী শেখ এনায়েত উল্লাহর মসজিদ

শহরের সন্নিকটে অবস্থিত উত্তর মৈশাদী গ্রামে রয়েছে একটি বিরাট দিঘি। দিঘির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রয়েছে একটি প্রাচীন কবর। এখানে আছে একজন বাঁদীর কবর, কাছেই রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কুয়া, পশ্চিম কোণে ছিল একটি মসজিদ, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এলাকায় চতুর্দশ শতকে একজন সাধক বাস করতেন তার নাম হযরত শেখ এনায়েত উল্লাহ। তিনি এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করার জন্যে আসেন। দিঘিটির নাম গোলা বাড়ি দিঘি। কথিত আছে, মায়ের আদেশে বাদীর কবরে সকল অলঙ্কার দিয়ে দেন শেখ এনায়েত উল্লাহ্। পরে কবর থেকে অলঙ্কারগুলো চুরি হয়ে গেলে শেখ এনায়েত উল্লাহ্ এলাকা ছেড়ে চলে যান। শেখ এনায়েত উল্লাহ্ একজন শাসক ছিলেন। মসজিদ পুনঃনির্মাণকালে অনেক কড়ি পাওয়া যায়।

উত্তর মৈশাদী গ্রামে শাহ এনায়েতের বিখ্যাত গাছ

www.pathagar.com

আমান শাহ ফকিরের পুল, হাজীগঞ্জ

কচুয়া ও হাজীগঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শৈলখালী খালের ওপর একটি পাকা পুল নির্মাণ করেন তৎকালীন শাসক। চাঁদপুর জেলার এই পুলটি সর্বপ্রাচীন এবং ইট দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। পুলটি ১৩৩৪-৪২ সনে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজত্বকালে স্থানীয় শাসক আমান শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। লাউকরা গ্রামে আমান শাহ ফকিরের ভগ্ন প্রাসাদ ও ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ রয়েছে। পাশেই রয়েছে প্রাচীন কবর। ভগ্ন প্রাসাদটিকে লোকে ফকিরের ভিটা বলে। অনেক লোক বলে থাকেন বাংলার বার ভূঁইয়াদের প্রধান ঈশা খাঁ পুলটি নির্মাণ করেছেন।

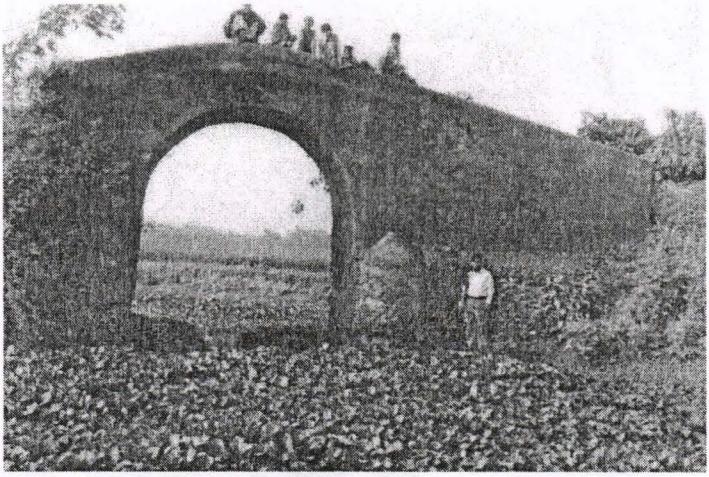

ঈশা খাঁর আমলে শৈলখালী খালের উপর নির্মিত পাকা পুল (ফকিরের পুল)

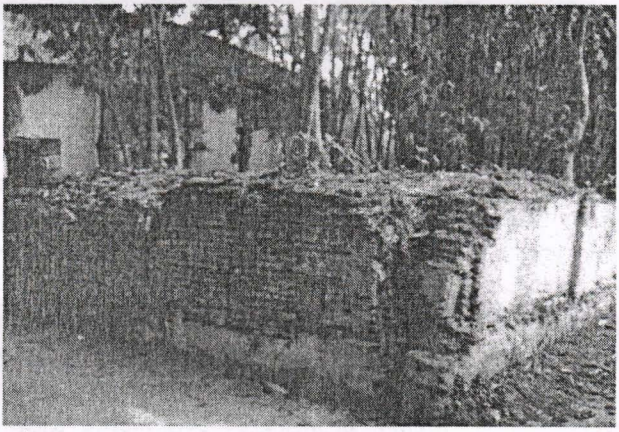

হাজীগঞ্জ লাউকরা প্রশাসক আমান শাহেব প্রসাদের ভগ্নাংশ (১৩৪৪-১৩৪৬) ফকিরের ভিটা

www.pathagar.com

নাওড়া মঠ (শাহরাস্তি)

তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন একটি মঠ রয়েছে নাওড়া গ্রামে। সাহাপুর রাজবাড়ির দেওয়ান সত্যরাম মজুমদার ১১৯৯ সনে মঠটিকে নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে মঠটি সুন্দর অবস্থায় রয়েছে।

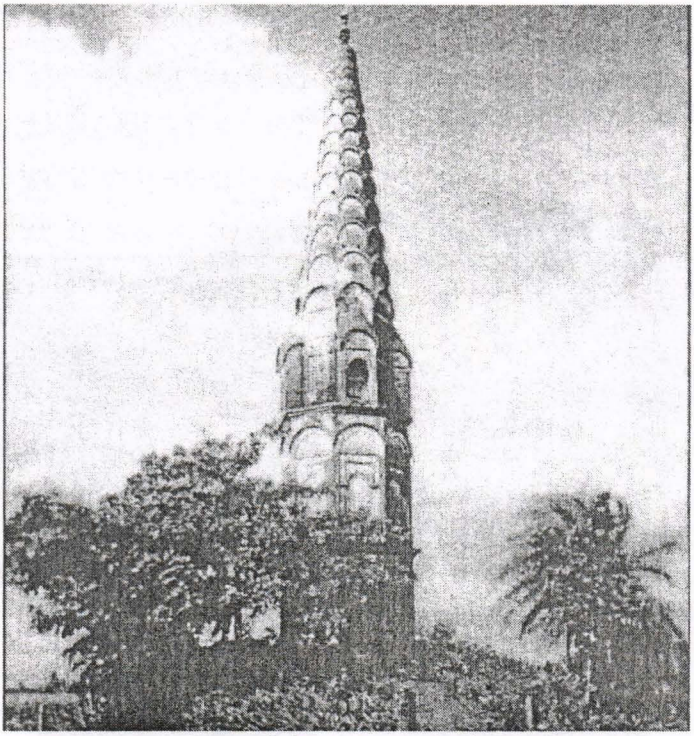

শাহরাস্তি উপজেলার নাওড়া মঠ

সাহাপুর রাজবাড়ি (শাহরাস্তি)

প্রায় পাঁচশ' বছরের প্রাচীন একটি রাজবাড়ি রয়েছে শাহরাস্তি উপজেলার সাহাপুর গ্রামে। সাহাপুর ছিল প্রাচীন মেহের পরগণার রাজধানী। এখানে রয়েছে রাজাদের প্রাসাদ, রাজবাড়ি প্রাচীর, পাহারা চৌকি, ঠাকুরমন্দির, দুর্গামন্দির, নাট্যশালা প্রভৃতি। সোনারগাঁও রাজ্যের দু'আনা অংশের মালিক ছিল দাশরাজ বংশ। রাজা শিবানন্দ রায় এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সাধক জটাধরের পিতা। সদানন্দের ১০ম পুরুষ। সাহাপুরের শ্রেষ্ঠ জমিদার প্রয়াত ভুপেষ রায় চৌধুরী। তার জন্ম ১৩১৭ বাংলা সালের ২ আশ্বিন। পিতা মৃত হরকুমার রায় চৌধুরী। তিনি জানান, ছয়শ' বছর পূর্বে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দ খাঁ নিজমেহের হতে সাহাপুর আসেন এবং এই রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন।

www.pathagar.com

শাহপুর রাজবাড়ির দুর্গামন্দিরে প্রধান সমন্বয়কারী

নাসিরকোর্ট (হাজীগঞ্জ)

নাসিরকোর্ট গ্রামটি হাজীগঞ্জ উপজেলা সদর হতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সময় কচুয়া থানার আলীয়ারায় ক্ষত্রিয় রাজা অযোধ্যারাম ছেদ্দা নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা তাকে দমনের জন্য সেনাপতি নাসির খানকে প্রেরণ করেন। নাসির খান এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। যুদ্ধে ছেদ্দা পরাজিত ও নিহত হন। নাসির খানের দুর্গের জন্যেই এই গ্রামের নাম হয় নাসিরকোর্ট। বর্তমানে এখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের গণকবর, শহিদ স্মৃতি কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বিশালাকার দিঘি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আঞ্চলিক সদর দফতর ছিল।

www.pathagar.com

কাশিমপুর রাজবাড়ি বারদুয়ারী (মতলব দঃ)

মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের কাশিমপুর গ্রামে রয়েছে নাগরাজাদের বাড়ি। এক সময় এটি ছিল নারায়ণপুর পরগণার সদর দফতর। নাগরাজাদের জমি ছিল ৮৫৩১ একর, মহালের সংখ্যা ছিল ১০টি, রাজস্ব ছিল ৪৩৮৭ টাকা এই হিসাব ১৭৭৩-৭৪ সালের। পাঁচ শতাধিক বছরের পুরানো নাগরাজ বাড়িতে রয়েছে অনেক প্রাসাদ ও স্থাপনা। বাড়িটি বারদুয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি সুউচ্চ মঠ রয়েছে। লোকে বলে রাজার মঠ। পাশেই ছোটো একটি মঠ বাঁদীর মঠ নামে পরিচিত। বোয়ালজুরি খালের দু'পাড়ে দুটি জমিদারি ছিল এবং ওখানে সংঘটিত হয়েছিল একটি যুদ্ধ, নাগরাজা (রামেশ্বরী দেবীর পিতা) ও দারাশাহের মধ্যে। যুদ্ধে জয়লাভ করে দারাশাহ প্রেমিকা রামেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। তুলপাই গ্রামে রয়েছে রামেশ্বরী দেবীর ত্রিতল প্রাসাদের ভগ্নাংশ। বিয়ের পর তিনি শেখ দারা রামেশ্বরী দেবী নামে জমিদারি পরিচালনা করতেন। চাঁদপুরের গান্ধী হিসেবে পরিচিত হরদয়াল নাগ এই রাজবাড়ির অধস্তন পুরুষ। তার পিতার নাম রামদয়াল নাগ।

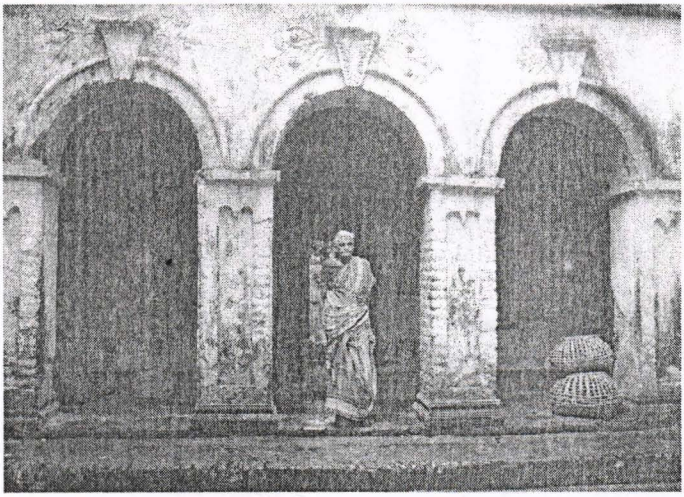

বারদুয়ারী নাগ রাজার বাড়ি

ঐতিহ্যের স্মারক চাঁদপুরের রূপালী ইলিশ

চকচকে রূপালী ইলিশ আর চাঁদপুরের সখ্যতা হাজার বছরের প্রাচীন। বাংলা অঞ্চলের লোক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে রূপালী ইলিশ অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পৃক্ত। রূপালী ইলিশকে বাদ দিয়ে চাঁদপুরকে কল্পনা করা যায় না। দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানসহ আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে ইলিশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ২.৯ লাখ মে. টন ইলিশ উৎপাদিত হচ্ছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান প্রায় শতকরা ১২ ভাগ। রূপালি ইলিশ খেতে যেমন সুস্বাদু, খাদ্যগুণেও তেমনি সমৃদ্ধ। পদ্মা-মেঘনা

www.pathagar.com

মোহনায় ইলিশ দেখতে পাতলা কোমরের রূপালী মেয়ের মতোই সুন্দর। অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব আর মোহময়ী মিষ্টিগন্ধের জন্যে জগৎ বিখ্যাত। এ কথা হয়তো অনেকেই জানেন না, মেঘনা নদীর পানি গুণগত ক্ষেত্রে পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা। প্রবল সূর্যকিরণ আর নদীর গভীরতার জন্যে পদ্মা-মেঘনার মিলিত স্রোতধারায় এক ধরনের প্লাংটন জন্মে, যা হচ্ছে ইলিশের প্রিয় খাবার। এই প্লাংটনগুলো দু'প্রকার। উদ্ভিজ্জ প্লাংটন ও প্রাণীজ প্লাংটন। এ খাদ্য ও প্রজননের প্রয়োজনে ইলিশ সাগর থেকে ছুটে আসে পদ্মা-মেঘনায়।

পুরাণবাজার বড়ো জামে মসজিদ

১৯০১-১৯০৬ সালের মধ্যে পুরাণবাজারের তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সর্বজনাব বজলুল গণি পাটওয়ারী, ওসমান বেপারী রায়পুরের বড় পীর সাহেবের অনুরোধে নদী বন্দরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করার নিমিত্তে ভূমি ওয়াক্ফ করে দেন। ওয়াক্ফকৃত ভূমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিশেষ করে বোম্বাই থেকে আগত নাখোদা ব্যবসায়ীদের অনুদানে এই বৃহদাকার অনুপম সুন্দর মসজিদটি নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে জৈনপুর ও ফুরফুরার পীর সাহেবদের অনুরোধে আয়াত আলী ভূঁইয়া, আমজাদ আখন্দ, হাজী লতিফ খান, হাজী জাফর খান প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় মসজিদটি বর্তমান আকার পায়।

মঠখোলার মঠ

১৭৫৭ সালের নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর ১৭৬১-১৭৭২ সালের মধ্যে মঠখোলার রায় পরিবারভুক্ত জমিদার ও মজুমদার পরিবারভুক্ত জমিদারবৃন্দ শিবমন্দির হিসেবে মঠটি নির্মাণ করেন। এখানে ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশীর মেলা বসতো। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন মঠটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে মঠটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে স্থানীয় জমিদার কৃষ্ট মজুমদার মঠটির সংস্কার করেছিলেন। আড়াইশত বছরের পুরোনো মঠটি চাঁদপুরের একটি প্রত্নসম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

সাচার রথ

কচুয়া উপজেলার ১নং সাচার ইউনিয়নে প্রাচীনকালে একটি জমিদার বাড়ি ছিল। যা বর্তমানে সাচার বাজারে অবস্থিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম। সাচারের তৎকালীন জমিদার বাড়ির পাশে ছিল জমিদারদের রঙমহল ভবন। যা বর্তমানে জমিদারদের স্মৃতিরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়িতে বাস করত গঙ্গাগোবিন্দ সেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাচার জগন্নাথ ধাম। লোভ-লালসা তাঁর জীবনকে কখনো স্পর্শ করেনি। জগন্নাথ দর্শনের জন্য তৎকালীন সময়ে পায়ে হেঁটে তিনি ভারতের শ্রীক্ষেত্র যেতেন। বাড়ি থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ও শুকনো খাবার নিয়ে পদযাত্রা শুরু করতেন জগন্নাথ দর্শনে। পথিমধ্যে যেখানে রাত হতো সেখানেই রাত্রিযাপন করতেন। কথিত আছে রাত্রিকালে শ্রী শ্রী জগন্নাথ জমিদার গঙ্গাগোবিন্দ সেনকে স্বপ্নাদেশে বলেন, ওহে গঙ্গাগোবিন্দ সেন! তোমার আর পায়ে হেঁটে শ্রীক্ষেত্রে যেতে হবে না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমিই তোমার বাড়িতে যাবো। তিনি বুঝে ওঠতে না পারলে পুনরায় তাকে স্বপ্নাদেশে বললেন, 'তোর বাড়িতে একটি মন্দির স্থাপন করবি, তোর দিঘিতে ৩ টুকরো নিম গাছ ভেসে আসবে। এ

www.pathagar.com

কাঠ জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়িতে নিবি। এ কাঠ দিয়ে জগন্নাথ, শুভ্রদা, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ তৈরি করার জন্য তোর কাছে অভিজ্ঞ সূত্রধর আসবে।' স্বপ্নাদেশ মোতাবেক নিমকাঠ আসলো। বিগ্রহ তৈরিতে সূত্রধর আসলো। গোবিন্দ সেন জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করলেন। ৩০/৪০ ফুট উঁচু একটি রথ নির্মাণ করলেন। রথটির চারপাশে চারযুগের ভবিষ্যৎ বাণী চিত্রসহ খচিত ছিল। কথিত আছে দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় মহাভাগ্যবান ও ভগবদ ভক্ত স্বর্গীয় গঙ্গাগোবিন্দ সেন কাশি নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিলেন। সেই পূণ্যের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে টুন্ডা রূপে অবতীর্ণ হন। যার রূপ দর্শন করলে পুনর্জন্ম বারণ হয় সেই জগন্নাথ টুন্ডা রূপে সাচারে স্থাপন হয়। যার কারণে বহু ভাগ্যবান হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দ সাচারে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের ২য় তিথিতে জগন্নাথ দর্শনে দেশ-বিদেশ হতে সমবেত হয়। ভারতের শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে না গিয়ে সাচারেই জগন্নাথ দর্শন করেন। সাচারের জগন্নাথ দর্শনে বাংলাদেশ ও পাশ্ববর্তী দেশগুলো থেকেও ভক্তরা আসেন।

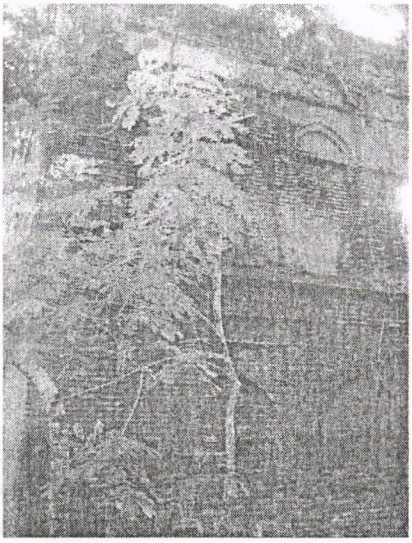

গজরা জমিদার বাড়ি (মতলব উত্তর)

মোলহেড

ডাকাতিয়া-মেঘনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত চাঁদপুর বড়ো স্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বের ত্রিকোণাকার অংশটি মোল হেড নামে পরিচিত। এখানে দাঁড়ালে খুব স্পষ্টভাবে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্ত দর্শন করা যায়। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সিলেটের চা বাগানে কুলি বিদ্রোহ ও কর্মস্থল ত্যাগী শত শত চা শ্রমিকের ওপর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিতে এখানে শতাধিক চা শ্রমিক শহিদ হয়। ১৯৭১ সনে এখানে পাক সেনাবাহিনী শত শত মুক্তিকামী মানুষকে হত্যা করে লাশ মেঘনার পানিতে ভাসিয়ে দেয়। মোলহেডে এখন 'রক্তধারা' নামে একটি স্মৃতিসৌধ আছে।

www.pathagar.com

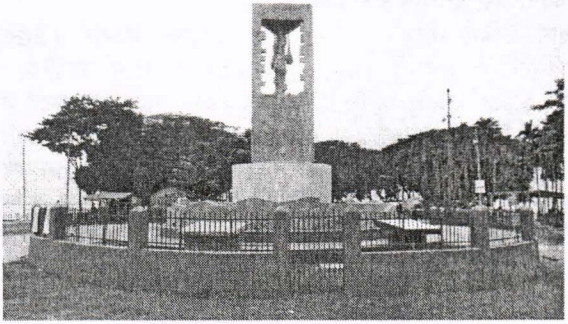

১৯৭১ সালের মহান শহিদদের স্মরণে 'রক্তধারা'

বেগম মসজিদ

১৮৮২ সনে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের এক বিদূষী বেগমের আর্থিক অনুদানে নির্মিত হয় বেগম মসজিদ নামের চাঁদপুর শহরের প্রথম মসজিদ। মসজিদ কমিটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন গান্ধী ভক্ত অসাম্প্রদায়িক জননেতা চাঁদপুর গান্ধী হরদয়াল নাগ। বর্তমানে বেগম মসজিদের একটি অনুপম সুন্দর দালান নির্মিত হয়েছে।

লেংটার মাজার

প্রায় দেড়'শ বছর আগে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় সোলায়মান নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেন এবং বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম প্রদর্শন করতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষের পোশাক পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেন। মতলব (উত্তর) উপজেলার বদরপুর গ্রামে এসে নিজের আস্তানা তৈরি করেন। হতাশা, অভাব আর জীবনের ওপর আস্থা হারানো হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাঁকে ঘিরে সোলায়মান শাহের দরগা গড়ে তোলে। সোলায়মান শাহই লেংটা ফকির নামে খ্যাত। প্রতি বছর এখানে মেলা বসে। এক বিশেষ শ্রেণির নারী-পুরুষ এখানে প্রতি বছর নেশার মেলা বসায়।

বদরপুর সোলেমান লেংটার মাজারের শিন্নির জন্য গরু

www.pathagar.com

ফরাজিকান্দি নেদায়েত ইসলাম কমপ্লেক্স

শায়খ বোরহান উদ্দিন নামে একজন পীরে কামেল মতলব (উত্তর) উপজেলার ফরাজিকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৩ সনে ম্যাট্রিক, ১৯৩৫ সনে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৩৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। বহু উচ্চপদে চাকুরি করার পর চাকুরি ছেড়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন। ১৯৪৯ সনে নিজ গ্রাম ফরাজিকান্দি উয়েসিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে এই মাদ্রাসাকে ঘিরে এক বিরাট কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। বর্তমানে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-গবেষণা, চিকিৎসা সেবা, কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান, সমবায়, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সমাজ সচেতনতা ও সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানসহ এক বিরাট কমপ্লেক্স গড়ে ওঠেছে মেঘনার কূল ঘেঁষে ফরাজিকান্দিতে। হাজার মানুষের মিলনমেলা এই ফরাজিকান্দি কমপ্লেক্স।

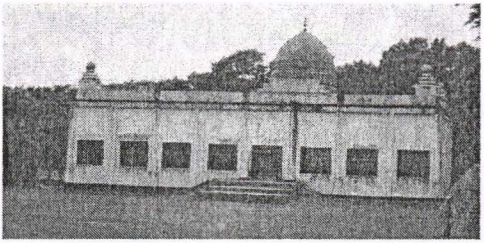

ফরাজীকান্দি কমপ্লেক্সের মসজিদ

ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরার লাগান বকুল গাছ

ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা তিনদিনের এক সরকারি সফরে ১৯৯০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঢাকা আসেন। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে মতলব উপজেলার মেঘনা পাড়ের ছোট্টগ্রাম এখলাসপুরে এসেছিলেন। মতলব উপজেলা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরের এই গ্রামে সফর করার সময় ফরাসী প্রেসিডেন্টের পত্নী মাদাম দানিয়েল মিতেঁরা সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রেসিডেন্টের স্ত্রী দানিয়েল মিতেঁরা এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত 'বন্যা ও মানুষ' শীর্ষক একটি আলোকচিত্র দেখেছেন। তাঁদেরকে মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের একটি মডেলও দেখানো হয়েছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ তাঁর আগমন উপলক্ষে সেখানে একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন ও বকুল গাছের চারা রোপণ করেছেন।

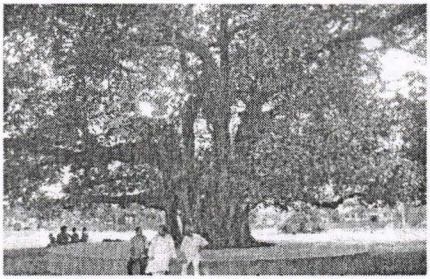

মতলব উত্তর উপজেলার ঘনিয়াপাড় গ্রামের বট ও ঝির গাছ

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান

মেহের : চাঁদপুর মহকুমার হাজীগঞ্জ (বর্তমান শাহরাস্তি) থানার অন্তর্গত মেহের একটি প্রাচীন স্থান। সর্বাবন্দ ঠাকুরের লীলাভূমি মেহের কালীবাড়ি হিন্দুদের তীর্থস্থান। আবার পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর নামক স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত মুসলমান দরবেশ শাহরাস্তির মাজার মুসলমানদের কাছে পূণ্যভূমি। লোকে বলে, এঁরা দু'জনই নাকি ছিলেন সমসাময়িক এবং চতুর্দশ শতাব্দের লোক।

মেহের থেকে 'সকল ভূ-পতি চক্রবর্তী' মহারাজা দামোদর দেব ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমতট মণ্ডলের বৈশগ্রাম বিষয়ে 'মেহার' গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে ২৫জন ব্রাহ্মণকে ৪ $\frac{১১}{১৬}$ দ্রোণ ভূমি দান করেছিলেন।

মেহেরে রাজা দামোদর দেবের রাজধানী ছিল কিনা সঠিকভাবে বলা যায় না। রাজধানী না হলেও এখানে যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল, তা এখান থেকে প্রদত্ত তাম্রশাসনই প্রমাণ করে।

এ স্থানে প্রাচীন কীর্তির কোনো চিহ্ন এখন আর টিকে নেই। তবে স্থানীয় প্রবীণ লোকদের কাছে জানা যায় যে, এ স্থানের প্রায় সর্বত্রই মাটির নিচে ইট পাওয়া যেত। শাহরাস্তির দরগাহর পার্শ্বে অবস্থিত ৫৮ একর আয়তনের জলাশয়টি দরবেশ কর্তৃক খনন করা হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে। খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ যুগে এর খনন হয়েছিল এবং দরবেশ এর পরে আস্তানা গেড়েছিলেন। দিঘিটির উত্তর-দক্ষিণ লম্বাকৃতিই প্রমাণ করে যে, এটি একজন অমুসলমানের কীর্তি।

সাচার : কচুয়া থানার অধীনে অবস্থিত এই অতি প্রাচীন গ্রামে গুপ্ত সম্রাটদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ গ্রামে প্রাচীন হিন্দু যুগের অনেক কীর্তি ছিল বলে জানা যায়। এখন কোনো কীর্তিই আর টিকে নেই। মাটির নিচে প্রাচীন যুগের ইট-পাথর ও কালের হাঁড়ি-পাতিলের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

বরদাখাত বা বলদাখাল পরগণাসহ এ জেলার এক বিরাট এলাকা সে সময়ে মসনদ-ই-আলী ঈসা খাঁর বংশধরদের জমিদারি ছিল বলে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর দিকে সরাইল পরাগণাসহ এক বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল সরাইলের দেওয়ান বংশীয় জমিদারদের অধীনে। চাঁদপুর অঞ্চলও ঈসা খাঁর বংশধরদের জমিদারি ছিল বলে জানা যায়। এসব জমিদার মোগলদের অধীনে ছিলেন।

ঐতিহাসিক স্থানের নামকরণ ও ইতিহাস

স্থাননাম

নারায়ণপুর : বোয়ালজুড়ি খালের পাড়ে নারায়ণপুর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে প্রাচীন জমিদারদের প্রায় বারোটি কাচারীঘর ছিল। নারায়ণপুর বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে বেশ উঁচুভূমিতে সিদ্ধপুরুষ মীর্জা হোসেন আলীর মসজিদ অবস্থিত ছিল যা ১২০৭ হিজরিতে স্থাপিত। এক গম্বুজের সুদৃশ্য মসজিদটির আয়তন দৈর্ঘে-প্রস্থে সমান ২২′ বা ২২′। সামনের পাকা প্রাঙ্গন ২৪′ বাই ২৪′। দেওয়ালের ঘনত্ব ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। উত্তর পাশেই তিনি একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালী বটগাছ নামে

www.pathagar.com

একটি পুরনো বটগাছ ছিল। নারায়ণপুর পরগণা বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহে ভর্তি ছিল। এখানে নারায়ণ ও গণেশের বিগ্রহও ছিল। কালাপাহাড়ির ভয়ে পুকুর ও দিঘিতে দেবদেবতারা লুক্কায়িত ছিল। এরূপ অনেক মিথ জড়িয়ে রয়েছে এ এলাকায়।

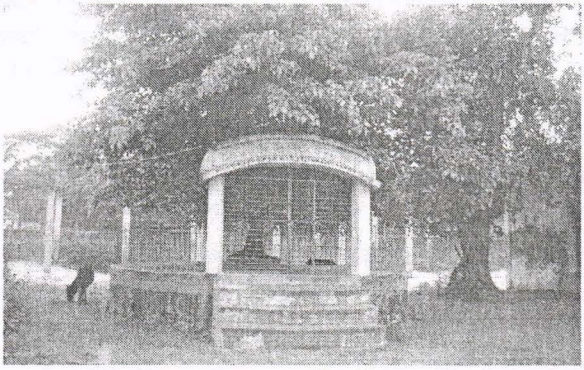

নারায়ণপুর কালী মন্দির

কাশিমপুর : নারায়ণপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বোয়ালিজুড়ি খালের অদূরে পশ্চিমে এক উচ্চভূমিতে কাশিমপুর অবস্থিত। কথিত আছে জমিদার কাশিম খানের নামানুসারে কাশিমপুর গ্রাম। তবে কাশিম খান বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। রাজা রাম রায়ের জমিদারি ছিল এ কাশিমপুরে। এ জমিদার বাড়িতে ৬০ কেজি রনার তৈল লাগতো প্রতিদিন আলো জ্বালানোর জন্য। কাশিমপুরের পূর্ব নাম ছিল সৈয়দপুর যা ইতকাদপুর পরগণায় ছিল। লাকসামের জমিদার নবীনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও অমর কৃষ্ণ রায় চৌধুরী যারা নওয়াব ফয়জুননেসার ফুফা ছিলেন, তাদের সাথে রাজা রাম রায়ের আত্মীয়তা ছিল। কাশিমপুরে ৩টি উঁচু প্রাচীন মঠ রয়েছে। বারদুয়ারী মঠ। জমিদার বাড়িতে আন্ধারমানিক নামক ধনাগার এখনো বিদ্যমান। কাশিমপুরে এখনো ৫০০ বছরের একটি তেঁতুল গাছ রয়েছে। নাগ দিঘি রয়েছে এ কাশিমপুরে।

নায়েরগাঁও : ধনাদোগা নদীর পূর্বপাড়ে নায়েরগাঁও গ্রাম অবস্থিত। পূর্বে এটা কানাচোয়ার হাট বলে অভিহিত ছিল। কথিত আছে ব্যবসায়ীদের অনেক নাও (নৌকা) বাঁধা থাকতো বলে নায়েরগাঁও নাম ধারণ করে। ক্রেতা বিক্রেতারা নৌকায় বসেই কেনাবেচা সারতো তথা নায়ে নায়ে বেচাকেনা চলতো। এ গ্রামে রামচন্দ্র মল্লিক নামে এক জমিদার ছিলেন। জমিদারের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। মতলব দক্ষিণ উপজেলার মধ্যে নায়েরগাঁও বাজার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্র। এখান থেকে হাজার হাজার মণ আলু সারাদেশে সরবরাহ হয় এবং দেশের বাইরেও রপ্তানি হয়। পূবালী ব্যাংকের শাখা, তহসিল অফিস, আইসিডিডিআরবি হাসপাতাল, খাদ্য গুদাম ও ধনাদোগা নদীর ঘাট রয়েছে।

আশ্বিনপুর : ইবনে বতুতা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম ও সিলেট ভ্রমণকালে পথিমধ্য ধর্মশহর বন্দরে (বর্তমান আশ্বিনপুরে) কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন মর্মে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা পাওয়া যায় (মুসলিম বাংলার ইতিহাস, পৃ. ৯৩)। নায়েরগাঁও দক্ষিণ ইউনিয়নে

www.pathagar.com

আশ্বিনপুর গ্রাম অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে বাবু অশ্বিনীকুমারের নামানুসারে আশ্বিনপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছে। আশ্বিনপুর ধর্মশহর নামে পরিচিত ছিল। পাটেশ্বর রাজা বা প্রাণেশ্বর রাজার রাজধানী ছিল মর্মে কথিত আছে। এ গ্রাম আনুমানিক দেড় হাজার বছর প্রাচীন। কিছুদিন এ আশ্বিনপুর এলাকা বিরান এলাকা ছিল। এ এলাকায় কলেরা, বসন্ত, মহামারী হিসেবে ঘন ঘন দেখা দিতো। পাটোয়ারী বাড়ি ছিল বুর্জং বাড়ি। বুরুজ মানে কিল্লা। প্রাচীন বৌদ্ধ আমলে বুর্জং বাড়ি সাগর থেকে জেগে উঠে। কিল্লাটি জলদস্যুর আড্ডা ছিল। সপ্তডিঙ্গা বোঝাই মণিমাণিক্য মগ রাজারা নিয়ে যাবার সময় নৌকাডুবি হলে সেই মণিমাণিক্য স্বর্ণমুদ্রা ও ডিঙ্গাগাছ এখনো পাওয়া যায়। আশ্বিনপুর সমৃদ্ধ শহরের আয়-ব্যয় রক্ষার জন্য লাকের বুরুজং প্রসিদ্ধ ছিল। আশ্বিনপুর স্কুলের পশ্চাতে প্রায় ৭০০ বছর পুরনো দিঘি রয়েছে। দিঘির তলদেশ পাকা। মাটির নিচে পুরনো ভবনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এখানে ৫০০ বছরের পণ্যের কেনাবেচা হতো। এখনো ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া যায়।

মেহারন : নায়েরগাঁও দক্ষিণ ইউনিয়নের বোয়ালজুড়ি খালের পাড়ে মেহারণ গ্রামটি অবস্থিত। প্রায় ৪০০ বছর আগে কাশিমপুর জমিদার ও গৌরীপুর জমিদারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থেকে রণক্ষেত্র তৈরি হয় যা বর্তমান মেহারণ নামক স্থানে। যে কারণে মহারণ থেকে মেহারণ নামের উৎপত্তি। মতান্তরে, ত্রিপুরার রাজার সাথে পশ্চিম দেশীয় কোনো অমাত্য ফৌজের এক মহা 'রণ' সংগঠিত হয়। মহা 'রণ' থেকে মেহারণ যা থেকে মেহারন গ্রামের নামটির উৎপত্তি। সে সময় লাকসামের জমিদার এসে পার্শ্ববর্তী আলীয়ারাতে বসে খাজনা আদায় করত। দূরের জমিদার বলে চাষিরা খাজনা দিতে রাজী হতো না। তখন লাকসামের জমিদার কালীবাবু মেহারনের জমিদার দ্বারিকানাথ দাস ও বৈকুণ্ঠ দাসের সাথে আলোচনা করে খাজনা তোলার দায়িত্ব দিল। এরপর থেকে মেহারনের জমিদাররা আলীয়ারা কাচারী ও নারায়ণপুর কাচারীতে বসে খাজনা উঠাতো এবং এর ভাগ লাকসামের জমিদারকে দিতো (বছরে আড়াইশত টাকা খাজনা)। দ্বারিকানাথ দাস ও বৈকুণ্ঠ দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস যখন খাজনা আদায় শুরু করলো তখন মানুষ তাদেরকে দালাল বলে ডাকতো। সেই থেকে মহারনের জমিদারদের নামের সাথে দালাল উপাধি যুক্ত হয়।

ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্ব

মিজানুর রহমান চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে মিজানুর রহমান চৌধুরী ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আকর্ষণীয়, রসাত্মক অথচ জ্ঞানগর্ভ বাগ্মিতা ও অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা তাঁকে দেশের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৃটিশ ভারতে তাঁর রাজনীতি শুরু। পাকিস্তান আমলে তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী। আর বাংলাদেশ আমলে সরকার ও বিরোধী দল-উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানে। রাজনীতির এই তিনকালে তিনি কখনো কর্মী, কখনো সংগঠক, কখনো নেতৃত্বে,

www.pathagar.com

আবার কখনো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন। অর্ধশতকের অধিককালের এই বৈচিত্র্যময় রাজনীতিকের স্মৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ মূল্যবান অভিজ্ঞতাময়। তিনি আওয়ামীলীগ ও জাতীয় পার্টির দুর্দিনের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করায় তাঁকে রাজনৈতিক বোদ্ধারা 'ক্রাইসিস লিডার' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

বর্ষীয়ান জননেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৯২৮ সালের ১৯ অক্টোবর চাঁদপুর শহরে পুরানবাজার এলাকায় পূর্ব শ্রীরামদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম মোঃ হাফিজ চৌধুরী ছিলেন তার পিতা এবং মরহুমা মোসাম্মৎ মাহমুদা বেগম ছিলেন তাঁর মাতা। তাঁর মামার বাড়ি কচুয়ার চিতড্ডা গ্রামের চৌধুরী বাড়ি। তিনি পুরানবাজারস্থ ২নং বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শেষ করে নূরীয়া হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি চাঁদপুর কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর ফেনী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আইন বিষয়েই অধ্যয়ন করেন। বিএ পাশের পরই তিনি কাস্টমস্ বিভাগের প্রিভেনটিভ অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময় তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্মৃতিময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নূরীয়া হাই স্কুল মাদ্রাসাটি গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের অভাবে সরকারি অনুমোদন হারাবার উপক্রম। তাই তিনি সরকারি চাকুরি ছেড়ে এই মাদ্রাসায় গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি পাটের ব্যবসাও শুরু করেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী ছিলেন স্থানীয় র‍্যালি ব্রাদার্সের একজন কমিশন এজেন্ট।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্রলীগের কুমিল্লা জেলা শাখার সহ-সভাপতি হিসেবে। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ার কোরের তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৫০ সালে ফেনী কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মিজানুর রহমান চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি চাঁদপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৯ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চাঁদপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হিসাবে কারাবরণ করেন। এর পূর্বেও ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। জেলে থাকাকালীন মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নেন এবং নির্বাচনের পূর্বে হাইকোর্ট তাঁকে মুক্তি প্রদান করে। ১৯৬৮ সালে তিনি সংযুক্ত বিরোধী দলের আহ্বায়ক ছিলেন এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিস্ময়কর বিজয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবময়। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সংগঠক। ১৯৭২ সালে তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রী হন। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে

www.pathagar.com

পদত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। বাকশাল প্রশ্নে মত পার্থক্যের কারণে ১৯৭৭ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে মিজানুর রহমান চৌধুরী জনদলের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান ও ১৯৮৫ সালে মহাসচিব ছিলেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হন এবং সংসদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে তিনি সপ্তমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

এরশাদ সরকারের পতনের পর চরম দুঃসময়ে তিনি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে অষ্টমবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সাল থেকে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় সংসদে তাঁর প্রতিনিধিত্ব শুরু হয় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ১৯৯১ সালে চাঁদপুর-৪ আসনে জাতীয় পার্টির টিকেটে নির্বাচন করে পরাজিত হন। এমতাবস্থায় দলের জন্য শ্রম, মেধা ও ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ রংপুরের মিঠা পুকুরে তাঁর ছেড়ে দেয়া আসনে উপ-নির্বাচনে মিজান চৌধুরীকে মনোনয়ন দেন এবং এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৯৯ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পার্টির (মিজান-মঞ্জু) কাউন্সিলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্যায়ে ২০০১- এর সংসদ নির্বাচনের আগে ২৭ আগস্ট জাতীয় পার্টি ছেড়ে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ওই বছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য মনোনয়ন নেননি ।

রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালে হারারেতে অনুষ্ঠিত ৮ম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং ১৯৭৪ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে মিজান চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। '৭০ দশকের শেষ ভাগে পর্তুগালের লিসবনের 'ফিলিস্তিনিদের অধিকার সংরক্ষণ' আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগদান করেন।

বেগম সাজেদা মিজান চৌধুরী তাঁর সহধর্মিণী। বর্তমানে তাঁর রয়েছে ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে। মিজান চৌধুরী ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী

খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম- আলী রাজা চৌধুরী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য ছোটোবেলায় স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষা পাননি। বাড়িতে শিক্ষা প্রাপ্ত আত্মশিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর আত্মশিক্ষা তাঁকে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী করেছে।

১৯২৯-৪০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন চাঁদপুর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। আর ১৯৩০-৫৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর ছিলেন কুমিল্লা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি পর্যায়ে এতো দীর্ঘকাল কাজ করা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালনের পঁচিশ বছর পূর্তিতে 'জুবলী উৎসব' বা 'রজতজয়ন্তী' পালন করে।

তৎকালীন পূর্ব-বঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের সমিতির তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। তাঁর সদিচ্ছার ফলে ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রশস্ত রাস্তাঘাটের উপর লোহার নির্মিত পুল স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন অবস্থায় এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি আজীবন মুসলিম লীগের সদস্য, জেলা সভাপতি ও প্রাদেশিক লীগের সদস্য। তিনি ১৯৩৭-৪৫ এবং ১৯৪৭-৫৩ সাল পর্যন্ত দু'বার ছিলেন বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য।

হরদয়াল নাগ

হরদয়াল নাগ ১৮৫৩ সালে মতলব উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ নাগ, মাতা গোবিন্দ প্রিয়া। ১৮৭৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এফ.এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে স্বল্পকালীন সরকারি চাকুরির পর ১৮৮৩ সালে মোক্তার হিসেবে আইনের সনদ লাভ করেন। চাঁদপুর বারে আইনবিদ হিসাবে তিনি অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বহু বৎসর তিনি বার সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি আইন ব্যবসায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস- এর আহ্বানে হরদয়াল নাগও আদালত বর্জন করে দেশমাতৃকার মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু তিন মাস পর এই আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ আইন ব্যবসার চেয়েও দেশসেবাকে উচ্চস্থান দিয়েছেন।

ঢাকা অবস্থানকাল 'ঢাকা প্রকাশ (১৮৭৬) ও 'ভারত হিতৈষী/হিতৈষিণী' (১৮৮০-৮৩) পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস এর দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম যোগ দেন এবং আজীবন রাজনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন (১৮৮৬-১৯৪২)।

১৯০৩ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হরদয়াল নাগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে মেহেরকালী বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় ৩৩জন কর্মীসহ প্রথম গ্রেফতার হন। কথা ও কাজে নাগ মহাশয় ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রতীক। ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সাথে জড়িত হন এবং ১৯২২-২৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন এর সহসভাপতি। ১৯০৬ সালের মে মাসে জননায়ক হরদয়াল নাগ- এর নেতৃত্বে চাঁদপুরে স্থাপিত হয় জাতীয় বিদ্যালয় এবং তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সাথে চলে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

১৯২১ সালের এপ্রিল-মে মাসে সিলেটের চা বাগানের কুলিদের বিদ্রোহ ও কর্মত্যাগ এক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। কুলিদের পাশে এসে দাঁড়ান সেবাব্রতী হরদয়াল নাগ। এ সমস্যা সমাধানে ছুটে আসেন দেশের নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় নেতৃত্বে ছিলেন হরদয়াল নাগ। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। হরদয়াল নাগ ১৯৩০ সালের লবণ আন্দোলনে ত্রিপুরা, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার নেতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩১ সালে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কনফারেন্স-বহরমপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস এর ৫০তম বর্ষপূর্তিতে জুবলি উৎসবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় পৌরহিত্য করেন। শেষবারের মত তিনি গান্ধীজির সাথে মিলিত হন বিক্রমপুর মালেকান্দ গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁর বাড়ীতে গান্ধীজি এসেছেন তিনবার। গান্ধীভক্ত হিসাবে তাকে বলা হত 'চাঁদপুরের গান্ধী'। চাঁদপুরের এই মহান নেতা ১৯৪২ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ নওজোয়ান

রাজনৈতিক নেতা মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ নওজোয়ান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চর-রামপুর গ্রামে জানুয়ারি ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ ওয়াজউদ্দীন সরদার।

নিজ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। পরবর্তীকালে তিনি পার্শ্ববর্তী কালীর বাজার জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু ১৯২১ হতে ১৯২৪ পর্যন্ত, তিন বছর তাঁর শিক্ষাজীবন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এর মূল কারণ খেলাফত আন্দোলন। তিনি ১৯২১ সালে লেখাপড়া ছেড়ে এই খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। পুনরায় ১৯২৪ সালে চাঁদপুর গণি মডেল হাই স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি কুমিল্লা কলেজে আই,এস,সি-তে ভর্তি হন এবং ১৯৩৩ সালে আই,এস,সি পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন বরিশালের বি.এম. কলেজে। এখানে তিনি বি.এস.সি-তে পড়াশুনা করেন। কিন্তু ঐ বছরই তিনি কলিকাতায় গিয়ে বংগবাসী কলেজে ভর্তি হন বি,এস,সি-তে। উল্লেখ্য যে, এই কলেজে ৪,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান। ১৯৩৬ সালে তিনি বি,এস,সি পাশ করেন। এখানে শেষ হয় তাঁর শিক্ষাজীবন।

রাজনীতিতে পূর্ব প্রবেশের পূর্বে তাঁর চাকুরি জীবন ছিল মাত্র ১ বৎসর। কিন্তু এই ১ বৎসরেই তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় শিল্প গবেষণা পদে তিনি এই স্বল্পায়ু চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি কেমিস্টের পদ গ্রহণ করেন এবং গবেষণার মাধ্যমে কচুরীপানা হতে হার্ডবোর্ড আবিষ্কার করেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় স্কুল জীবনেই। তিনি ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়ার পর প্রতিটি সভায় জাগরণী গান ও বক্তব্য রাখতেন। পরে অসহযোগ আন্দোলন করে বহু বিদেশি কাপড় ও দ্রব্য সামগ্রী অগ্নিদাহ করেন। এই সকল কারণেই তাঁর তিন বৎসর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে তিনি চাঁদপুর গণি স্কুলে ভর্তি হয়েও তাঁর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। তিনি জনগণকে আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করতেন।

www.pathagar.com

শাহেদ আলী পাটোয়ারী

রাজনীতিবিদ শাহেদ আলী পাটোয়ারী ১৮৯৯ সালে মতলবের আশ্বিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলী মামুদ পাটোয়ারী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিজ এলাকায় সম্পন্ন করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক সম্মান অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ১ম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি কুমিল্লা জর্জ কোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন ১৯২৫ সালে। রাজনৈতিক জীবনে শাহেদ আলী পাটোয়ারী ১৯২৯ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে প্রথম বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে চাঁদপুর পশ্চিম নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট সভায় স্পিকারের দায়িত্ব পালনকালে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি ও বাকবিতণ্ডার এক পর্যায় তিনি সংসদেই আহত এবং তিনদিন পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল করিম পাটওয়ারী

আব্দুল করিম পাটওয়ারী ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সালে চাঁদপুর শহরের তালতলা পাটওয়ারী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম রৌশন আলী পাটওয়ারী। ৭৫ বৎসর বয়সে ২১শে জানুয়ারি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬৬ সালে পৌরসভার সদস্য ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ গঠিত হলে, তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আওয়ামী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এক সক্রিয় নেতা সংগঠক হিসাবে চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর চাঁদপুর মহকুমার প্রশাসক ও বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আজীবন সৎ এই মানুষটি গণমানুষের প্রাণের নেতা ছিলেন। তার বিখ্যাত উক্তি "কষ্ট করিয়া হইলেও সৎ থাকিবার চেষ্টা করিও" উক্তিটি এপিটাফ হিসাবে তাঁর সমাধিতে উৎকীর্ণ করা আছে।

বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরী

বিচারপতি বি.বি. রায় চৌধুরী ১৯৩৫ সালের ১লা নভেম্বর চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার বাকিলার ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। মায়ের নাম মৃণালিনী রায় চৌধুরী। বি বি রায় চৌধুরী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিচারপতি বি বি রায় চৌধুরী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৬২ সালে সুপ্রিম কোর্টে বারে আইনজীবী হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে তাকে সহকারী এটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। ১৯৮০ সালের জুলাই পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিল্যান্ট ডিভিশনের তালিকাভুক্ত সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন। বিচারপতি রায় ১৯৮৫ এর ২রা জুলাই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত জগন্নাথ হল ট্রাজেডির ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।

বি বি রায় চৌধুরী ২০০১ সালের ১৬ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। বি বি রায় চৌধুরী অকৃতদার। বি বি রায় চৌধুরী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। বাকিলা উচ্চবিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও বাকিলা বাজার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। প্রয়াত বিচারপতি বি বি রায় চৌধুরী জীবিতকালে কৈবল্যধামসমূহের মহারাজ হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সারা বিশ্বে মোট ৮০টি কৈবল্য ধাম আছে। তার মধ্যে ২০ থেকে ৩০টির অবস্থান বাংলাদেশে। প্রয়াত বিচারপতি চৌধুরীকে চট্টগ্রামস্থ কৈবল্যধামে সৎকার করা হয়েছে।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) রফিকুল ইসলাম

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মোঃ রফিকুল ইসলাম ১৯৫২ সালে মতলব উপজেলার বাইশপুর গ্রামে দেওয়ান বাড়ির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার চাকুরিস্থল পাকিস্তানেই তার পড়াশুনা শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান বিমান বাহিনী পাবলিক স্কুল, সারগোদায় পড়াশোনা করেন এবং ১৯৬৭ সালে প্রথম বিভাগে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর তিনি বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৩ই মার্চ ১৯৭১ সালে পাইলট অফিসার হিসাবে কমিশনপ্রাপ্ত হন। একই বছর তিনি পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (এইআরও) পরীক্ষায় প্রথম হন। করাচিতে ট্রেনিংরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর ওয়ার্কস ক্যাম্প এ আটক রাখা হয়। ১৯৭২ সনে পালিয়ে এসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। একই বছর তিনি রাশিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। তিনি পরিবহন বিমানের ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার স্কোয়াড্রন ও উইং অধিনায়ক, পরিচালক, ঘাঁটি অধিনায়ক ও একাডেমী কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ থেকে স্টাফ কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং চীন থেকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। পাকিস্তান, আমেরিকা ও তুরস্ক থেকেও পেশাগত কোর্স সম্পন্ন করেন এবং দুই বৎসর স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষক ছিলেন।

১৯৮৯ সালে প্রথম ঘাঁটি অধিনায়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৪-৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ দূতাবাস, মালয়েশিয়ার সামরিক উপদেষ্টা এবং ১৯৯৭-২০০০ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।

www.pathagar.com

জহিরুল হক পাঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার অলিপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল গণি পাঠান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বর্তমান চাঁদপুর জেলার মতলব, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাইমচর, চাঁদপুর ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে যে বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালনায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তৎকালীন সুবেদার জহিরুল হক পাঠান।

জহিরুল হক পাঠান ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে যে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছিলেন তাদের একজন হলেন জহিরুল হক পাঠান। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর বাঙালি বীর জহিরুল হক 'তঘমায়ে জুরাত' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে জহিরুল হক পাঠানকে ৬টি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭১ সালের শুরুতে জহিরুল হক পাঠান ছিলেন যশোহর ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বদলি করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী পাঠান সেখানে না গিয়ে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে চলছে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যুব সমাজ সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। তৎকালীন এমসিএ ডাঃ আবদুস সাত্তারের পরামর্শে হয়ে জহিরুল হক পাঠান মুক্তিবাহিনী গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭১ সালের ১৮ই মার্চ ঐতিহাসিক অলিপুর দিঘির পাড়ে ২০ জন তরুণ গিয়ে একটি চৌকস সেনাদল গড়ে তোলেন। এই সেনাদলটিই পরবর্তী মধুমতি কোম্পানি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একই সাথে জনাব আবদুল করিম পাটোয়ারী এমসিএ ও এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এবং আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট আবু জাফর মাঈনুদ্দিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জহুরুল হক পাঠান চাঁদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে ৩০০ লোকের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং পুরো অঞ্চলে পাক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চাঁদপুর পাক হানাদার বাহিনী মুক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জহিরুল হক পাঠানের সেক্টরের কোড নেম ছিল মধুমতি নাম্বার ১২০৮।

ট. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং নয় মাস পরে ১৬ ডিসেম্বর-এর বিজয় অর্জন ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থাৎ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম, যা জনযুদ্ধে রূপ নেয়। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ একদিনে শুরু হয়নি। একটি জাতির অভ্যুদয়ও মাত্র নয় মাসের সংঘটিত যুদ্ধের ফলে হয়নি। এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনের ইতিহাস বহু পুরোনো। প্রায় সহস্র বছরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজকের এই অবয়ব পেয়েছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁদপুরে প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কাঠামো

চাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে, ইউনিয়নে, থানায় থানায়, ২৫শে মার্চের অনেক পূর্বেই দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলো গোপনে গোপনে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিল। প্রতিরোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্বক্ষণ সেই দিনগুলোতে অনেকে গোপনে দেশি হাতিয়ার ও বোমা তৈরি করেছে। বোমা তৈরির সময় বোমা বিস্ফোরণে চাঁদপুরে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী শাহাদাৎ বরণ করেছিল। তাঁরা হলেন- শহিদ আবুল কালাম, শহিদ আব্দুল খালেক, শহিদ সুশীল, শহিদ শংকর। চাঁদপুর ট্রাকরোড বালুর মাঠের পাশে বর্তমানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। সেই সৌধের স্মৃতিফলক আজো চাঁদপুরের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা। চাঁদপুর মহকুমা সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা কর্মীরাও স্বাধীনতার আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের উদ্যোগে চাঁদপুর নতুনবাজার বালির মাঠে কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ, ন্যাপের নেতা কর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই সংগ্রামে সরাসরি জড়িত হন। যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন- রবিউল আওয়াল কিরণ, আব্দুল মোমেন মাখন, আবু তাহের দুলাল, মনিরুল হক, আব্দুল আজিজ (সকিদ রামপুর), ওয়াহিদুর রহমান (কচুয়া), হানিফ পাটওয়ারী, মজিবুর রহমান, সৈয়দ আবেদ মনসুর, খসরু (নাজির পাড়া), আব্দুল মোমেন (ছোটো সুন্দর), আব্দুল লতিফ, চন্দন পোদ্দার প্রমুখ। তাদের সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। তাদের নেতৃত্বে চাঁদপুরের বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে ওঠে। ছাত্রনেতাগণ চাঁদপুর শহরসহ মহকুমার বিভিন্ন ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুব শক্তিকে একত্রিত করে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। চাঁদপুর মহকুমার তিনটি থানার মোড়ে অবস্থিত (হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ) অলিপুর গ্রামে ১৭ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ শাখার সেনা, তৎকালীন হাবিলদার আঃ সাত্তার অলিপুর গ্রামে ৩০ জন ছাত্র, কৃষক, ছুটি ভোগরতঃ সেনাসদস্যদের নিয়ে একটি গেরিলা দল গঠন করেন। অলিপুর দিঘির পাড়ে তিনি ছাত্র-শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এই দলটিতে পরবর্তী পর্যায়ে অনরারী ক্যাপ্টেন আঃ গফুর, তৎকালীন সময়ে হাবিলদার হারেস ওস্তাদ, নায়েক মোস্তফা কামাল, হাবিলদার হাফেজ মিয়া যোগ দেন। তৎকালীন সুবেদার পরে অনরারী ক্যাপ্টেন জহিরুল হক পাঠান ১০ই এপ্রিল এই দলটির অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দলটি ছিল পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১২০৮ সাব সেক্টরের নিউক্লিয়াস। এই দলটির বিস্তৃতি ঘটার পর মে মাসের শেষ দিকে এর নাম হয় মধুমতি কম্পানি। তৎকালীন ছাত্র এফ. এফ. কমান্ডো লিডার এ. এফ. আজিম, কমান্ডো লিডার দেলোয়ার হোসেন, তরিব উল্লাহ পাঠান এই দলের প্রাথমিক পর্যায়ের মুক্তিসেনা ছিলেন। চাঁদপুর মহকুমার মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। তবে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যারা সক্রিয় ছিলেন, তাদের মধ্যে আব্দুল মান্নান বি.এস.সি, আব্দুর রব বি.এস.সি, হাবিলদার রশিদ, আবদুর রব শেখ, আমিনুল হক মাস্টার, হাফেজ আহম্মদ (তৎকালীন হাজিগঞ্জ মসজিদের ইমাম) এবং তাঁদের সহযোগী অসংখ্য নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করার

www.pathagar.com

মতো। পাঠানের নেতৃত্বে এই প্রতিরোধ বাহিনী দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। নরিংপুর, টোরাগড়, অলিপুর গ্রামের মতোই তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের আহবানে ছাত্র-যুবকরা সংগঠিত হতে শুরু করে। ২৫ মার্চ কালো রাতে পাক সেনাবাহিনীর বর্বর হামলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, সীমাহীন অত্যাচার ক্ষণিকের জন্যে বাঙালি জাতিকে হতচকিত করলেও তারা ফুরে দাঁড়ায়। অপ্রত্যাশিত ধ্বংসযজ্ঞের কারণে ক্ষণিকের জন্যে বাঙালিরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। প্রথমদিকে চাঁদপুর অঞ্চলে প্রচুর দক্ষ সৈনিক থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রের মধ্যে ছিল দু'চারটি শিকারী বন্দুক, ভোঁতা রাইফেল। এছাড়া যুদ্ধকরার মতো তেমন কোনো হাতিয়ার ছিলনা। মুরগীর রক্ত গায়ে মেখে মামলা রুজু করার কৌশলে হাজিগঞ্জ থানায় গিয়ে কৌশলে পুলিশদের ডিজআর্ম করে ৬টি রাইফেল, একটি পিস্তল, ২৬৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলি সংগ্রহ করা হয়। এরপর গেরিলা কায়দায় একজন পাকসেনাকে মেরে তার কাছ থেকে প্রচুর গুলি ও একটি রাইফেল উদ্ধার করে সদ্য গঠিত মুক্তিসেনারা। কুমিল্লা সীমান্ত চৌকি থেকে পাক-সেনাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে একটি ইপিআর দল আহত ও ক্লান্ত অবস্থায় চাঁদপুর অঞ্চলের শ্রীপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের নিকট থেকে দু'টো হাল্কা মেশিনগান ও কিছু বুলেট পাওয়া যায়।

সংগ্রাম পরিষদ

চাঁদপুর মহকুমার ফরিদগঞ্জ থানা সে সময়ে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ছিল প্রাকৃতিকভাবে দুর্ভেদ্য এলাকা। সঙ্গত কারণে সকল মুক্তিসেনারা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি ফরিদগঞ্জে এসে জড়ো হতে শুরু করে। বাস্তব অবস্থার নিরিখে একটি শক্ত সাংগঠনিক কার্যকর প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পাইকপাড়া গ্রামে তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিবর্গ এক জরুরি সভায় মিলিত হন। সেখানেই গড়ে ওঠে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ। প্রাথমিকভাবে চাঁদপুর মহকুমার সংগ্রামী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্থাপিত হেডকোয়ার্টার চাঁদপুর আনসার ক্লাব (বর্তমানে উইমেন্স কলেজ হোস্টেল) থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ইতোমধ্যে প্রতিটি থানায় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যুবকদের ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ভারতে তখন বাংলাদেশ থেকে শত শত নর-নারী সহায় সম্বল, ঘর-বাড়ি, ভিটে-মাটি ফেলে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আশ্রয় নেয়। এপ্রিলের শেষ দিকে অন্যান্য জেলা শহরগুলো যেমনিভাবে এক এক করে পাক হানাদারদের হাতে চলে গেল, চাঁদপুরকেও সেভাবে জল ও স্থল পথে আক্রমণ করে পাকসেনারা তাদের দখলে নিয়ে নিল। চাঁদপুর থেকে বিভিন্ন দলে মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ কেউ অন্যত্র চলে গেলেও নেতারা হতোদ্যম হন নাই। ৪ এপ্রিলের পর নানা স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাইক পাড়ায় এসে ভীড় জমাতে শুরু করে। এ সময় পাইক পাড়ায় নায়েব সুবেদার আব্দুর রব সৈনিকদের একত্রিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চাঁদপুর আনসার ক্যাম্পে স্থাপিত এ সদর দপ্তর ভেঙ্গে যাওয়ার পর, অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান, অনেকে পুনরায় সংগ্রাম কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাইকপাড়া হাইস্কুলে একত্রিত হন। সে সময় যারা

www.pathagar.com

মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন– করিম পাটওয়ারী (তৎকালীন এম.পি.এ), আলী আহম্মদ (হাজিগঞ্জ), আবুল খায়ের, সালে আহম্মদ বিএসসি, ইদ্রিছ মোল্লা (ফিঙ্গরা), আলী আজম মজুমদার (আওয়ামী লীগ নেতা), তোফাজ্জল হায়দার (নসু) চৌধুরী, কলিম উল্যা ভূঁইয়া, জীবন কানাই চক্রবর্তী প্রমূখ। এক সময় উগারিয়া চৌধুরী বাড়িতেও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী সংগ্রাম পরিষদের দফ্তর ছিল। ২৫ মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করেছিল তা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন শহরে, নগরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ অসহায়ের মতো সহায়-সম্বল হারিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রামে-গঞ্জে ছুটে যায়। সেই অসহায় মানুষ যখন ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থান থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে, জীবন বাঁচানোর জন্যে চাঁদপুরে নৌকায় বা পায়ে হেঁটে আসে। তাদের সাহায্যে সংগ্রাম কমিটির লোকজন চাঁদপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খোলেন। যার যা ছিল টাকা-পয়সা, চিড়া-মুড়ি, ডাল, চাল, গুড়, চা, চিনি, বিস্কুট, পানি ইত্যাদি নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। স্থানীয়ভাবে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী সেনারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোরা দেশের অভ্যন্তরে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক শ্রেণি থেকে আগত মুক্তিসেনাদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়। সেই অগ্নিঝরা সময়ে এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রশিক্ষকগণ হলেন-ওস্তাদ গফুর, ওস্তাদ ওহাব, মুহাম্মদ আলী (টিকে), হাবিলদার আবদুল মান্নান (মতিন), সিরাজুল ইসলাম, সুবেদার আবদুল হক প্রমুখ। ক্যাঃ জহিরুল হক পাঠান-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং পরিচালিত হয়। বৃহত্তর হাজিগঞ্জের টোরাগড়, নরিংপুর বাজার, লোটরা বাজার, শোরসাগ বাজারও পাঠান বাহিনীর সূতিকাগার হিসাবে খ্যাত অলিপুর গ্রামসহ চাঁদপুর মহকুমার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। উগারিয়া বাজার, নোয়াপাড়া আপগ্রেড স্কুল মাঠ, বটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, কাদরা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, হাসনাবাদ বাজার ও আলীনকীপুর হাই স্কুল মাঠ, রাঘৈ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, ফরিদগঞ্জ থানা গৃদকালিন্দিয়া হাই স্কুল মাঠ, পাইকপাড়া হাই স্কুল মাঠ, চররামপুর হাই স্কুল মাঠ, কালির বাজার, দক্ষিণ সাহেবগঞ্জ প্রাইমারি স্কুল মাঠ। মতলবেও বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে। এসকল প্রশিক্ষণে অনেকেই সহযোগিতা করেন।

নৌ-কমান্ডো দল

নদীমাতৃক বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৯৭১ সনে মূলত নদী নির্ভর ছিল। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্যে পাকসেনারা ব্যাপকভাবে নদী পথ ব্যবহার করত। সৈন্য চলাচল, অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য সামগ্রী পরিবহনসহ প্রায় সকল কাজে নদীবন্দর সমূহ ব্যবহার হতো। মুক্তিবাহিনীর শক্ত সামর্থবান, সাহসী যুবকদের নিয়ে একটি নৌ-কমান্ডো দল গঠন করার কাজ শুরু হয় জুন মাসের প্রথম দিকে। জুন-জুলাই মাসে নৌ-কমান্ডোদের ৪২ দিনের কঠোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মমিন উল্লাহ পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ২৪ জনের একটি দলকে চাঁদপুর নদী বন্দরসহ জেলার বিভিন্ন অংশে সামরিক অপারেশন চালিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্ষতি সাধন ও মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান

www.pathagar.com

করার জন্যে নিয়োজিত করা হয়। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট দিবাগত রাতে বাংলাদেশের প্রত্যেক সমুদ্রবন্দর ও নদী বন্দরে নৌ-কমান্ডো হামলা চালানো হয়েছিল। সেদিন অর্থাৎ ১ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কড়া প্রহরার মধ্যে দুঃসাহসিকভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌ-কমান্ডো মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী তার অপর সাথীকে নিয়ে সাঁতার কেটে মেঘনা ডাকাতিয়া নদীতে যে কয়টি জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল সব কয়টিতে লিম্পেট মাইন স্থাপন করেন। সারা রাত দুঃসাহসিকভাবে মাইন স্থাপন করে সূর্য আকাশে উঁকি দেওয়ার একটু আগে তারা পাড়ে ওঠেন এবং আশ্রয় নেন তীরের ধান ও পাটক্ষেতে। সেদিন ৬টি জাহাজ ও ফ্লাট ডুবানো হলো। নৌ-কমান্ডোদের সফল অভিযান শত্রুর মনে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করলো। পুনরায় ১৩ অক্টোবর কমান্ডোগণ চাঁদপুরে পৌঁছে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অপারেশন করেন। ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় চাঁদপুর বার্মা ইস্টার্ন তেলের ডিপোতে নৌ-কমান্ডোদল বিস্ফোরণ অনুসন্ধান করে দেখেন নদী পথে আর অপারেশন সম্ভব নয় সর্বক্ষেত্রে নদীতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। এই অবস্থায় তারা স্থলপথে গেরিলা হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কৌশলে একটি পাটের থলিতে বিস্ফোরক দ্রব্য একজন পরিচিত লোকের হাতে দিয়ে এবং রাজাকারের প্রহরার ভেতর দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য তেলের ড্রামে রাখেন। তারা যখন ডাকাতিয়া নদীর মাঝখানে সাধারণ মানুষের সাথে নদী পার হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরকটি কার্যকর হয়ে আগুন ধরে যায়। তখন ছিল রোজার মাস, মানুষের দৌড়াদৌড়ি ও আর্তনাদের মধ্যে তারা অপর পাড়ে চলে আসেন। সেদিন শেষ রাতে 'লোরাম' নামক জাহাজটি চাঁদপুর লন্ডন ঘাটে কড়া প্রহরার মাঝেও নৌ-কমান্ডোরা ডুবিয়ে দেন। এই ভয়াবহ অপারেশনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ৯ নভেম্বর যে 'চায়না কোস্টার'টি মেঘনার বুকে ডোবানো হয় তাতেও দুইজন কমান্ডো মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী ও আঃ হাকিম মাইন স্থাপন করেছিলেন। ১১ নভেম্বর চাঁদপুর থেকে যে ট্রেন লাইন লাকসাম গিয়েছে সেই লাইনের একটি স্টেশন শাহতলী, ৭০ হাত দূরত্ব থেকে বিস্ফোরকের সাহায্যে ট্রেনটি লাইনচ্যুত করতে সক্ষম হয় নৌ-কমান্ডোরা। অন্যত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন মুক্তিসেনা অনেকেই চাঁদপুরের সন্তান। এঁদের মধ্যে রয়েছেন- ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, সুবেদার আঃ জববার পাটওয়ারী, লেঃ আনোয়ার হোসেন বীর উত্তম, মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, মেজর (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন প্রখ্যাত সেক্টর কমান্ডার। দেশের ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করে চাঁদপুরকে সামরিক দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সে বিবেচনায় এখানে একটি অস্থায়ী ডিভিশন সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল। এই ডিভিশনের সেনানায়ক মেজর জেনারেল আঃ রহীমের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে পলায়নের মধ্য দিয়ে পাকসেনাবাহিনীর অস্থায়ী ডিভিশন সদর দপ্তরের বিলুপ্তি ঘটে। মেজর জেনারেল রহিমের পলায়নে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বদলে যায়। ঢাকার পথে মিত্রবাহিনীর জয়যাত্রা নতুন গতি পায়।

www.pathagar.com

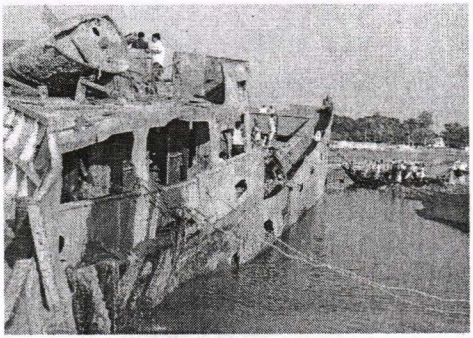

চাঁদপুর নৌ-বন্দরে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডো দল কর্তৃক
বিধ্বস্ত পাকিস্তানী যুদ্ধ জাহাজ এম.ভি লোরাম (১৯৭১)

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে চাঁদপুর অঞ্চলের অবস্থান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এখানে পাকসেনাদের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। তারা এখানে নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটসহ বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল ১৯৭১-এ। তাদের ধারণা ছিল, মুক্তিকামী বাঙালিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

তৎকালীন কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার চাঁদপুর শহর বা শহরতলী এলাকায় বাঙালিদের হত্যার পর লাশ গুম করতে বা লাশ ফেলে মাটি চাপা দিতে কোনো বধ্যভূমি তৈরি করতে হয়নি পাকিস্তানি সেনাদের। কেননা পাশেই ছিল মেঘনা নদী। এই নদীতেই চাঁদপুরের হাজার হাজার মানুষের লাশ ফেলে দেয়া হয়। ছিল ৭/৮টি নির্যাতন কক্ষ।

২৭ মার্চ তরুণ ছাত্রনেতা তাফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (নসু) তার সদ্য বিবাহিত তরুণী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডাঃ বদরুন নাহারকে নিয়ে অবরুদ্ধ ঢাকা শহর ছাড়েন। পুরো শহর দখল করে আছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। বদরুন নাহার স্বামীর হাত ধরে স্বামীর বাড়িতে চলে আসেন। যোগাযোগ করেন সদ্য গঠিত পাঠান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জহিরুল হক পাঠানের সাথে।

স্বামীর হাত ধরেই বদরুন্নাহার স্বাধীনতা যুদ্ধের উষালগ্নে ঘর ছেড়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তখন বদরুন নাহার পাঠান বাহিনীর মেডিকেল অফিসার। আহত সেনাদের চিকিৎসাসেবা দেয়া তার মহান দায়িত্ব। গজ-ব্যান্ডেজ, চেতনা নিরোধক ঔষধ ছাড়াই অস্ত্রোপচার করছেন এই ছাত্রী ডাক্তার।

চাঁদপুরের অসংখ্য সন্তান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মাহুতি দিয়েছেন তার মধ্যে শহিদ জাবেদ, হাবিলদার সিরাজুল ইসলামসহ ২১৭ জনের নাম প্রণীত হয়েছে। ২৫ মার্চের কালো রাতে সেনানিবাসে যুদ্ধ শুরু হলে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এক তরুণ সেনা অফিসার যশোহর সেনানিবাসে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে শহিদ হন। এই অসীম সাহসী যোদ্ধার নাম লেঃ শহিদ আনোয়ার হোসেন বীর উত্তম। তাঁর বাড়ি চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার সোনাপুর গ্রামে। তার নামে ঢাকা সেনানিবাসে একটি স্থাপনা রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ চাঁদপুরের

www.pathagar.com

শহিদবৃন্দের তালিকা ঃ ১. তাহের, ২. আব্দুর রশিদ, ৩. জয়নাল আবেদীন, ৪. আলী আওয়াল চৌধুরী, ৫. নূর হোসেন, ৬. আব্দুল মান্নান খান, ৭. কুদ্দুছ গাজী, ৮. কালাম ভূঁইয়া, ৯. আলম খান, ১০. রুহুল আমিন, ১১. আজিজুর রহমান, ১২. জয়নাল আবেদীন, ১৩. আবু আজ্জম, ১৪. আব্দুল মতিন, ১৫. জতির এমদাদুল হক, ১৭. শহিদ উল্লাহ্ জাবেদ, ১৮. কালাম, ১৯. ইউসুফ খাঁ। শহিদ মুক্তিসেনা হিসেবে ২য় লেঃ আনোয়ার সহ চাঁদপুর জেলার বিশজন শহীদের নাম সেনাবাহিনীর তালিকায় থাকলেও সরকার আরো ১৯৭ জনের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন, যাদের মধ্যে কৃষক-শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মীরাও রয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে চাঁদপুর অঞ্চলের শতাধিক বাঙালির হত্যাকারী লোকমান হোসেন বাচ্চু। হাজীগঞ্জ থানার টোরাগড় গ্রামে তার জন্ম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত শত মানুষকে হত্যা, অগণন নারীর ইজ্জত হরণকারী রাজাকার লোকমান হোসেন বাচ্চু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়নি। বরং গর্বভরে নিজেকে বীর বলে দাবি করেছে। সে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় দালাল এবং নিজেকে মুসলিম মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্তালে লোকমান হোসেন বাচ্চু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সক্রিয় সৈনিক ছিল। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে রাজাকার কমান্ডার হিসেবে সে কচুয়ার রঘুনাথপুর ও চাঁদপুর সদর থানার ছোট সুন্দর গ্রামে শতাধিক বাঙালিকে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ডের শিকার হন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সামছুল হক ভূঁইয়া ও প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া।

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিসেনাদের হাতে হাজিগঞ্জ মুক্ত হওয়ার পর সেদিন রাতেই (০৮-১২-১৯৭১) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর চাঁদপুরের ৬৩ তম বিগ্রেড এবং ১১৭ বিগ্রেডের পতন হয়। মূলত ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের পূর্বেই মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে কোণঠাসা করে রাখে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কটি ছিল মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন ডিসেম্বর ৩ ভারত এবং মুক্তিবাহিনী নতুন উদ্দীপনায় পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থাপনায় আঘাত হানতে শুরু করল তখন কুমিল্লা অঞ্চল দিয়ে প্রথম চাপটি পড়ে বিগ্রেডিয়ার আতিফের ২৫ ফ্রন্টিয়ারের ওপর।

ঠ. বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চাঁদপুর এর রয়েছে এক বিশেষ তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের আবহমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির একই প্রবাহের ক্ষুদ্র অংশ হয়েও এর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সৃষ্টির অবয়বে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল আমাদের পূর্বপুরুষগণ। মহান কবি দোনা গাজী এক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু সাধারণত শহর-বন্দর-নগর। কিন্তু চাঁদপুর জেলা শহরের গোড়া পত্তনের অনেক-অনেক বছর আগেই এই জেলার বিভিন্ন পল্লী গ্রামে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার অসংখ্য লালনক্ষেত্র। কয়েক শতাব্দী পরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সেদিন সংশ্লিষ্ট হয়েছিল অনেক প্রথিতযশা শিল্পী-সাহিত্যিক ও কলাকুশলীগণ। পল্লীর সহজ-সরল মানুষের বাস্তব জীবনের কাছাকাছি ঐ সময়ের শিল্পী সাহিত্যিকদের শিল্প ও সাহিত্য চর্চা অবিভক্ত ভারতবর্ষের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ সময়ে শিল্পীদের-সংগীত আর অভিনয় মাতিয়ে তুলেছিল পল্লী গাঁয়ের মানুষের সরল অন্তরকে। এমনিভাবে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতির মহাসাগরের বিপুল স্রোত ধারাকে নানা উপাচারে সমৃদ্ধ করেছে এই অঞ্চল।

কবি দোনা গাজী

ইতিহাস বলে খ্যাতিমান অনেক কবি-লেখক চাঁদপুর জেলাকে সমৃদ্ধ করেছেন; তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন কবি দোনা গাজী। এ জেলার সন্তান কবি দোনা রচিত পুঁথি সাহিত্য 'সয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জামাল' কাহিনি আরবী 'আলেফ লায়লা'র উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এটা একটি রোমাঞ্চকর প্রণয়োপাখ্যান। কথিত আছে সে সময়ের মিশররাজ হজরত সুলায়মানের নিকট হইতে কয়েকটি উপহার পেয়েছিলেন। মিশররাজের পুত্র সয়ফুল মুলুকের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হল, তখন মিশররাজ পুত্রকে উক্ত উপহারের একটি, অর্থাৎ কাবাই দান করেছিলেন। সয়ফুলমুলুক ঐ কাবাতেই একটি পরমা সুন্দরী কন্যার ছবি দেখে প্রণয়াসক্ত হলেন। বহুদেশ ভ্রমণ ও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর সয়ফুলমুলুক সুন্দরী কন্যা বদিউজ্জামালের দর্শন পেয়েছিলেন এবং উভয়ের মিলন হয়েছিল। মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর সংগ্রহ এবং অন্যান্য কলমী পুঁথিগুলি আলোচনা করে ড. আহমদ শরীফ 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' সম্পাদনা করেছেন। 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' এর পুঁথিতে দোনা গাজী বিরাহিমের ভণিতা পাওয়া যায়। ড. শরীফ দোনা গাজীকে মূল রচয়িতা ও বিরাহিমকে গায়ক প্রতিপন্ন করেছেন। তার কর্মস্থল ছিল বর্তমান কচুয়া উপজেলার উজানী বন্দরে, যে স্থানটি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে উজ্জয়নী নগর হিসাবে। শোসাইর চর থেকে উজ্জয়নী নগরে যেতে হতো নদী পথে। তিন-চার দিন সময় লাগতো। বর্তমানে শোসাইর চর থেকে উজানী যেতে সড়কপথে সময় লাগে মাত্র দু'ঘন্টা। জনশ্রুতি রয়েছে দোনা গাজী বিয়ে করেছিলেন উজানী বন্দরের কোনো এক বিদূষীকে। দোনা গাজীর কর্মস্থল ও শ্বশুর বাড়ি ছিল দোল্লঅই পরগণায়, কচুয়া উপজেলার উজানি নগরে। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে চাঁদপুর জেলার শোসাইর চরে বাস করছেন বলে জানা যায়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যের' ৮২-৮৬ পৃষ্ঠায় (২য় সংস্করণ) দোনাগাজীর সময় সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমাদের ধারণা কবি দোনাগাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ভাষার প্রকৃত ভাব, ছন্দের শিথিলতা, অন্ত্যানুপ্রাসের শৈথিল্য এবং প্রাচীন শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য সমস্তই একসঙ্গে মিলে তাঁকে স্বাধীনতা যুগের মুসলিম কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে।" ড. আহমদ শরীফ তাঁর সম্পাদিত 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "... তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কি দোনা গাজী ষোল শতকের কবি হওয়ায়ও অসম্ভব নয়। কাজেই অস্বীকৃতির আশঙ্কা না করেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি সতেরো শতকের গোড়ার দিকের কবি।" অতএব, দোনা গাজী ষোড়শ শতাব্দীর কবি-এতে শরীফ সাহেবেরও আপত্তি নাই। ড. আহমদ শরীফের সম্পাদনায় 'সয়ফুল মুলুক-

www.pathagar.com

বদিউজ্জামাল' পুঁথিটি সাহিত্যে স্থান অধিকার করার উপযোগী হয়েছে। দোনা গাজীর সমাধি কচুয়া উপজেলার উজানি গ্রামেই ছিল। বর্তমানে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। শোসাইর চর গ্রামে গাজী বংশের বসবাস রয়েছে। তবে কবির অধঃস্তন পুরুষরা কবি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সম্পূর্ণ বিস্মৃতির আড়ালে রয়েছেন তিনি। ধূসর ধুলির আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে এই মহান কবির কীর্তিগাঁথা।

সকল বিবেচনা ও পুঁথি-সাহিত্যের বিশ্লেষণ একথা প্রমাণ করেছে দোনা গাজী মেঘনা অববাহিকার প্রথম কবি, যার খ্যাতি সমগ্র বাংলা অঞ্চল তো বটেই সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপি ছিল। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়, মহান কবি দোনা গাজী মেঘনা অববাহিকার সাহিত্য সংস্কৃতির আদিপিতা। তাঁর জন্ম হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাঁর রচিত 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' মহাকবি আলাওলের রচনার পঞ্চাশ বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল।

ভাষা সংগ্রামী চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা

চাঁদপুর জেলার চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা জন্মেছেন ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি হাজীগঞ্জ উপজেলার ২নং বাকিলা ইউনিয়নের ফুলছোঁয়া গ্রামের মোল্লা বাড়িতে। তিনি স্থানীয় বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর লেখালেখি ও ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ.কে.এম. ফজলুল হকের 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায়।

শৈশবেই তাঁর ভেতরে মানুষের জন্য একটা কিছু করার বাসনা জন্মে। তাই তিনি ছাত্র জীবনেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময়ে তিনি নিখিল বাংলা ছাত্র ফেডারেশনের চাঁদপুর মহকুমার সভাপতি ছিলেন। ভাষার দাবিতে যখন ঢাকায় ছাত্ররা আন্দোলনমুখর, তখন চাঁদপুরে তা ছড়িয়ে দিতে এলাকার ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন বেগবান করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি অনেক জ্বালাময়ী কবিতা লিখেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার শেষ দিন ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

কবি সামছুল হক মোল্লা বাংলার রাজনীতির আরেক প্রবাদ পুরুষ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৭৩ সালে ভাসানীর দল তাকে জাতীয় পরিষদে মনোনয়ন দিলেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে গণমানুষের মুক্তি আসবে না। ইতিহাসে এর নজির নেই। তার মতে, মানুষের মুক্তি জন্য প্রয়োজন একটি সার্বিক বিপ্লব।

আবদুল কুদ্দুস

১৯০৫ সালে নাসিরকোটের উর্বর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন চাঁদপুর তথা কুমিল্লা সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মরহুম আবদুল কুদ্দুস। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ছাড়াও তিনি সুদূর আমেরিকাতেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার লেখনী কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রগতির আলো জ্বালাতে সংগ্রামে লিপ্ত হন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য মূল্যায়নে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ভূষিত হন

www.pathagar.com

'সাহিত্য রত্ন' এবং স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি সম্পাদনা করেন- 'কুমিল্লা জেলার ইতিহাস'। এছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- 'শহর কুমিল্লার ও কুমিল্লার কৃতী সন্তানদের জীবন আলেখ্য', 'কুমিল্লার স্মরণীয়-বরণীয়'। নাসিরকোটে জন্ম নেওয়া স্ব-প্রতিভায় ভাস্বর নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক, প্রগতিশীল মহান ব্যক্তিটি ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আহমাদ আলী পাটওয়ারী

আহমাদ আলী পাটওয়ারী হাজীগঞ্জ উপজেলার মকিবাদ গ্রামে বাংলা ১২শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আহছান উল্লাহ পাটোয়ারী এবং মাতা মরহুম ফজর বানু। তাঁর ১ ভাই এবং ১ বোন ছিল। আহমাদ আলী পাটওয়ারীর ৭ ছেলে এবং ২ মেয়ে ছিল। তিনি ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ১৭ বৈশাখ সকাল ৮:৪৫ মিনিটে পরলোকগমণ করেন।

কর্মজীবনে আহমাদ আলী পাটওয়ারী জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে হাজীগঞ্জ এলাকায় সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে। হাজীগঞ্জ কেরোসিন ডিলারশিপ ও কাঠের ব্যবসার গোড়া পত্তন করেন।

আহমাদ আলী পাটওয়ারী হাজীগঞ্জ বড় মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে ৭ই মাঘ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে মসজিদটি জমি ও ভাড়াটিয়া সহ (১.১৯ একর) ওয়াক্ফ করে দেন।

এম. ইদ্রিস মজুমদার

'চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে
মাটির মানুষ আর সোনার ফসলে'

মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধে নিজকে অপরূপ কোমল মাধুর্যে ফুটিয়ে তুলতে বাস্তবিক এ চরণ দু'টি লিখেছিলেন চাঁদপুরের মাটির সন্তান বহু প্রতিভায় ভাস্বর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম. ইদ্রিস মজুমদার।

হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন বলাখাল সুবিদপুর গ্রামে ১৯০৫ সালের ঈদুল ফিতরের দিন জন্ম নেন এম. ইদ্রিস মজুমদার। তাঁর বাবা ছিলেন ছমির উদ্দিন মজুমদার। শিশু বয়স থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছেন, তখন তিনি এতোই ছোটো ছিলেন যে তাঁর বাবা তাঁকে কোলে করে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেছেন। ইদ্রিস মজুমদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। ব্রিটিশ (ঔপনিবেশিক) শাসনামলে তিনি রাজপথে থেকে যেভাবে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমেও জাতিকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তৎকালীন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে তুলতে গাঁয়ের মুটে-মজুরদের দেশ নিয়ে আশাবাদী করে তুলতে তিনি লিখেছিলেন।

এছাড়াও তিনি স্বদেশ নিয়ে অসংখ্য কবিতা, গান রচনা করেছেন। এমনকি হলে থেকে পড়াশুনা করা অবস্থায় হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নিজের লিখা গান গেয়ে তিনি জনগণকে স্বদেশী আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে মাস্টার্স পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেননি। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা

www.pathagar.com

করে তিনি কোনো সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেননি। স্বাধীনচেতা মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ইদ্রিস মজুমদার চাঁদপুরের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এম. ইদ্রিস মজুমদার শুধু একজন শিক্ষকই ছিলেন না; তিনি একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, শিক্ষক, নেতা, সাংবাদিক ও স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাহক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে হয়তো তিনি তেমন আলোচিত হননি। কিন্তু তাঁর কর্মগুণে হয়েছেন এ অঞ্চলের এক কিংবদন্তি।

১৯৭০ সালের ১৪ অক্টোবর ইদ্রিস মজুমদার মৃত্যুবরণ করলেও তিনি রেখে গেছেন তাঁকে স্মরণ করার মতো অনেক কিছু। ইদ্রিস মজুমদারের শিক্ষা জীবন শুরু হয় নিজ উপজেলা হাজীগঞ্জে। হাজীগঞ্জ স্কুলে প্রাথমিক ও চাঁদপুর জুবলী স্কুল (বর্তমান হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) থেকে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিকুলেশন পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেন। মেট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করায় চাঁদপুরে তাঁকে এক বিরল সংবর্ধনা দেয়া হয়। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ তাঁকে টেবিলে দাঁড় করিয়ে সবাইকে দেখান এবং নিজের পকেটের কলম মেধাবী ইদ্রিস মজুমদারকে উপহার দিয়ে সম্মান জানান। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে (বর্তমান সলিমুল্লা মুসলিম হল) থেকে সমাজকল্যাণে অনার্স পড়েন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় এবং ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে মাস্টার্স পরীক্ষায় পর্যন্ত তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

হাজীগঞ্জ হাই স্কুলে প্রথম শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। পরে চাঁদপুর ও মতলব এতিমখানার সুপারইনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষে তিনি বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘদিন তিনি এ বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সুচারুভাবে। এছাড়াও তিনি তৎকালীন কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট জুরি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। চাঁদপুরের এককালের জনপ্রিয় মাটি ও মানুষের পত্রিকা 'অন্যগ্রাম' এর মনোগ্রামে 'চাঁদপুর ভরপুর জলে আর স্থলে, মাটির মানুষ আর সোনার ফসলে' খচিত চরণ দু'টি তিনিই লিখেন। 'অন্যগ্রাম' এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে ইদ্রিস মজুমদার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অসংখ্য কবিতা ও গান লিখেছেন। যার বেশ ক'টি বই আকারেই বের হয়। তাঁর লেখনীর তীক্ষ্ণতা ছিল সমাজের মতলববাজ, মাতবর আর পাজীদের বিরুদ্ধে, শোষিত-বঞ্চিতদের ও সমাজ সংস্কারের পক্ষে। কাজী নজরুল ইসলাম যখন কুমিল্লায় আসেন তখন ইদ্রিস মজুমদার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে নজরুল তাঁকে অনুপ্রেরণা দেন। এছাড়া পল্লি কবি জসিম উদ্‌দীন মতলবে আসলে ইদ্রিস মজুমদারের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইদ্রিস মজুমদারের রসবোধ তাঁর কাব্যতেও ফুটে উঠেছে শৈল্পিক মাত্রায়। তাঁর কাব্য রচনায় চাঁদপুরকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সত্যিই নাড়া দেয়। তিনি আঞ্চলিক ভাষায়ও লিখেছেন। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত বেশ কিছু গান পাকিস্তান বেতারে পরিবেশিত হয়। তাঁর পল্লিগীতিতে ছিল নিজ ভূমির রূপচিহ্ন-

'যেখানে মিশিয়াছে
মেঘনা ডাকাতিয়া

www.pathagar.com

সেখানে এক কুটিরেতে
বাস করে মোর প্রিয়া ॥
ও তার রূপের লহর ঢেউঢের বহর
বহায় গাঙের জলে
গাঙের পানি উতাল হইয়া
জোয়ার ভাটায় চলে।'

স্বামী স্বরূপানন্দ

আধ্যাত্মিক সাধনায় সমুন্নত পুরুষ-প্রবর স্বামী স্বরূপানন্দ। ১৮৮৮ সালে চাঁদপুর শহরের পুরাতন আদালত পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত বিপ্লবী পরিবারে ও পরিবেশে তাঁর জন্ম হয়। ঐ স্থানেই প্রতি বছর ৯ই পৌষ তাঁর জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়। স্বামী স্বরূপানন্দের পিতার নাম শ্রী সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী। স্বামীজীর পূর্ব নাম শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র গাঙ্গুলী।

তিনি হাসান আলী জুবলী স্কুলের (বর্তমানে চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্র ছিলেন। পরে ঢাকা পোগোজ স্কুলে ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাড়িতে ছিল ধর্মীয় পরিবেশ। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে তখনই আসেন। এভাবেই মনে ধর্মভাব জাগে। পাঠ্য অবস্থায় মাঝে মাঝে আরাধনায় ও সাধনায় মগ্ন থাকতেন। স্বামী স্বরূপানন্দের পরিবারের বাইরের রূপ যাই থাকুক, আসল সংযোগ ছিল তাঁদের বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে। তাই স্বরূপানন্দের ভেতরও স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয় খুব অল্প বয়সেই। ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছিলেন। যুগান্তর দলের সংগে যোগাযোগ ছিল এবং বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। একই সঙ্গে বিপ্লব ও ব্রহ্মচর্যের তপস্যাই স্বামী স্বরূপানন্দকে আদর্শ পুরুষ করে তুলেছে- তিনি হয়েছেন এক দিব্য জীবনের অধিকারী। ক্রমে তিনি রাজনীতি ছেড়ে ধর্ম সাধনা ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ মানবপ্রেম তাঁকে অবহেলিত মানুষের পরম আপনজনে পরিণত করেছে। তিনিই প্রথম তথাকথিত অচ্ছুতদের গায়ত্রী মন্ত্রের অধিকার দেন। তাই স্বামীজীর অখণ্ড মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই নিম্নবর্ণের। তাঁর কর্ম ও ধর্ম এক খাতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে শৈশব থেকেই- ঘর-বাহির তাঁর চিন্তা ও ধ্যানে একাকার। তিনি কর্মভিত্তিক ধর্মপ্রচার করেছেন এবং চরিত্র গঠনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সন্ন্যাসীদের চিরন্তন আদর্শ ভিক্ষাবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বরাবর স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী, এমনকি ধর্মপ্রচারের জন্য ও লোকের কাছ থেকে অর্থ চেয়ে নিতে রাজী নন। সেই জন্য স্বামীজীর আশ্রমের নাম রাখা হয়েছে 'অযাচক আশ্রম'। এই আশ্রমের বহু শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠেছে। সেখানে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য চাষ ও পশু পালন ইত্যাদি প্রকল্প একের পর এক বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মধ্যে কুমিল্লা মুরাদনগর উপজেলায় রহিমপুরে রয়েছে স্বামীজীর 'অযাচক আশ্রম'। ভিক্ষাবৃত্তিতে বীতশ্রদ্ধ স্বামীজির শিষ্যসহ স্বহস্তে আশ্রম প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁর মতে, একক নির্জন উপাসনা থেকে সমবেত উপাসনা শ্রেয়ঃ। তাইতো তিনি

www.pathagar.com

জোরালো কণ্ঠে বলেছেন, "মনে রাখিও, সমবেত উপাসনা আমার প্রিয় অনুষ্ঠান।" অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমূল্য বাণীর মধ্যেই তাঁর মহত্তর ভাবধারাটি সুস্পষ্ট।

"ছোট বড় সকলেরে ভালোবাসি প্রাণভরে
সবারে ডাকিয়া কহ, কেহ মোর পর নহে।"

মহাসাধক সর্বানন্দ বা সর্ববিদ্যা ঠাকুর

শক্তি সাধনার চরম স্তরে পৌঁছেছিলেন মহাতান্ত্রিক সর্বানন্দ বা সর্ববিদ্যা ঠাকুর। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার মেহার কালীবাড়ী আজও যাঁর স্মৃতি বহন করছে। সর্বানন্দ বা সর্ববিদ্যা ঠাকুরের জন্ম শাহরাস্তি উপজেলায় মেহার গ্রামে। পিতা ছিলেন শম্ভুনাথ। সর্ববিদ্যা ঠাকুর ছিলেন বাল্যকাল থেকেই উদাসীন ও সংসার অনাসক্ত। তাঁর ধর্মজ্ঞানও ছিল অল্প। একদিন রাজপুরোহিতের অনুপস্থিতিতে শ্রীপুরের রাজা জটাধর দাসের সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। রাজা তাঁকে তিথি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আজ পূর্ণিমা তিথি'। অথচ সেদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তি, অমাবস্যা তিথি। সভায় সবাই হেসে উঠল। রাজাও তখনই মূর্খ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন।

অপমানিত সর্বানন্দ বিদ্যাভ্যাস মানসে লেখার জন্যে তালপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী বনে তাল গাছে উঠে এক বিষধর সর্প মেরে ফেলেন। নেমে দেখেন, জটাধারী মহাদেব গাছতলায়। মহাদেব তাঁকে মন্ত্র শিখিয়ে, বুকে একটা শ্লোক লিখে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, মেহারের বনে জীন বৃক্ষমূলে মাতঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থানে রাত্রি দ্বিপ্রহরে শব বক্ষোপরি উপবেশন করে এ মন্ত্র জপ করলে সিদ্ধি লাভ হবে।

ভৃত্য পূর্ণানন্দসহ সর্বানন্দ বনে উপস্থিত। তিথি আগত অথচ জীন বৃক্ষ ও নির্দিষ্ট স্থান না পাওয়ায় দিশেহারা। তখন শ্রীপুরে মুসলিম সিদ্ধপুরুষ রাস্তি শাহ এসে তাঁকে জীন বৃক্ষ দেখিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। সর্বানন্দ পূর্ণানন্দের শবে বসে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তখনি তাঁর কণ্ঠে ভক্তিবাণী নন্দিত হল-

'খনা কারা রিপু রুধির ধারাঞ্চিত মুখী
গল দ্বেগী ভারা গল ললিত হারা হর বধুঃ।
উদারা দুধারা সুরগন বিহারা সুরসমা
ময়া মেহারে সা ভুবন জননী দর্শন মিতা ॥"

ওদিকে রাজা জটাধর সব জেনে শুনে বিভ্রান্ত, অনুতপ্ত হলেন। সর্বানন্দ ঠাকুরের নিকট তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু সর্বানন্দ ঠাকুর তখন নিরুদ্দেশ। রাজা হতভম্ব হলেন। এমন সময় আবার দরবেশ রাস্তি সাহ এসে রাজাকে গভীর বনে জীন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সর্বানন্দ ঠাকুরের নিকট নিয়ে গেলেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত রাজা সদ্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত ঠাকুরকে নিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে এলে তিনি কালী মন্দিরে প্রবেশ করে খড়্গ দিয়ে পাথরের কালী মূর্তির বক্ষে আঘাত হানলে রক্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। তখনই তিনি নির্দেশ দিলেন মেহারে সেই শূন্য স্থানে যেন কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা না হয়। এমনই পূজা হবে। তাই মেহের কালীবাড়িতে কোনো বিগ্রহ নেই। অথচ খুব ধুমধামে পৌষ সংক্রান্তিতে উৎসব

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। রাজা জটাধর দাস হযরত রাস্তি শাহ্ (রঃ) এর অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ। কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে তাঁর নামে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। এখনও তাঁর ভাই শাহ মহবুবের বংশধরগণ তা ভোগ করেন।

সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধি লাভ হয় হযরত রাস্তি শাহ্ (রঃ)- অনুগ্রহে। আর রাজা জটাধর দাসের রাস্তি শাহকে নিষ্কর ভূমি দান দুটিই ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অতি উজ্জ্বল আদর্শ।

ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী

দেশের অন্যততম শ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, চাঁদপুর জেলা তথা সারাদেশে শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলনকারী উজ্জ্বল নক্ষত্র ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামে সম্ভ্রান্ত পাটোয়ারী পরিবারে ১৫ মার্চ ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং একই বিদ্যালয় থেকে নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে বাবুরহাট হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯২৪ সাল বাংলা সহ পাঁচটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএসসি পাশ করেন। অত্যন্ত মেধার অধিকারী এই কৃতিমান ব্যক্তিত্ব ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী ১৯৩০ সালের মে মাসে মতলবগঞ্জ জেবিএইচই স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র ২৪ দিন শিক্ষকতার পর নাটকীয়ভাবে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর শামসুল ওলামা কালাম উদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োজিত হন। হিন্দু প্রধান স্কুলে তাঁর উপস্থিতি ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করলেও স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার প্রভাবে সব কাটিয়ে উঠে একাধিক্রমে ৪১ বছর (১৯৩১-১৯৭১) কৃতিত্বের সাথে কাজ করে খ্যাতিমান এই শিক্ষাবিদ সফল প্রধান শিক্ষক হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে স্কুলটিকে দেশের অদ্বিতীয় স্কুলে পরিণত করেন। পরে আরো কয়েক বছর ঐ স্কুলের রেক্টর ছিলেন।

অনাড়ম্বর, সাদাসিধে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিহিত আবক্ষ শ্মশ্রুমন্ডিত পাটওয়ারীর সাধনাপ্রসূত কয়েকটি কথা। (১) 'ছাত্র বড় না হলে স্কুল বড় হয় না, স্কুল বড় না হলে হেড মাস্টার বড় হয় না' (২) 'ছাত্ররা স্কুলের মনি মানিক। স্কুল বাগানের চারা গাছ। যত্ন করলে সুন্দর ফুল ফোটে'। তাঁর রচিত বই 'উপদেশ কণিকা'- জীবন অভিজ্ঞতার শিক্ষামূলক মূল্যবান গ্রন্থ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম ওয়ালী উল্লাহ পাটোয়ারী দেশ ও জাতির জন্য ১৫টি মূল্যবান ও উপদেশমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৯৯ সালের ২৫ আগস্ট এ খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ মৃত্যুবরণ করেন।

ডা. নওয়াব আলী

উপমহাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডা. নওয়াব আলী চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার ছেঙ্গারচর গ্রামে ১৯০২ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী মোঃ আবদুল সরকার ও মাতা ইসমতুন্নেসা বেগম। মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে আই.এস.সি উভয় পরীক্ষায়ই প্লেসসহ

www.pathagar.com

সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৭ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম বারেই এম.বি (বর্তমানে এম.বি.বি.এস) পাস করে তিনি তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা থেকে ডিপ্লোমা ইন ট্রপিক্যাল মেডিসিন (ডি.টি. এম.) লাভ করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কোলকাতার লেক মেডিকেল কলেজ ও পরবর্তীকালে কোলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল মেডিসিন পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি এডিনবরাস্থ (যুক্তরাজ্য) রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জেন্স থেকে প্রথম সুযোগেই প্রথম সারির বাঙালি মুসলমান হিসেবে এম.আর.সি.পি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর অব মেডিসিন এবং অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা তৎকালীন পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের কাছ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতি আদায়ের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ডা. নওয়াব আলী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ডা. আলী ১৯৫৭ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সার্জন জেনারেল হন এবং উক্ত পদ থেকেই ১৯৫৯ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। তিনি ১৯৫৮ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে প্রথম যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জনস থেকে এম.আর.সি.পি লাভ করেন। ভারতের কোলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক রোগি ডা. নওয়াব আলীর চিকিৎসা প্রাপ্তির জন্য ঢাকায় নিয়মিত আগমন করতেন। ডা. নওয়াব আলী তৎকালীন মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তিনি চাঁদপুর জেলার মতলবে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক উদরাময় হাসপাতাল (তৎকালীন সিয়াটো কলেরা হাসপাতাল) এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

ডা. নওয়াব আলী ৪ঠা আগস্ট ১৯৭৭ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ১৮৮৮ সালের ২০ নভেম্বর চাঁদপুর সদর থানায় পাইকারদী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ২১ মে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ১০৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পিতা মোঃ আবদুল রহমান এবং মাতা আমেনা বিবির কৃতী পুত্র এবং সাংবাদিকতার কৃতী পুরুষ নাসিরউদ্দিন মৃত্যুকালে একমাত্র কন্যা 'বেগম' সম্পাদক নুরজাহান বেগমকে রেখে যান।

বৃটিশ মুক্ত ভারতবর্ষে দেশ বিভাজনে সাংবাদিক নাসিরউদ্দিন কলকাতা থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগ্রত করার লক্ষ্যে কলম ধরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে লক্ষ্যেই তাঁর লেখনি সচল রেখেছেন। আর এই জন্যই তিনি নিজের সম্পাদনায় বের করেছিলেন 'সওগাত' পত্রিকা। বাল্যকাল থেকে ছবির বইপত্র, পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রতি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজে এ স্বভাবের অভাব দেখে তিনি দুঃখ অনুভব

www.pathagar.com

করতেন। যৌবনে পদার্পণ করেই তিনি সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁর ধারণায় কেবল বই ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার কার্য দ্বারাই এর প্রতিকার করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য থেকে শুরু হয়েছিল সচিত্র মাসিক, বার্ষিক, সাপ্তাহিক ও মহিলা সওগাত, শিশু সওগাত এবং সচিত্র সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা। তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে লেখক সৃষ্টির জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদসহ অনেক কবি, লেখকের প্রতিভার বিকাশে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহ হলো : 'শিরি-ফরহাদ' (উপন্যাস) 'আল্লার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওলাইহেসাল্লা', 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ', 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম', 'আত্মকথা' ইত্যাদি। তিনি সর্বমোট ২১টি সংবর্ধনা ও সম্মাননা পদকে ভূষিত হন।

নূরজাহান বেগম

বাংলার পত্র-পত্রিকা বিশেষত সাহিত্য পত্রিকার সাথে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের নাম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্রে বিজড়িত। চাঁদপুরের এই কৃতি পুরুষের সার্থক উত্তরসূরী তাঁর আত্মজা- নূরজাহান বেগম, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা।

বাবার সঙ্গে থেকে একেবারে অল্প বয়সেই নানা রকম পত্রপত্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতেই সাংবাদিকতায় প্রবেশ তার। বাবা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন মেয়েকে ছোটো ছোটো কাজের ভার দিলেন। একসময় দেখা গেল নূরজাহান বেগম তৈরি হয়ে গেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে। সাংবাদিক বাবার সাংবাদিক মেয়ে। নূরজাহান বেগম বাঙালি নারী সাংবাদিকতার অগ্রদূত। কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ে যিনি সাংবাদিকতায় আজকের নারী সাংবাদিকদের প্রথ প্রদর্শক। ১৯২৫ সালের ৪ জুন নূরজাহান বেগম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সেই সময়ে 'সওগাত' অফিসে রোজ বিকেলে বসত সাহিত্য মজলিশ। নানা জায়গা থেকে কবি সাহিত্যিক আসতেন। এর মধ্যে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, খান মোহাম্মদ মইনুদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, আব্বাসউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। তাঁদের দেখা আর বাবার দেওয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাটিং, ফিচার, ছবি, রচনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই পত্রিকার প্রতি তাঁর উৎসাহ বাড়ে। সে সময় পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা ভীষণ কঠিন ছিল। কোনো মুসলমান মেয়ে পত্রপত্রিকায় লিখতেন না। কুসংস্কার আর ধর্মের গোঁড়ামির দাপটে মুসলমান মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সেই সময় ১৯৫৪ সালে প্রথম 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম ক্লাবের প্রচেষ্টাতেই 'বেগম' পত্রিকা।

সাপ্তাহিক 'বেগম' উপমহাদেশের নারীদের জন্যে প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর অনুদার সমাজব্যবস্থায় শুধু মেয়েদের জন্য কোনো পত্রিকা প্রকাশ করার কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তারপরও অল্পদিনের মধ্যে 'বেগম' সাড়া ফেলে দেয় নারীমহলে। মেয়েরা গল্প লিখতে জানতেন না, চিঠি

www.pathagar.com

লেখার মতো করে গল্প লিখতেন। ছবি আঁকা শেখার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, তারপরও তাঁরা মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি এঁকে পাঠাতেন। 'বেগম' সম্পাদক তার কিছুই ফেলে দিতেন না, সযত্নে সম্পাদনা করে ছাপাতেন। আর তাতে উৎসাহী হয়ে মেয়েরা নিজেদের শুধরে নিয়ে ভালো করে লিখে পাঠাত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়ের রুচি নির্মাণে, সাহিত্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে 'বেগম'।

'বেগম' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবাহিত মুসলমান নারী। এর অন্য অর্থ হচ্ছে মুসলমান রানি বা সম্রাজ্ঞী 'সুলতানা'। 'বেগম' নারীদের একটি সম্মানসূচক পদ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই থেকে 'বেগম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করে সুদীর্ঘ ৬০ বছর তিনি 'বেগম' পত্রিকা নিয়েই ছিলেন। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি হাল ধরে আছেন বাংলাদেশের প্রথম ও অন্যতম প্রাচীন নারী বিষয়ক পত্রিকার। তাঁর হাত ধরে, তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে অনেক নারী সাংবাদিক তাঁদের প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ২০০৭ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে নারী জাগরণ ও সাংবাদিকতার অন্যতম অগ্রপথিক নূরজাহান বেগমকে তাঁর অবদানের জন্য সম্মাননা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ।

ড. এম.এ সাত্তার

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তান, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ নারী শিক্ষার অগ্রদূত, মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার রূপকার, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ড. এম.এ সাত্তার ১৯৩৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্তি উপজেলার নাওড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আজিজুর রহমান পাটোয়ারী ও মাতার নাম করফুলেন নেছা। ৩ ভাই ১ বোনের মধ্যে ড. সাত্তার ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। ড. সাত্তার নিজ গ্রামস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শাহরাস্তির নিউ স্কীম মাদ্রাসায় (বর্তমানে শাহরাস্তি হাই স্কুল) ভর্তি হন এবং জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে চট্টগ্রামে হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা হতে ১৯৫১ সালে ১ম স্থান অধিকার করে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে মেধা তালিকায় ১ম বিভাগে ৭ম স্থান অধিকার করে আই এ পাস করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণিতে ৩য় স্থান অধিকার করে অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ডিগ্রি লাভ করার পর ড. সাত্তার করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়ার এবং সিএসপি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি করাচি চলে যান এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই সাথে সিএসপি পরীক্ষায়ও সারা পাকিস্তানে ১ম স্থান অধিকার করে লাহোরে সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং একাডেমীতে যোগদান করেন। এক বছর ট্রেনিং শেষ করে তিনি যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার এসডিও হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বদলি হয়ে আসেন এবং ঐ বছরই বৃটিশ নাগরিক ড. এলেন মেরি হেরিংটনের সাথে বিবাহ বন্ধনে

www.pathagar.com

আবদ্ধ হন। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কলেজ হতে ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্সে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টাফটর্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের কারণে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৭২ সালে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরীন হন। অন্তরীন অবস্থা থেকে পালিয়ে ভারত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭৩ সালে পরিকল্পনা সচিব হিসাবে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকুরি লিয়েনে রেখে আমেরিকা ভিত্তিক এনজিও আইকম্প এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে চাকুরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচন করেন। ১৯৯২ মালের ২৬ই মে আইকম্পের চাকুরিতে থাকাকালীন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অকস্মাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে ড. সাত্তার মৃত্যুবরণ করেন।

ড. সাত্তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মৌলভীবাজার কলেজ, নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, রংপুর বেগম রোকেয়া কলেজ, পঞ্চগ্রাম সমবায় প্রকল্প, বাংলাদেশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি, গণবিদ্যালয় আন্দোলন, সোনারগাঁয়ের শামছুল হক গণবিদ্যালয় প্রকল্প, মহিলা বৃত্তি প্রকল্প, স্বনির্ভর বাংলাদেশ। ড. এম.এ সাত্তারকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর স্ত্রী ড. এলেন মেরি হেরিংটন 'ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার ট্রাস্ট ফান্ড' নামে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছেন। এই ট্রাস্ট ফান্ড হতে প্রতি বছর ঢাকা কলেজের ৪ জন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ড. সাত্তারের অবদানের ফলশ্রুতিতে শাহরাস্তির শিক্ষার হার ৯৬% ভাগে উন্নীত হয়েছে।

আশেক আলী খান

আশেক আলী খান চাঁদপুর জেলার প্রথম মুসলমান গ্র্যাজুয়েট (বাংলা একাডেমী, চরিতাভিধান, পৃ. ৭৬)। তাঁর জন্ম হয় চাঁদপুর জেলার গুলবাহার গ্রামের একই বাড়ির দাদা ও নানার অভিন্ন পরিবারের ভরা সংসারে ১৮৯১ সালে। তখন গুলবাহার গ্রাম গোয়ালভাওর নামে পরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম আইনদ্দিন খান ও মাতার নাম আলেক জান বিবি ওরফে টুনি বিবি।

তিনি ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চাঁদপুরের বাবুরহাট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন উল্লেখ্য যে ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রচলন হয় ব্রিটিশ ভারতে। ঐ স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তাঁর ক্লাসে তিনিই একমাত্র মুসলমান ছাত্র ছিলেন এবং সবার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯১৩ সালে পাস করেন ইন্টারমিডিয়েট। এরপর ঢাকা কলেজে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক সংকটে অনার্স কোর্স শেষ করতে পারেননি। পড়ায় বিরতি দিয়ে পরপর দু'টি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে কলকাতায় সিটি কলেজে বি.এ ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শুরু

www.pathagar.com

করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ পাস করেন। বি.এ পরীক্ষার ফল পত্র-পত্রিকায় বের হবার পর তিনি ৫০টি খাম ও পোস্ট কার্ডে লিখিত চিঠি পেয়েছিলেন ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ, দেরাগাজীখান, পাঞ্জাব, চন্দনপুর, আসাম, পাবনা ইত্যাদি বিভিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের থেকে। তখনকার দিনে চাঁদপুর ছিল ত্রিপুরা জেলার একটি মহকুমা। যেটি শিক্ষা-দীক্ষায় খুবই অনগ্রসর ছিল। সেই অনগ্রসর এলাকার একজন মুসলমান যুবক বি.এ পাস করেছে সেটি চোখে পড়ার মত। তাই তারা তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য চিঠির মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেকালে মুসলমানরা আরবি ফারসি ছাড়া বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে মোটেই কদর করত না। তখন সকলকে তাক লাগিয়ে ইংরেজিতে শিক্ষিত হয়ে বি.এ পাস করলেন আশেক আলী খান। সে সময় বিএ পাস করাটা ছিল বড় রকমের একটা কৃতিত্বের ব্যাপার। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বলে তাঁর এলাকার লোকেরা কেউই তাকে নাম ধরে ডাকতো না বরং সাহেব বলে সম্বোধন করত। পরে সাহেব কথার অপভ্রংশ সাব নামেই তিনি পরিচিতি হলেন আশপাশ সহ গ্রামবাসী তথা সকল ছেলেবুড়োর কাছে। প্রথম গ্র্যাজুয়েট বা বি.এ পাস বলে তখনকার দিনে লোকজন ইংরেজি জানা মুসলমান বাঙালি সাহেবকে দেখতে আসতো দূর-দূরান্ত থেকে। চাঁদপুরের কাছে হাজীগঞ্জ ছিল একটি থানা। এই হাজীগঞ্জ কিন্তু থানার জন্য নয় বরং একটি বিশাল সুন্দর মসজিদের জন্য বেশি পরিচিত ছিল। আশেক আলী খান সাহেবকে জুম্মার দিনে নামাজ শেষে ঐ মসজিদের মিম্বারে দাঁড় করিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আগত লোকদের দেখার সুযোগ দেয়া হতো। তখনকার দিনে ইংরেজি শেখায় গ্রামীণ মানুষের কাছে তিনি দর্শনীয় হয়েছিলেন এভাবে। হাজীগঞ্জ ছিল তার গ্রাম গুলবাহার থেকে ছয় মাইল দূরে।

সে সময়ে বি.এ পাস হিসেবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পাওয়া লোভনীয় হওয়া সত্ত্বে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিলেন পেশা হিসেবে। বি.টি পড়ে ফার্স্ট ক্লাস পেলেন ১৯১৯ সালে। প্রথম চাঁদপুর গণি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। এই স্কুলের সরকারি মঞ্জুরি তিনি করিয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর মাধ্যমে। তখনকার দিনে স্কুলের সরকারি মঞ্জুরি পাওয়াটা ছিল কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। এরপরে সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুল হিসেবে বৃহৎ বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও সাধারণ লোকের আর্থ-সামাজিক করুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন। পরে সাব ইন্সপেক্টরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতা করেন ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল জেলা স্কুলে ও সর্বশেষ ঝালকাঠির সরকারি স্কুলে। শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তিনি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থার সাথেও নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন। এই অবস্থা তার মনে দাগ কাটলো ভীষণভাবে। সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে নিম্নবর্ণ হিন্দু ও অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ একাধিকবার নিয়ে ছিলেন। সেজন্য তাঁর পদোন্নতি বন্ধ ছিল। ১৯৪৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পর নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি ভাবলেন শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে দেশের সাধারণ মানুষের জন্যে শিক্ষাঙ্গণে ব্যতিক্রমধর্মী একটা কিছু করবেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের সাথে সাথে তিনি এসব কাজে

www.pathagar.com

হাত দিতে পারলেন না। সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি তৎকালীন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের হাজী জালাল হাই স্কুল, মতলব থানার নারায়ণপুর হাই স্কুল, হাজীগঞ্জ থানার দরবেশগঞ্জ হাই স্কুল ও কচুয়া থানার রঘুনাথপুর হাই স্কুলে হেড মাস্টার পদে দীর্ঘ ১৫ বছর কাজ করলেন। সংগঠক হিসেবে এসব নড়বড়ে স্কুলগুলোকে দাঁড় করিয়ে দেন। শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি ঢাকায় আয়োজিত ১৯৪৯ সালের ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স কনফারেন্সের রিসিপশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে পুনঃগঠনের জন্যে নবতর সংযোজন ব্যাখ্যা করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন, যা তৎকালীন সুধী মহলে সমাদৃত হয়। তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে তখনকার দিনে পত্রপত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়েছিল। সে সময়ে পূর্ব বাংলার স্কুল মাদ্রাসার কাঠামো, পাঠ্যসূচি ও দিক নির্ণয়ে তিনি যে ভূমিকা রেখেছিলেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ওয়াহীদ আহমেদ

অধ্যাপক ওয়াহীদ আহমেদ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট মতলব উত্তর উপজেলার পাঁচআনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং মাতা রাহাতুননেছা। ১৯৪৬ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৬২ সালে ওয়েলস ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) ১৯৫১ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং ১৯৬৬ সালে ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং- এর ডীন মনোনীত হন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে কারিগরি শিক্ষার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ এপ্রিল বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালের ২৫ এপ্রিল উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০-৯১ সালে তিনি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিআইটি কাউন্সিল বাংলাদেশ- এর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পে-কমিশনের সার্বক্ষণিক মেম্বার ছিলেন। কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্বর্ণপদক অর্জন করেন এবং ২০০২ সালে আহসান উল্লাহ মিশন থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অধ্যাপক ওয়াহীদ আহমেদ বর্তমানে বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন। ১৯৯৬ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সহ-সভাপতি, সভাপতি ও মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস হতে তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রথম 'ন্যায়পাল' হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বুয়েটের এমেরিটাস প্রফেসর। তিনি বাংলাদেশ সায়েন্স

www.pathagar.com

একাডেমীর ফেলো এবং বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট- এর ফেলো, এআইটির বোর্ড অব ট্রাস্ট্রির উপদেষ্টা।

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রসুল

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রসুল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে মতলব উপজেলার পাঁচআনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মতিয়ুর রহমান সরকার এবং মাতা সৈয়দুন্নেসা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে ফিজিওলজি রসায়ন ফার্মাকোলজিতে অর্নাসসহ মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করে। ১৯৬২ সালে লাহোর কিং এডোয়ার্ড মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করে রয়েল কলেজ অব সার্জনস অব ইংল্যান্ড- এর এফআরসিএস পরীক্ষায় প্রথম পর্ব পাশ করেন। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে এফসিপিএস লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস অব পাকিস্তানের অনারারি ফেলো এবং আন্তর্জাতিক কলেজ অব সার্জনস-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রসুল ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিলেট মেডিকেল কলেজে সহযোগি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালে একই পদে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮ সালে আইপিজিএমআর এ যোগ দেন। ১৯৮৭ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শল্য বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব মেডিকেল সায়েন্স কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার পান। ১৯৮৭ সালে সোসাইটি অব সার্জনস বাংলাদেশ কর্তৃক আছীর মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০০৩ সালে বৃহত্তর কুমিল্লা সাংস্কৃতিক ফোরাম কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

ডাঃ গোলাম রসুল ১৯৮৮-৯০ সালে সোসাইটি অব সার্জনস অব বাংলাদেশের এবং ১৯৮৯-৯৯ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্স কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য। ১৯৮০ সালে মতলবগঞ্জ হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রদের কল্যাণে ট্রাস্ট ফান্ড স্থাপন করেন।

মনিরুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চাঁদপুরের কৃতীসন্তান মনিরুল ইসলাম পিতার কর্মস্থল জামালপুরে ১৭ই আগস্ট ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালাদেশ চারুকলা মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ঢাকা থেকে চিত্রকলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৬ সালে। তারপর তিনি ১৯৬৯-৭৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদ-স্পেন এ চারুকলায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬-৬৯ পর্যন্ত চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি 'হোমেজ টু বাংলাদেশ' নামে একটি সিরিজ ছবিও এঁকেছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য প্রদর্শনী হচ্ছে : একক প্রদর্শনী : গ্যালারি গ্রিফ, এস্‌কোলা-১৯৭০; সালা মেলিয়া, গ্যালারি ল্যুই; গ্যালারি দানিয়েল মাদ্রিদ- ১৯৭২; 'আতালিয়ে কুন্‌সট অ্যান্ড ওহুনেন,' নুরুনবার্গ এবং কার্সটাড়- গ্যেশ্যাফ্‌ট্‌স লেইভেং, কোলেন পশ্চিম জার্মানি-১৯৭৩, ১৯৭৯; গ্যালারী আথেনা; গ্যালারি ফরমা; গ্যালারি মোতা; স্পেন-১৯৭৩, ১৯৭৬ এবং ১৯৭৮; তাক্‌সিম সানাত গ্যালারি, ইস্‌তামবুল, তুরস্ক-১৯৭৫; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী-১৯৭৯। যৌথ প্রদর্শনী : বাংলাদেশে ৬টি প্রদর্শনী-১৯৬১-৬৮ পর্যন্ত। এছাড়াও তিনি স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গেরি, কোরিয়া, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, মরক্কো, মিশর, যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতে শতাধিক যৌথ প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করেছেন। আজুরেন, কান-এ 'ইন্টারন্যাশনাল বিয়েন্নাল প্রদর্শনী; ইন্টারন্যাশনাল বিয়েন্নাল অব কারাকোভিয়া, পোলান্ড; ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফেয়ার 'ফিয়াক-৭৭' ও প্যারিস '৭৮ ইন্টার গ্রাফিক, '৮০ ডিজিআর, ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক মূল ড্রইং প্রদর্শনী, রিজেকা, যুগোশ্লাভিয়া; ৮ম দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক গ্রাফিক্স প্রদর্শনী, ইবিজা, স্পেন; ১৩তম আন্তর্জাতিক গ্রাফিক্স প্রদর্শনী, লুবিয়ানা, যুগোশ্লাভিয়া-১৯৭৮-৭৯ সহ অসংখ্য প্রদর্শনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

মনিরুল ইসলামের অর্জন : '৫ম দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক গ্রাফিক প্রিন্ট প্রদর্শনী পুরস্কার; ইবিজা, স্পেন-১৯৭২। '১২তম দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক গ্রাফিক প্রিন্ট প্রদর্শনী পুরস্কার লুবিয়ানা, যুগোশ্লাভিয়া-১৯৭৭। '৪র্থ' এবং '৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক প্রিন্ট প্রদর্শনী পুরস্কার', নরওয়ে-১৯৭৮, ১৯৮২। ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক মূল ড্রইং প্রদর্শনী পুরস্কার' যুগোশ্লাভিয়া-১৯৭৮। 'ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট-৪' সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র-১৯৮৩। ৭ম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার'-১৯৮৫। 'একোসিট পুরস্কার', স্পেন-১৯৯৩। স্পেনের জাতীয় পুরস্কার-১৯৯৭ এবং বাংলাদেশে একুশে পদক-১৯৯৯ লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি স্পেনের মাদ্রিদ শহরে পেশাদার শিল্পী হিসেবে কর্মরত। এছাড়া তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিচারক হিসাবেও কাজ করেন।

শিল্পী হাশেম খান

মুহাম্মদ আবুল হাশেম খান, ৩ বৈশাখ ১৩৪৮, ১৬ই এপ্রিল ১৯৪২, চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৬১ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে চিত্রকলায় প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক পাশ করেন। ১৯৬৩ পর্যন্ত মৃৎশিল্পে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। শিশু পুস্তক চিত্রনে জাপানে স্বল্পকালীন ট্রেনিং নিয়েছেন ১৯৭৯ সালে। ১৯৬৩ থেকে চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা শুরু করেন। ষাটের দশক থেকেই দেশে চারুকলা বিকাশের আন্দোলনে, প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টির আন্দোলনে সর্বদা সক্রিয় এবং প্রায়শঃ সংগঠকের ভূমিকায় নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী হাশেম খান নিয়মিতভাবে শিল্পকর্ম চর্চা অব্যাহত রেখেছেন, দেশে বিদেশে অসংখ্য শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৯২, ২০০০ ও ২০০২ সালে নিজের চিত্রকলার প্রদর্শনী এবং ১৯৮৬ সালে টোকিওতে নিজের পুস্তক চিত্রনের প্রদর্শনী করেছেন। তিনি শিল্পকলা বিষয়ে বিভিন্ন দেশে সেমিনার ও প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারত, চীন,

www.pathagar.com

জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, নেপাল, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে ও ইংল্যান্ড সফর করেছেন পেশাগত কাজে। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান গ্রন্থের প্রধান শিল্পী এবং তিনি এ পর্যন্ত সহস্রাধিক বইয়ের অলংকরণ ও প্রচ্ছদ অংকন করেছেন। ম্যুরাল করেছেন বাংলাদেশ বিমান বলাকা ভবন চত্বর, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বন্দরের।

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর জন্ম ১৯৩০ সালে এবং মৃত্যু ১৯৮৪ সালে। তাঁর জন্মস্থান চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলায় নরিংপুর গ্রামে। পিতার নাম আব্দুর রহমান পাটেয়ারী এবং মাতার নাম আমিরুন নেসা।

তাঁর কর্মজীবন শুরু সাংবাদিকতায়। দীর্ঘ সাতাশ বছরের সাংবাদিক জীবনে তিনি পূর্বদেশ, আজাদ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক বার্তা ও ইত্তেফাকের মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। দৈনিক বাংলা, দৈনিক বার্তা ও ইত্তেফাকের তিনি সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও সাপ্তাহিক কিশোর বাংলারও তিনি ছিলেন সম্পাদক। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'নূইপা' ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখেছেন। পত্রিকার কলাম লেখার পাশাপাশি বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ এবং সৃজনশীল মৌলিক রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি 'মাঠে মাঠে ধান', 'কালো ঘোড়া সাদা ঘোড়া', 'ফিঙ্গে রাজা', 'প্রাণ বাঁচে পানিতে' ও 'মাটি কথা কয়' নামক বইয়ের লেখক ও 'কিশোর অপরাধ', 'ইরান প্রযুক্তিগত', 'ফিনল্যান্ড' ইত্যাদি বইয়ের অনুবাদক। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির কথকতা' শীর্ষক লোক কাহিনির এক সমৃদ্ধ সংকলন।

১৯৭৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বাইসেন্টেনিয়েল স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সাংবাদিকতার জন্যে একুশে পদক পান। তিনি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন।

শায়খ সায়্যিদ মুহম্মদ বোরহানুদ্দীন (রঃ)

শায়খ সায়্যিদ পরিবারের সন্তান শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন (রঃ) চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ফরাজিকান্দিতে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আলহাজ্ব মাওলানা শায়খ সায়্যিদ আফাজুদ্দীন (রঃ)। প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের কাছ থেকেই শেষ করে চাঁদপুর জেলার সফরমালী হাই মাদ্রাসা থেকে নিউ স্কিম ধারায় ১৯৩৩ সালে মেট্রিক পাস করে চট্টগ্রামের সরকারি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে বিএ পাস করেন। তখন তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে অবস্থান করতেন। ছাত্রজীবন শেষ করে সরকারি চাকুরির পাশাপাশি সমাজসেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এ ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনে ছিলেন একজন কামেল পুরুষ। ইসলাম শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ টান। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালে তিনি হযরত উয়েস আলী ক্বারানী (রাঃ)- এর নামানুসারে ফরাজিকান্দিতে ফরাজকান্দি উয়েসীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৩ সালের ১লা

www.pathagar.com

জানুয়ারি দাখিল, ১৯৫৫ সালে আলিম, ১৯৫৯ সালে ফাযিল স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে উক্ত মাদ্রাসায় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৯ সালে কামিল ফিকাহ বিভাগ খোলা হয়। এছাড়া ১৯৫৯ সালে হাতে কলমে শিক্ষা জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বিলানীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল ও ১৯৬০ সালে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসার জন্য খাজা গরীব নেওয়াজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তি জীবনে কয়েকবার হজ্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ৯ইমে তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নেদায়ে ইসলাম মহিলা মহল।

কালীমোহন ঘোষ

কালীমোহন ঘোষ চাঁদপুরের এক অনন্য সন্তান। ১৯০৫-০৬ সনে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কোচবিহার রাজ কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ পাবনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে স্বদেশি সমাজের যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তা দ্বারা কালীমোহন ঘোষ দারুণভাবে প্রভাবিত হন এবং সভাশেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়ে কালীমোহনকে শিলাইদহ জমিদারিতে পল্লি উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করেন। কালীমোহন গ্রামে কাজ করার সময় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে চিকিৎসা ও হাওয়া বদলের জন্য গিড়িডিতে পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে উঠার পর রবীন্দ্রনাথ তাকে শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রী নিকেতন স্থাপনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকারি ছিলেন। ১৯৩১ সনে কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো- "স্বদেশী আন্দোলনের ৪ বৎসর ক্রমাগত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে বেড়াইয়াছি, তখনও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি যে, আমাদের দুর্গতির মূল কারণ কোথায়। জনসাধারণের অসাড়চিত্তে কোনো নবীন ভাবধারা সঞ্চারিত করা এত কঠিন কেন? বল্লভপুরের পল্লী পরীক্ষাণের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ও এদের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে যখন ভাবিত হইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি পল্লী সমাজের ধ্বংসের প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় এবং ধনী মহাজন ও জমিদার তালুকদারগণের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা, পল্লী জীবনের যেটা Organised Unit সেটা বিচ্ছিন্ন।"

শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতনে সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শান্তিদেব ঘোষ চাঁদপুরের সুসন্তান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথের কাছে শান্তিদেব ঘোষ সংগীত চর্চা করেছেন। কণ্ঠে ও হৃদয়ে রবীন্দ্রসংগীততে তিনি শুধু গ্রহণই করেন নি- রবীন্দ্র সংগীতের প্রচারই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত ও কর্তব্য। মহাপ্রয়াণের মাত্র সাত মাস পূর্বে (২১শে জানুয়ারি, ১৯৪১খ্রিঃ) রবীন্দ্রনাথ শান্তিদেবকে এক পত্রে লিখেছিলেন- "আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে, বিশুদ্ধভাবে যে গানের প্রচার করা তোর কর্ত্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য- আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।"

www.pathagar.com

চাঁদপুর মহকুমার বাজাপ্তি গ্রামে শ্রী শান্তিদেব ঘোষের জন্ম। শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার পিতা কালীমোহন ঘোষ ও মাতা মনোরমা দেবীর সঙ্গে শান্তিদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন অতি শৈশবে। সেই থেকে ওখানেই বড় হয়ে উঠেছেন, ওখানকার পরিবেশেই যা শিখবার সব শিখেছেন।

কেবল সংগীত নয়- নৃত্যের ক্ষেত্রেও শান্তিদেবের সাধনা ও দান শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। এ প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর একটি সুচিন্তিত অভিমত : "রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় ভারতের নৃত্যকলার যে নব অনুশীলন সূচিত হয়েছে, তাতেও শান্তিদেবকে অগ্রণী বলা উচিত। কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ- সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করে বিচিত্র নৃত্যধারার বিশেষ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়েছে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নানা নৃত্যনাট্যের পরিচালনায় তাকেই নৃত্যগীত পরিচালনায় প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।" ('আনন্দবাজার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭)

"রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার বিকাশে শান্তিদেব ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। ১৯৩৫ সনে দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর থেকেই যুগপৎ সংগীত, অভিনয় ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে শান্তিদেবের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়। শান্তিদেবের প্রতি কবির স্নেহ-সূচক 'সুরসেন', 'নটরাজ' প্রভৃতি সম্বোধনে তাঁর স্বীকৃতি রয়ে গেছে।" (মাসিক বসুমতী,' ফাল্গুন, ১৩৬৩) শান্তিদেব ঘোষ 'তাসের দেশে' রাজপুত্র, 'শাপমোচনে' রাজা, 'চিত্রাঙ্গদায়' অর্জুন ও ইন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে অভিনয় ও নৃত্যপটুতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, কোনো দিনই তা ভুলবার নয়।

চিত্রনিভা দেবী

১৯২৮ সালে শিল্প-শিক্ষার্থী হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের কলাভবনে গিয়েছিলেন চিত্রনিভা দেবী। চাঁদপুর পুরাতন বাজারের সংলগ্ন 'বসু-বাড়ী'র গুণবতী কন্যা তিনি। পিতা ভগবান চন্দ্র বসু। মেঘনার ধারে বাড়ি ছিল তাই নিজের খেয়ালে নানা রং- এ রেখায় ধরে রাখতে প্রয়াসী হন মেঘনার ভয়ঙ্কর-সুন্দর রূপকে। গোড়ার দিকে আলপনা ও পিঁড়ি চিত্রণেও হাত পাকা ছিল চিত্রনিভা দেবীর।

কলাভবনে প্রবেশের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'নিভাননী'। রবীন্দ্রনাথ নাম পাল্টে দিলেন-'চিত্রনিভা'। এ নাম নিয়েই তিনি কলাভবনে নন্দলাল বসুর ছাত্রী হিসাবে শিক্ষা নেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পর ওখানেই তাঁর শিক্ষকতার জীবন চলে এক বছর।

শিল্পচর্চার তাগিদে তিনি মনীষীদের অনেক মুখাকৃতি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন, বিধু শেখর প্রমুখ আশ্রমিকদের মুখাবয়ব ধরা আছে তাঁর অমূল্য সংগ্রহে। দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মাজীর সমাধি-মন্দির অলঙ্করণ কাজে ডাক পড়েছিল চিত্রনিভা দেবীর। ১৯৭৩ সালের ৩১শে অক্টোবর 'বিড়লা একাডেমী অব আর্ট এন্ড কালচার'- এ (কলকাতা) এক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এতে অন্যান্যদের সঙ্গে চিত্রনিভা দেবীর অঙ্কিত ৩২টি প্রতিকৃতি স্থান লাভ করেছিল।

গোরাচাঁদ ঘোষাল

চালিতাতলি গ্রামনিবাসী গোরাচাঁদ ঘোষাল ছিলেন একজন বিশিষ্ট সুরশিল্পী। তাঁর চাঁদপুরের গান 'সোনার চাঁদপুর' একটি সুন্দর চিত্রকলা। বহু বছর তিনি কলকাতার মহাজাতি সদনে

www.pathagar.com

নেতাজী জন্ম-জয়ন্তীর বিরাট সমাবেশে (২৩শে জানুয়ারি) উদ্বোধন সংগীত 'নেতাজী প্রণাম' (রচনা ঃ সাংবাদিক শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য) গেয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। একবার মহাজাতি সদনের নেতাজী উৎসবেই সাংবাদিক শ্রীভট্টাচার্যেরই রচিত 'নেতাজী গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন করে বহুল প্রশংসা অর্জন করেন শ্রীঘোষাল ও তাঁর দল।

শৈলেন ঘোষ

চাঁদপুর শহরের পুরাণবাজার অঞ্চলে ঘোষদের বাড়ির শৈলেন ঘোষের শৈশবেই সংগীতের দিকে ঝোঁক যায়। তাঁর গলায় ছিল অপূর্ব মাধুর্য। তিনি সহজেই শুনে শুনে গান আয়ত্ব করে নিতেন। সমরেন্দ্র পালের নিকট সংগীতের কিছু কিছু তালিম নিয়েছেন তিনি। শৈলেন বাবু চাঁদপুর শহরে সংগীত চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'চন্দ্রলোক' নামে একটি সংগীত সংস্থা।

সাগরময় ঘোষ

সাগরময় ঘোষ ১৯১২ সালে জন্মগহণ করেন। ১৯৩২ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এল, তখন ছাত্ররাও সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন ছাত্র ছিলেন। তিনিও সেই আন্দোলনে যোগ দেন এবং ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এক মাস রাখার পর তাকে চালান করা হয় দমদম স্পেশাল জেলে। সেখানে তখনকার পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বহু নেতা ও কর্মী কারাবন্দি হিসাবে ছিল।

বি.এ পাশ করার পর ১৯৩৭ সালে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারিতে তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন। তার পরের দিনেই 'আনন্দবাজার' পত্রিকারই আরেকটি পত্রিকা 'দেশ'-এ যোগদান করেন। 'দেশ' পত্রিকায় তিনি একাধারে তেতাল্লিশ বছর সম্পাদনা করেন।

ড. চাঁদপুর জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন

ঐতিহাসিক কালের ঘটনা প্রবাহে চাঁদপুর জেলার জনজীবন গভীরভাবে সম্পৃক্ত, উদ্বেলিত ও আলোড়িত হয়েছে। চাঁদপুর উপজেলার ভূমিরূপ গোটা সমতল বাংলার ভূমিরূপেরই প্রতিকৃতি। নদ-নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় সমতল বাংলাদেশের ভূমিরূপের যে পরিবর্তন ঘটেছে, চাঁদপুর জেলার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। এতদঞ্চলে নদী সিকস্তি ও নদী পয়স্থির প্রভাবমুক্ত কিছু পুরাভূমির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি ভূ-ভাগের লাগোয়া সমভূমি চাঁদপুর। এ পাহাড়ি ভূ-ভাগে প্রাচীন প্রস্তর নব্যপ্রস্তর যুগের কিছু পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ায় এতদঞ্চলে আদিম কোনো সমাজের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমিত হয়। পশু পক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়লে কোনো সমাজের লোকের পক্ষে কৃষিকাজ ও পশুপালন উপলক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত সমভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন বৈচিত্র্য ছিল না। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী। কিছু কিছু শিকারজীবী, বেদে, মৎস্যজীবি ও যাযাবর শ্রেণির অস্তিত্ব বিদ্যমান। দৈব দুর্বিপাক মোকাবেলার জন্য গ্রামীণ সমাজ নিজেদের ফসলের একটি অংশ প্রদান করে ধর্মগোলা বা ভান্ডার গড়ে তুলতো। যা আদিম কোনো সমাজের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ঐতিহ্যবাহী।

www.pathagar.com

কৃষিজীবী কোনো সমাজ ঠিক কতযুগ বা কতকাল টিকে ছিল তাদের চালচলন ও রীতিনীতি কী ছিল তা সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে তা বলার উপায় নেই। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় থেকে বাংলাদেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়। এটা খ্রিস্টজন্মের ৩২৬ বছর পূর্বের কথা। গ্রিক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস এ সময় বাংলাদেশের রাজ্য ও সৈন্যবল সম্বন্ধে লিখে গেছেন। বৈদিক সাহিত্যেও বাংলাদেশের রাজরাজাদের কথা উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রাজশক্তিসমূহ গ্রামগুলোকে সাংগঠনিক রূপদান করে এবং ছোটো ছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক গ্রাম গড়ে তোলে। পরবর্তী শাসকরাও এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করায় গ্রামগুলো আর্থসামাজিক রূপ পায়। উৎপাদিত দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের ভিতর দিয়ে শত শত বছর ধরে এগিয়ে চলছিল গ্রাম ভিত্তিক সমাজ। চাঁদপুরের ছড়ানো ছিটানো গ্রামগুলো কিছু কাল আগেও এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ছিল। এসব পেশাভিত্তিক গ্রামগুলোর মধ্যে তাঁতখানা, তাঁতুয়া, ঢাকিরগাঁও, আশ্বিনপুর, মেহারণ, পাটন, কাশিপুর ও লামছড়ি উল্লেখযোগ্য।

এ জেলার পুরাকীর্তিসমূহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এতদঞ্চলের কিছু কিছু সামন্ত রাজশক্তির অস্তিত্ব সম্পর্ক ধারণা জন্মে। ইতিহাসের উত্থান-পতন, রাজ-রাজাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাংলাদেশের সনাতন গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন করেনি, তেমনি অত্র জনপদের সামন্ত শক্তির উত্থান পতনেও জনজীবনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ব্রিটিশ শাসন প্রবল বেগে বসার আগ পর্যন্ত এখানকার কামার, কুমার, নাপিত, পুরোহিত, তাঁতি, জেলে চাষি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর থেকে একই ধরনের শ্রমবিভাগ, উৎপাদন পদ্ধতি ও জীবন যাত্রা নির্বাহ করত। দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের শ্রমলব্ধ উৎপাদনের উপর অনুৎপাদনকালীন মধ্যস্বত্বভোগীদের ভাগ বসানো প্রক্রিয়া অপরিশীলিতভাবে অব্যাহত থাকলেও গ্রামীণ সমাজ ছিল অনড় অটল।

বাংলাদেশের গ্রামগুলোর ভিত যে ভাঙেনি, তার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের আগ পর্যন্ত যেসব রাজশক্তি বাংলাদেশ শাসন করেছে, তারা ছিল এদেশেরই লোক অথবা বিদেশি হলেও তারা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করেছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এদেশের মাটিতে সম্পন্ন হওয়ায় অর্থ সম্পদ বিদেশে পাচার হয়নি। দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রা সংকট কখনো দেখা না দেয়ায় গ্রামীণ সমাজগুলো আর্থিকভাবে তেমনভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের অংশ বিশেষ রাজস্ব হিসাবে দেয়ার রীতি চালু থাকায় দৈব দূর্বিপাকে ফসলের ক্ষতি হলেও কৃষকদের রাজস্ব মওকুফ হতো। তবে রাজস্ব আদায়ের নামে কৃষক নিপীড়নের ঘটনাও কম নয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং ইউরোপীয়রা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গমন করে। এসব দেশ থেকে নিজেদের পুঁজি গঠন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৬৪৪ সালে সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকে ইংরেজ বণিকেরা বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পায়, সম্রাট কন্যা জাহানারার সুচিকিৎসার সুবাদে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে মোগল রাজশক্তি দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সামন্ত রাজশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোগলদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ইংরেজগণ

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এসে এখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে কৌশলে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে অধিক হারে জমির উপর কর ধার্য করে এবং এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কৃষক জমি হতে উচ্ছেদ হতে থাকে। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর শোষণ এবং তাদের সৃষ্ট ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও এর পরিণতিস্বরূপ ভয়ংকর মহামারীর ফলে বাংলা বিহারের দেড় কোটি লোক প্রাণ হারায়। কৃষকদের জীবনের সাথে সাথে বাংলাদেশের কুটির শিল্পবস্ত্রের কারিগরদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ইংরেজ বণিকেরা নামমাত্র মূল্যে অথবা কেড়ে নিয়ে ইউরোপের বাজারে চালান দিয়ে বিপুল মুনাফা লুটতে থাকে। বুভুক্ষু ভূমিহীন কৃষক ও বেকার কারিগরগণ বাঁচার তাগিদে সংঘবদ্ধ হয়ে অচিরে ইংরেজ বণিকদের গুদামের মজুদ শস্য, জমিদার জায়গিরদার ও মহানজনদের ঘরের সম্পদ কেড়ে নিতে প্রয়াস পায়। এ দলের সাথে যোগ দিল ধ্বংস প্রায় মোগল বাহিনীর চাকুরীচ্যুত বেকার সৈনিকেরা। শাসক ও জমিদারগণের সঙ্গে এ বিদ্রোহী দলের বিভিন্নস্থানে সংঘর্ষ বাঁধে। ভূমিহীন কৃষক, বেকার কারিগর ও চাকুরিচ্যুত মোগল সৈন্যদের এ সংগ্রাম ১৭৬৩-১৮০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ শাসক এ আন্দোলনকে সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে। বস্তুত ইহা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে প্রথম স্তর। ইহা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম। আঠার-ঊনিশ শতকের উপর্যুপরি কৃষক বিদ্রোহের জন্য কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দায়ী। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রবর্তিত এ ভূমি ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপর প্রবল অভিঘাত আনে এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এ নতুন ভূমি ব্যবস্থা বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত হয়েছে নতুন এক শ্রেণি, নির্মিত হয়েছে রাজনৈতিক পটভূমি, চিহ্নিত করে দিয়েছে সাংস্কৃতিক বিকাশের সীমারেখা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিকাশের ভূমিকা রচনা করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ অঞ্চলে সৃষ্টি হলো জমিদার বা ভূমি মালিকের মধ্যস্বত্বভোগী, ভূমিহীন কৃষক, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং ভদ্রলোক শ্রেণির। ১৭৬৯ সালে জেমসওয়াট উন্নত ধরনের বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কার করে যার ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে তাঁতশিল্প যন্ত্রের প্রচলন ঘটে। ক্রমান্বয়ে কারখানাজাত বস্ত্র এসে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়।

ইংরেজ শাসক ও বণিক সমাজের শাসন, শোষণ, অনাচার, অবিচার দেশীয় কুটির শিল্প সমূলে ধ্বংস হওয়ায়, নীলকর সাহেবের অত্যাচার ইত্যাদি কারণে উপমহাদেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হয়ে একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অনেকে বনে জঙ্গেলে পালিয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর সারা বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন পরবর্তীকালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেঁনেসা যে সময় প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ভিত্তি রচনা করতে ব্যর্থ হলো ঠিক সে সময় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী ইংরেজ শাসন ও জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন কৃষক সংগ্রাম সমগ্র জাতির সম্মুখে এক নতুন সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করলো। যা ছিল বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ভূমি।

www.pathagar.com

ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে সকল মহাজনি সুদি কারবারি সম্প্রদায় নগদ অর্থে জমিদারি ক্রয় করে ছিল এর মধ্যে বোয়ালিয়ার জমিদার ললিত মোহন চৌধুরী, রমনী মোহন চৌধুরী, মতলবের জগবন্ধু সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, নায়েরগাঁয়ে রামচন্দ্র মৌলিক, কাশিপুরের নাগ জমিদারি উল্লেখযোগ্য। এ জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে অধিক হারে খাজনা আদায় করে নিজেদের বখরা রেখে বাকিটা কোম্পানির কোষাগারে তুলে দিত। এসব জমিদারদের বিলাস ব্যসন, প্রতাপ প্রতিপত্তির বহু কথা কাহিনি লোকমুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চাঁদপুরের এসব জমিদার জোতদার ও পাওনাদার শ্রেণি অবশ্য প্রজার মঙ্গলের জন্যে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, দিঘি, হাট বাজার ইত্যাদি তৈরি করেন।

বাংলাদেশের সর্বত্র এককালে যে নীল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, চাঁদপুরেও এর বিস্তৃতি লাভ বিচিত্র ছিল না। চাঁদপুরের বিভিন্নস্থলে নীল কুঠি বর্তমান ছিল এবং এ নীল কুঠির আশেপাশে বিস্তৃতি এলাকায় এককালে ব্যাপকভাবে নীল চাষ হতো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখনো শীলমন্দি গ্রামে এক ব্রিটিশ কুঠির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। কিছুকাল আগেও এ কুঠিতে নীল তৈরির সরঞ্জামাদি বিশেষ করে কড়াই চুল্লি বিদ্যমান ছিল। শীলমন্দি গ্রামের পাশ দিয়ে নদীপথের পরিত্যক্ত খাত দেখতে পাওয়া যায়। যে পথ দিয়ে কোম্পানির পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করত। চাঁদপুরের জনজীবন বা আর্থ-সামাজিক জীবন এ নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ব্রিটিশের সামন্তবাদী আমলাতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার এ উপজেলার জনগণ। বাংলাদেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চাঁদপুরের এ ক্ষুদ্রতম সমাজ চিত্র বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবহ। এ জেলায় কুটির শিল্পজাত বস্ত্র বয়নকারী কারিগর শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানে অনেক গ্রামে এসব কারিগর ও তাঁতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাঁতি শ্রেণি যে উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচারিত তাঁতি শ্রেণির উত্তরাধিকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ বেনিয়াদের অত্যাচারে যেসব কারিগর শ্রেণি বেকার হয়ে বনে জংগলে আত্মগোপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে সংঘবদ্ধ হয়ে ফকির সন্ন্যাসী বেশে ব্রিটিশদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, চাঁদপুরের তাঁতি বা কারিগর শ্রেণি যে সে বিদ্রোহের সহযোগী যোদ্ধা ছিল না, তা কে বলবে। ঐতিহ্যগতভাবে চাঁদপুর জেলার কারিগর সম্প্রদায় বা জনগণ ঐ বিদ্রোহের অংশীদার।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে চাঁদপুর জেলা বাংলাদেশের একটি অঙ্গ হিসাবে মোগল পাঠানদের অধীনে দীর্ঘকাল ছিল। মোগল আমলের সামন্তবাদী শাসনের অবশেষ হিসাবে খুব একটা বড়ো কিছু না পাওয়া গেলেও এখানে যে অনেক মোগল বা পাঠান জমিদার জোতদার বা ছোটো খাট সামন্তরাজ বর্তমান ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোগল সুবেদার শাহ সুজার শাসনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কুমিল্লার শাহ সুজার মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। দিঘলদী গ্রামে মোতালেব জমাদারের বেড় নামে একটি বিশেষ এলাকা চিহ্নিত আছে। মোতালেব আহমেদ জমাদারের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইমারতের অবশেষ মোগল পাঠান আমলের স্থাপত্য রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। নারায়ণপুরের হোসেন আলীর মসজিদ সুলতানি আমলের মসজিদ বলে উল্লেখ আছে। এসব মসজিদের নির্মিত প্রাচীন ব্রিজ মোগল বা পাঠান আমলের বলে অনুমিত হয়। এ

www.pathagar.com

জেলার প্রাপ্ত মোগল ও সুলতানি আমলের পুরাকীর্তিসমূহ মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের চিহ্নস্বরূপ। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ অঞ্চলের জনজীবন মোগল ও সুলতানি আমলের শাসনে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবে প্রাক মুসলিম যুগের পুরাকীর্তিসমূহের বিলীনকৃত চিহ্ন এখনো বহমান। এ জেলার আশ্বিনপুর, লাকশিবপুর, কাচিয়ারা ও ধনারপাড়ে প্রাপ্ত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ মধ্যযুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। চাঁদপুর জেলার জনজীবন প্রাক সুলতানি যুগের সামন্তবাদী শাসনের আওতাধীন ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোগল রাজশক্তির পতনের পর বৃটিশ রাজত্ব পাকাপোক্তভাবে জেঁকে বসলে ভারতের সিংহাসন হারা মুসলমান ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এক গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এ অবক্ষয়িত সমাজ, পীর পয়গম্বর গাজীর থেকে ওলা বিবি, সত্যপীর, মানিক পীর পর্যন্ত পূজা করে। অসংখ্য পীরস্থান পীর ফকিরের আস্তানা ও দরগাহ গজিয়ে উঠে। জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলিত অপমানিত মুসলমান সমাজ নতুন ইংরেজদের শত্রু বলেও বিবেচিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আরবের আব্দুল ওহাব ও মধ্য ভারতের অলি উল্লাহ দেহলভী ইসলাম ধর্মে ও মুসলমানদের সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার, পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এক আদর্শগত আন্দোলন গড়ে তোলে যা ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ওহাবী আন্দোলনের অনুকরণে ধর্মীয় পোষাকের অন্তরালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এবং তাদের রাজছত্রাশ্রিত উপশাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে (জমিদার শ্রেণি) সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। বাংলাদেশে শরীয়ত উল্ল্যাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া (ফরিদপুর) ওহাবী আন্দোলনের আদর্শে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাংলাদেশে ইহা ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের জন্মস্থান ফরিদপুর হতে নদীমাতৃক দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় অর্থাৎ কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এখনো চাঁদপুরের মতলব উপজেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ফরায়েজী মতাবলম্বীদের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে। বৃহত্তর মতলব উপজেলার ফরাজীকান্দি গ্রামের নামের সঙ্গে এই আন্দোলনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পাড়াগাঁয়ের কৃষক, তাঁতি, কুলু, প্রভৃতির দরিদ্র শ্রেণি হাজী শরীয়তুল্লাহর শিষ্য ছিলেন। মূলত এ আন্দোলন ছিল এতদঞ্চলের মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সর্বঅঞ্চল মুক্তি সংগ্রামে সমান শরীক হয়। সেই হিসাবে চাঁদপুর জেলা এই আন্দোলনের ধারা থেকে দূরে ছিল না। এখানেও বিভিন্ন স্তরের বেশ কিছু লোক জাতীয়তা ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। এ মুক্তিসংগ্রামে সাংগঠনিকভাবে প্রথমে কংগ্রেস পরে মুসলিম লীগ জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করে। জনসাধারণের ভিতর জাতিগতভাবেএ দুই সংগঠনের প্রভাব ছিল। কিন্তু তাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে শম্বুক গতির কারণে কতিপয় সংগঠন মুক্তিপাগল রাজনীতি সচেতন লোকদেরকে কাজে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত রেখে মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য এগিয়ে আসে। তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের

www.pathagar.com

চাইতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অনিয়মতান্ত্রিক তৎপরতায় বিশ্বাস করেন। এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রগতিশীল সংগঠন বা সশস্ত্র সংগঠন গড়ে উঠে। এই প্রগতিশীল সংগঠনের তৎপরতাও অত্র জেলা বেশ তৎপর ছিল। ধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য (বোয়ালিয়া) ও প্রভাত চক্রবর্তী (বরদিয়া) বিশিষ্ট বিপ্লবী ছিলেন। উভয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। অপর বিপ্লবী অনন্ত বা সাধুও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বোয়ালিয়ার আশ্রমের মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। হাতেম আলী মাস্টার (ঢাকিরগাঁও) এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে জাতিগত স্বার্থে আর্থ-সামাজিক পরবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণার উন্মেষ হয় এবং ব্রিটিশ শাসন নির্যাতন থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে এদেশের জনগণ এগিয়ে যায়।

ঢ. চাঁদপুর জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সংগঠন

বর্তমান মতলব বাজরের পূর্ব নাম ছিল বৈরাগীর বাজার। প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে অর্থাৎ বাংলা ১২০০ শতকের শেষ ভাগে বৈরাগী বৃন্দাবন বাবাজী নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বর্তমান মতলব দক্ষিণ পূর্ব বাজারে অবস্থিত বড়ো আখড়াটি স্থাপন করেন। আখড়াটি ঘিরে বাজার বসতে শুরু হয়। লোকমুখে বাজারটির নাম হয় বৈরাগীর বাজার। বড় আখড়ার সেবাইত ছিলেন সদানন্দ বৈরাগী। সদানন্দ বৈরাগী ও বৃন্দাবন বাবাজী উভয়েই আখড়ার সেবাকার্যের প্রয়োজনে নিয়মিত সাধনসংগীত ও নামকীর্তন করতেন। সদানন্দ বৈরাগী ছিলেন ভজন ও ভক্তিগীতির অনুরাগী গায়ক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নামকীর্তনের একটি দল গড়ে উঠে। ১৩৫২ বাংলা সনে গৌরনিতাই নামে দলটি আত্মপ্রকাশ করে। এটিই চাঁদপুরের মতলবের ইতিহাসে প্রথম সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক দল। যা আজ পর্যন্ত সগৌরবে টিকে আছে। অতএব বড়ো আখড়াটিই সমগ্র মতলব উপজেলার (উত্তর ও দক্ষিণ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূলে। (সূত্র- গাতক হরে কৃষ্ণ দাস-৯২, মনোরঞ্জন শীল-৮৭) গৌরনিতাই সম্প্রদায়ের পরিচালক ছিলেন সন্তোষ ভৌমিক (হারমোনিয়াম), খোলি-মাধপ পাল, নিত্যগোপাল ভৌমিক, রাধা গোবিন্দ শীল, বেহালায়-আনন্দ বারুলী, এস্রাজে-শচীচন্দন সাহা, দোতারায়-মনোরঞ্জন সাহা, শীষ বাঁশী-পরেশ সরকার, গায়ক-সুধাবিন্দু সাহা, অরুণ বিশ্বাস, হীরালাল সাহা, হরে কৃষ্ণ দাস-৯২ ও মনোরঞ্জন শীল-৮৭।

শিল্পীদের সকলেই ছিলেন সৌখিন বাজনাদার- গায়ক, সদালাপী, সদাহাস্যময় ও সাদা মনের মানুষ। পেশায় পান বিক্রেতা, সুপারি বিক্রেতা, পাট ব্যবসায়ী, কুমার, ধোপা, কিন্তু প্রত্যেকেই ঈশ্বরভক্ত। হরে কৃষ্ণ দাস-৯২ ও মনোরঞ্জন শীল- আজও গৌর নিতাই সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়ে নামকীর্তন করে চলেছেন।

সৌখিন যাত্রা দল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ)

সম্প্রদায় ভিত্তিক নামকীর্তনে আবদ্ধ না থেকে- মতলববাসীকে আত্মবিনোদন ও সমাজ সচেতন করার উদ্দেশ্যে গৌরনিতাই সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শিল্প ও পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে ১৩৬০ বাংলা সনে একটি যাত্রা দল গড়ে ওঠে। এর কোনো নাম ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা- শ্রদ্ধেয় যদুনন্দন দাস, পরিচালক চিনু ঘোষ (শ্রী নিবাস ঘোষ)। শিল্পীদের মাসিক চাঁদায় দলটি পরিচালিত হত। মহিলা শিল্পী পাওয়া যেত না বিধায় পুরুষরা নারী

www.pathagar.com

সেজে অভিনয় করতেন। অভিনেতাদের- যুবরাজ-সুধী ঘোষ, বিবেক- সুধাবিন্দু সাহা, রাজা-বাদশা- হীরালাল সাহা, রেজু ডাকাত- যদুনন্দন দাস, নৃত্যে হরে কৃষ্ণ সরকার, সংগীত শিল্পীদের মধ্যে সংগীত (বিবেক)- হরে কৃষ্ণ দাস (৯২), নারী ভূমিকায়- ধীরেন্দ্র পোদ্দার (৮৭), কৃষ্ণা সাহা এ দু'জন শিল্পী আমাদের মাঝে বর্তমান বিধায় তথ্য প্রদান করেছেন মাটির মা, সমাজের বলী ইত্যাদির পালা তাঁরা সময় সুযোগ করে- হ্যাজাক বাতির মাধ্যমে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতেন।

পদাবলী কীর্তনের দল (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)

১৩৬৫ সনে শিল্পী হরে কৃষ্ণ দাস (৯২) গড়লেন- পদাবলী কীর্তনের দল। দক্ষ যন্ত্রশিল্পীদের সহযাগিতায় তিনি পরিবেশন করতেন- মাথুর এবং মথুরা সংবাদ, নৌকা বিলাস, সুবল মিলন ইত্যাদি পদাবলি পালা। তিনি ধোপা মাষ্টারের কাজ করতেন।

নীলা কীর্তনের দল (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)

১৩৭০ সনে গৌর নিতাই সম্প্রদায়ের আরেক সুকণ্ঠী গায়ক সুধাবিন্দু সাহা গড়লেন- নীলা কীর্তনের দল। তিনি মেয়েদের প্রথম সংগীত বলয়ে আনতে সক্ষম হলেন। মেয়েদের নিয়ে দলটি গড়লেন। যন্ত্রী ছাড়া সকল চরিত্রেই অভিনয় করত মেয়েরা। তাদের পরিবেশিত নীলার মধ্যে- 'নৈদের দুলাল' পালাটি এখনো মানুষ ভুলেনি।

মতলবের সংগীত জগতের এ ধারাটি পরবর্তী সময় বজায় থাকেনি। মাঝে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার একটি বড় কারণ মুক্তিযুদ্ধ। এ সময় সবকিছুই ওলট পালট হয়ে গেছে। অবশ্য মতলবের সমগ্র শিক্ষাঙ্গণে মুক্ত বুদ্ধির চর্চার অনীহাকে কম দায়ী করা যায় না। ১৯৬৮ সাল থেকে মতলব সূর্যমুখী কচি-কাঁচার মেলা- নিষ্ঠার সাথে সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। শিশুদের মনে সাংস্কৃতিক বিকাশে পরিচালক মাকসুদুল হক বাবলু-এর অবদান মতলববাসী স্মরণ রাখবে। সংগীত পরিবেশন এবং প্রশিক্ষণের জন্য সর্বক্ষণ সহযোগিতা দিয়েছেন অধ্যাপক নারায়ণ চক্রবর্তী, সুবল চক্রবর্তী ও পরবর্তী সময়ে দেওয়ান রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির রেবন এসব শিল্পীরা। দেওয়ান রেজাউল করিম স্বাধীনতার পর প্রথম সংগীত শিক্ষকতার কাজ শুরু করে মতলবের সংগীতজগৎকে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন অদ্যাবধি। পরবর্তী সময়ে হুমায়ুন কবির রেবন ও রাখাল মজুমদার বর্তমান পর্যন্ত সংগীত শিক্ষকতা করছেন। এছাড়াও মতলবের সাংস্কৃতিক অঙ্গন যাদের কারণে উজ্জীবিত ছিল তারা হলেন- অ ক ম হারুন চৌধুরী, পারুল বেগম, সোহেলা পারভীন, ছবি বেগম, ইমত আরা রুনু, শিউলী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, জসিম উদ্দীন আইসিডিডিআরবির ডাঃ মিত্র, নসরুল্লাহ দেওয়ান, কামরুননাহার, এডভোকেট কামরুল, কামাল আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক নারায়ণ চক্রবর্তী ও গোলাম আশ্রাফ বাবুল। অমৃতাঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি নামে একটি সংগঠন '৭১ পরবর্তী সময়ে এ উপজেলায় সংগীত প্রশিক্ষণ প্রদান সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করত। যার সভাপতি ছিলেন কামরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি ছিলেন দেওয়ান রেজাউল করিম।

শোভা সংগীতায়ন (২০০১)

২৫শে বৈশাখ ১৪০৮ (৮ই মে, ২০০১) রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত হলো- শোভা সংগীতায়ন নামে সংগীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি। প্রশিক্ষক জনাব দুলাল

www.pathagar.com

পোদ্দার। সংগীত কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য বাঙালির হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ধারা ও গৌরবময় ঐতিহ্যের লালন।

২০০১ থেকে আজ পর্যন্ত মতলব দক্ষিণ উপজেলায় অবস্থিত মতলব শপিং সেন্টারে প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সমগ্র মতলব উপজেলার সংগীত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। ঋতুবরণ, জাতীয় উৎসব ও গুণী সম্মাননা ও রবীন্দ্র, নজরুল জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে অনুষ্ঠান মালা আয়োজন করে চলছে প্রতিষ্ঠানটি।

জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ-২০০১

জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সংগীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ (৯ই জুন ২০০১) শোভা সংগীতায়ন পরিদর্শনে এলে ঘোষণা দেন- জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ-মতলব শাখার। সভাপতি নির্বাচিত হন প্রভাষক দুলাল পোদ্দার। ঐ দিনই তিনি ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে রবীন্দ্র সংগীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন। মতলব দক্ষিণ উপজেলায় আগমন ঘটেছে সন্‌জীদা খাতুন সহ ছায়ানট তথা দেশ বরণ্যে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও রবীন্দ্র অনুরাগীদের। বছরব্যাপী সার্ধশত রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে মতলবের দীপ্ত বাংলা প্রাঙ্গণে স্কুল, কলেজ, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের এক হাজার শিল্পী নিয়ে পরিবেশিত হয় "হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান (২০১২)"। সংগীত পরিচালনা করেন বরেণ্য রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী মিতা হক।

নজরুল একাডেমী- ২০০৭

নজরুল সাহিত্য ও সংগীতের গবেষণার উদ্দেশ্য ২০০৭ সনে সাংবাদিক শ্যামল চন্দ্র দাস এর সভাপতিত্বে আহ্বায়ক মেজবাহ উদ্দিন মেজু, সদস্য সচিব আশিক কবিরকে নিয়ে মতলব দক্ষিণ উপজেলায় গড়ে ওঠে নজরুল একাডেমী। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হচ্ছেন মেসবাহউদ্দিন মেজু, শ্যামল চন্দ্র দাস, সমীর নন্দ সাহা, হোসেন আহমেদ, মাহফুজ মল্লিক। প্রধান উপদেষ্টা ইউএনও, উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছে মাকসুদুল হক বাবলু, দেওয়ান রেজাউল করিম, মুহাম্মদ আবদুল কাইউম খান, ডাঃ মাহবুবুর রহমান, হুমায়ুন কবির রেবন এবং এস.এম. সেলিম। কবি নজরুল ভিত্তিক ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। উপজেলাবাসী জানতে শুরু করে কবি নজরুলের অজানা বিভিন্ন দিক।

লালন চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র (২০০৮

২০০৮ সন থেকে প্রতিষ্ঠিত লালন চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি দেওয়ান রেজাউল করিম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী প্রতি বছরই পৌষ এবং নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় রাতভর লালন সংগীতের আসর বসান। এতে দেশের প্রখ্যাত লালন গবেষক ও শিল্পীদের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় আগমন ঘটে।

'সনক' আবৃত্তি সংগঠন (১৯৯৯)

কবিতা আবৃত্তির সংগঠন 'সনক'। ১৯৯৯ সনে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রেবেকা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক সাইয়েদুল আরেফিন শ্যামল। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সংগঠন কবিতা পাঠ নিয়ে কাজ করে আসছে।

www.pathagar.com

কবিতাঙ্গণ আবৃত্তি পরিষদ ২০০৭

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রভাষক আইনুন নাহার কাদরী। ২০০৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কবিতা পাঠ নিয়ে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে নানা ধরনের কাজ করে চলছে সংগঠনটি। এ সংগঠনটি প্রমিত উচ্চারণ, বাচিক উৎকর্ষ সাধন, উপস্থাপনার বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। প্রতি সপ্তাহে একদিন এ নিয়ে প্রশিক্ষণের আসর বসে। জাতীয় দিবসে ছড়া ও সময় সুযোগ পেলেই কবিতা এবং পুঁথির ঝুড়ি নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হতে কার্পণ্য করে না। সংগঠনটি চাঁদপুরে কবিতা পাঠ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় কর্মী বন্ধু হাবিবুর রহমান কাকনকে পর্যন্ত হারিয়েছে। তবু কবিতার প্রেরণায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এগিয়ে চলছে।

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (২০০৮)

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী মতলব দক্ষিণ শাখায় আত্মপ্রকাশ ঘটে ২০০৮ সনে। সভাপতি লক্ষী রানী দাস তারা, সাধারণ সম্পাদক নিমাই চন্দ্র ঘোষ। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি নিয়ে সংগীতের পাশাপাশি আন্দোলনরত অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় সংগঠনটিকে।

ললিতা সংগীতালয় (২০০০)

শিল্পী রাখাল মজুমদার পরিচালিত— ললিতা সংগীতালয়। ২০০০ সন থেকে তিনি সংগীত শিক্ষকতার পাশাপাশি দলবদ্ধ সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। সংগীত রচনা ও সুর দিয়ে সুযোগ পেলেই দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে আসছেন আজ পর্যন্ত। চিরকুমার শিল্পী রাখাল মজুমদার মতলব সংগীতের আয়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজেই গান লিখেন, সুর এবং কণ্ঠ দেন। একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী হিসেবে তিনি অনেক গান ও গীতিনাট্য লিখেছেন।

নাট্যদল-মঞ্চ কণ্ঠ

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। সভাপতি শাহ গিয়াস, পরিচালক- কাউসার আহাম্মেদ। মতলব দক্ষিণ উপজেলায় একমাত্র নাট্য দল জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে সুযোগ করে নাটক পরিবেশন করে থাকে। তাদের সফল পরিবেশিত নাটক পলাশ ডাঙ্গার ময়না, রক্তে গড়া স্বাধীনতা ২০১৩ সনে স্বাধীনতা দিবসে মতলববাসী সানন্দে উপভোগ করেছে।

হুমায়ুন করিব রেবন সরকারি কর্মকর্তা (উপজেলা সমাজসেবা অফিস) হলেও সংগীতচর্চা করেন নিয়মিত। প্রায় ৩০ বছর ধরে তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়ে মতলবের অনেক ছেলেমেয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন এবং বেতার টেলিভিশনে নিয়মিত গান করছেন। আতিক বাবু, দিনাত জাহান মুন্নী, সজিব কুমার বণিক, শাম্মী আক্তার, সাইফুন্নাহার ইতি, লক্ষী রাণী সাহা, গীতা রাণী সাহা, শাওন, আশিক কবির, ইশরাত জাহান সংগীতা, লোপা সহ আরো অনেকেই জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছেন, যারা হুমায়ুন কবির রেবনের কাছ থেকে হাতে খড়ি নিয়েছেন। আতিক বাবু প্রথম হাতে খড়ি নিয়েছেন দেওয়ান রেজাউল করিম থেকে।

দিনাত জাহান মুন্নি ১৯৮৫ সালে ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারী এডুকেশন দেশাত্মবোধক ২য় স্থান রৌপ্য পদক, মৌসুমী শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় দেশাত্মবোধক

www.pathagar.com

জারিগান ২য় স্থান রৌপ্য পদক, ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিযোগিতায় হামদ ও নাতে ১ম স্থান জাতীয় স্বর্ণপদক, ১৯৯৩ সালে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় লোকগীতিতে ২য় রৌপ্য, ১৯৮৭ সালে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান স্বর্ণপদক, জাতীয় রেড ক্রিসেন্টে সোসাইটি ৮৯ ক্যাম্প, ইত্যাদি সহ আরো বহুবার বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে মতলবকে গৌরবান্বিত করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। দিনাত জাহান মুন্নির সংগীতে হাতে খড়ি প্রথম দিকের শিক্ষণে ভূমিকা ছিল মতলব সূর্যমুখী কচি-কাঁচার মেলা ও স্থানীয় সংগীত প্রশিক্ষক হুমায়ুন কবির রেবনের।

২০০৮ সালের ৪ জানুয়ারি অনন্য ধ্রুপদ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। নাজমুল আহসান খোকন ও এস আরেফিন শ্যামলের যৌথ পরিচালনায় কেন্দ্রটির কার্যক্রম চলে। বর্তমানে কচি-কাঁচা প্রাঙ্গণে সংগীত, নৃত্য, তবলা, ছবি আঁকা ও গীটার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলছে। সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকাতে বিভিন্ন সংগীত বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাজমুল হাসান খোকন।

এছাড়াও বেশ কয়েকজন শিল্পী আছেন যারা বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত উপস্থাপন এবং সংগীত পরিবেশন করে যাচ্ছেন।

ণ. মাজার

হযরত শাহ্ মাদা খাঁ (র.) : হাজীগঞ্জের পূর্বদিকে অদূরে আলীগঞ্জে কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তার পাশে ডাকাতিয়া নদীর তীরে বহিরাগত রাশতি শাহ (র.) এর সাথী বলে কথিত শাহ্ মাদা খাঁর (আলী মারদান খাঁ) এর মাজার। মাজারটি বহুকাল যাবত অনাবিস্কৃত ছিল। ১১৫৫হিঃ ১১৪৫ সন ও ইংরেজি ১৭৩৮ সালে সোনার গাঁ সরকার অধীনস্থ বলাখালের জমিদার লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী অচিহ্নিত দ্রোণ জমি মাজার সংলগ্ন মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। আর মোতাওয়াল্লী করেন কাজী করমুল্লাহকে। তাঁর বংশধরেরাই বর্তমান মোতাওয়াল্লী।

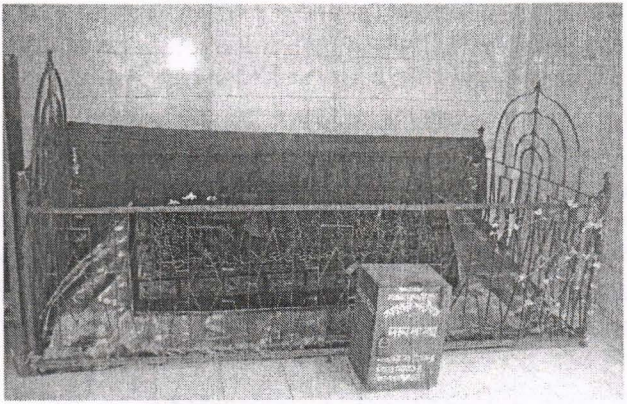

আলীগঞ্জে অবস্থিত হযরত মাদা খাঁর মাজার (আলী মর্দান খান)

www.pathagar.com

হযরত কাজী করমুল্লাহ (র.) : হাজীগঞ্জ থানার ওড়পুর গ্রামে এই সাধক এক জংগলময় স্থানে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দরবেশ। বাঘের পিঠে চড়ে বেড়াতেন বলে কথিত। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর বারজন সঙ্গী নাকি এখানে কিছু সময় অবস্থানের পর ধর্ম প্রচারের জন্যে বিভিন্ন দিকে চলে যান। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বনরাজির মধ্যে অবস্থিত পরিচ্ছন্ন তাঁর মাজার। এটি গরম মাজার বলে পরিচিত।

হযরত মিয়া শাহ (র.) : শাহরাস্তি থানার ঘড়িমণ্ডল গ্রামে মোহাম্মদ আবদুল গণি মিয়া শাহের মাজার। চাঁদপুর জেলায় তিনি ছিলেন জৈনপুরের মাওলানা কেরামত আলী (রঃ) এর প্রথম মুরিদ। তাঁর নিজেরও অসংখ্য মুরিদ ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ লিপিকর। তিনি নাকি ৩০০ জিল কোরান শরীফ নকল করেছেন। তন্মধ্যে দু'খানা রয়েছে ঢাকা ও লাহোর জাদুঘরে। দু'খানা রয়েছে দু'জন আত্মীয়ের কাছে। তাঁরা হচ্ছেন কুমিল্লা পুলিশ লাইন মসজিদের ইমাম মাওলানা ফখরুল ইসলাম ও মতলব থানার গোবিন্দপুর নিবাসী হাবিব উল্লা। মাজারে প্রতি বছর ওরস অনুষ্ঠিত হয়। জিকির করে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা চলে।

হযরত কা'রী মোহাম্মদ ইব্রাহিম (র.) : নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জের অধিবাসী। কলিকাতা মাদ্রাসার পাঠ সমাপ্তির পর কেরাত শিক্ষার জন্য তিনি মক্কা শরীফে চলে যান এবং বিখ্যাত ক্বারি হন। বিভিন্ন আরব মূলুক সফরান্তে ফেরার পথে হিন্দুস্থানের কামেল পীর হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। কামেল পীর হিসাবে তাঁর অনেক মুরিদ রয়েছে। তাঁর বিশেষ দান চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার উজানী গ্রামে নিজ বাড়িতে কেরাত শিক্ষার মাদ্রাসা স্থাপন। বর্তমানে উজানী গ্রামে একটি বড় জামেয়া মাদ্রাসা রয়েছে।

ত. যোগাযোগ ব্যবস্থা

অতীত যোগাযোগ

সুদূর অতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। বর্ষা মৌসুমে ৯৯ ভাগ যোগাযোগ রক্ষা করা কিংবা যাতায়াত করা হতো জল পথে। অগ্রহায়ণ মাস থেকে বৈশাখ এ ছয় মাস জল পথ তুলনামূলক কম ব্যবহৃত হতো। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে মালামাল আনা নেয়া করা হতো নৌকা, গয়না, পানসি ইত্যাদিতে করে। চাঁদপুর থেকে পেন্নাই সড়কের মাধ্যমে মতলব হয়ে নারায়ণপুর ও নায়েরগাঁও হয়ে ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়ক পর্যন্ত চলাচল করত মানুষ। তবে গ্রামের ভিতরে মানুষ চলাফেরা করত আবাদী-অনাবাদী জমির আল (ডেঙ্গা) দিয়ে। ব্রিটিশ আমলে এলাকার লোকজন স্টিমার ঘাটে গিয়ে সমবেত হতো এবং স্টিমারে ঢাকা-গোয়ালন্দ যাতায়াত করত। বরিশাল থেকে ২টি স্টিমার প্রতিদিন চাঁদপুর হয়ে ঢাকা যাতায়াত করত। এদের একটি হলো লোকাল স্টিমার এবং অপরটি মেইল/রকেট স্টিমার। গজরা থেকে একটি ডাক গয়না নাউরী বাজার, ছোটো হলদিয়া ও চরমাছুয়া হয়ে চাঁদপুর যাতায়াত করত। গজরা থেকে অপর একটি গয়না ষাটনল স্টিমার ঘাটে যাতায়াত করত। এ সময় মতলব বাজার ঘাট

www.pathagar.com

থেকে পথিক ও জয়দুর্গা লঞ্চ (কাঠবডি) চাঁদপুর যাতায়াত করত। স্বাধীনতার কিছু আগে ও পরে সুজাতপুর থেকে একটি লঞ্চ লুধুয়া, নবুর কান্দি ও গাজিপুর হয়ে চাঁদপুর আসা-যাওয়া করত আবার নায়েরগাঁও ও মাছুয়াখাল থেকে মতলব বাজার হয়ে ঢাকায় লঞ্চ আসা-যাওয়া করত। নৌকায় নদী পার পারের সময় মানত করেছে অনেক মাঝি মাল্লারা। প্রায় সময়ই নৌকা ডুবে প্রাণহানি ঘটেছে লোকজনের। নদী পাড়ি দেওয়ার সময় বলত, "আল্লাহ আল্লাহ বলোরে মমিন- আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" মতলব বাজারের দিন বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত নৌকা বাজার ঘাটে বাঁধা থাকতো। এদের মধ্যে ডোঙ্গা, কোষা ও ছৈওয়ালা গয়না ছিল। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকা আউশ ধান নৌকায় করে আনা হত বাড়িতে। ছাত্রছাত্রীরা নৌকায় করে স্কুলে আসা-যাওয়া করত, এটা অল্পদিনের কথা, বেড়ি বাঁধ নির্মাণের পূর্বেও এ অবস্থা ছিল। এলাকায় যতগুলো লঞ্চ ঘাট ছিল বিভিন্ন গ্রামের মানুষ নৌকায় করে সেখানে যেত এবং লঞ্চে গন্তব্য স্থানে পৌছত। বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যেতে ভরসা একমাত্র নৌকাই ছিল।

চাঁদপুর জেলার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের চাঁদপুর-লাকসাম অংশটি নির্মাণ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। চাঁদপুর জেলার অধিকাংশ লোক তখন থেকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে রেলওয়েকে ব্যবহার করতে শুরু করে। এক সময় কলকাতা আসামের মধ্যে চাঁদপুর-গোয়ালন্দ হয়ে মেইল ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আসামের ডিব্রু গড় থেকে চাঁদপুর এবং চাঁদপুর থেকে স্টিমা¯রযোগে গোয়ালনন্দ হয়ে কোলকাতা।

সড়ক যোগাযোগ

১৩৪০ সালে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ মেঘনার পূর্ব পাড় চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন। লোকে এখনো পথটিকে 'হকরুদ্দীনের হথ' বলে। তারপরে থেকেই চাঁদপুর জেলার সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের সড়ক পথসমূহ নির্মিত হতে থাকে। বর্তমানে চাঁদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পল্লি যোগাযোগ জালে আবৃত গাড়ি নিয়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া যায়। জেলা সদর ও উপজেলা সদর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর, রাজশাহী, সিলেটসহ প্রতিটি জেলায় যাওয়া যায়।

নদীপথে যাতায়াত

চাঁদপুর বন্দর বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন চাঁদপুর জেলায় ২৩ টি, কুমিল্লা জেলায় ০৯ টি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ১১ টি, শরীয়তপুর জেলায় ০৮ টি, মাদারীপুর জেলায় ০১ টি ও লক্ষীপুর জেলায় ২টি, অর্থাৎ ০৬ টি জেলায় মোট ৫৪ টি ঘাট/পয়েন্ট রয়েছে এবং ০৩ টি ফেরীঘাট রয়েছে (লক্ষীপুর জেলার মজু চৌধুরী হাট ফেরীঘাট, হরিণা ফেরীঘাট ও আলু বাজার ফেরীঘাট)। চাঁদপুর নদীবন্দর এলাকায় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী দ্বারা সরাসরি শুল্ক আদায় করা হয়। বন্দর বিভাগের যাবতীয় কার্যাবলী ০১ জন উপ-পরিচালকের অধীনে সম্পাদন করা হচ্ছে। চাঁদপুর নদী বন্দরের কার্যক্রম নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

ক) টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ/ঘাট/পয়েন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ ও উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান; খ) চাঁদপুর নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন নৌ-পথে নদী খনন/বালি উত্তোলনের অনুমতি/অনাপত্তি প্রদান; গ) নদী বন্দর সীমানায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ; ঘ) নদী বন্দর সীমানা/ফোরশোর ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে ল্যান্ডিং এন্ড শিপিং চার্জ আদায় প্রদান।

চাঁদপুর নদী বন্দরে বন্দর বিভাগ ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ নিয়ন্ত্রণাধীন আরও ০৪ টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে- (ক) নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, (খ) নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ, (গ) প্রকৌশল বিভাগ, (ঘ) হিসাব বিভাগ।

চাঁদপুর হয়ে দক্ষিণাঞ্চলগামী নৌ-পথের ইতিবৃত্ত

চাঁদপুর জেলার আওতাধীনঃ ২০৩ কিঃ মিঃ নৌপথ রয়েছে, যা দিয়ে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহন করা হয়। চাঁদপুর নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ চাঁদপুর জেলার ২০৩ কিঃ মিঃ সহ মোট ৬৭৫ কিঃ মিঃ নৌপথের নিয়ন্ত্রণ ও নাব্যতা রক্ষা করে থাকে। চাঁদপুর নদী বন্দর হতে বিভিন্ন নৌ-পথে যাত্রীবাহী একতলা, দ্বিতলা ও ত্রিতলা লঞ্চ এবং বিআইডব্লিউটিসি'র ষ্টীমার চলাচল করে থাকে। তাছাড়া পণ্যবাহী কার্গো, বাল্কহেড, ওয়েল ট্যাংকার এবং ছোটো-বড় সকল ধরনের নৌ-যান চলাচল করে। চাঁদপুর লঞ্চ টার্মিনালে বৎসরে আনুমানিক ১৬,৪৬,৩৩১ জন (২০১০-২০১১) যাত্রী আগমন/নির্গমণ করে থাকে। চাঁদপুর বন্দর সীমানায় মালামাল বছরে উঠানামার পরিমাণ ২,৫০,০০০ মেঃ টন (প্রায়)। চাঁদপুর নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ওয়েসাইড লঞ্চঘাট/পয়েন্ট দিয়ে আগমন/নির্গমনকারী যাত্রী সাধারণের সংখ্যা প্রায় ৭২,৮৮,১১৬ জন। চাঁদপুর নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ওয়েসাইড লঞ্চঘাট/পয়েন্ট দিয়ে মালামাল উঠানামার পরিমাণ বছরে মোট ৫,২০,১২১ মেঃ টন (প্রায়।)

চাঁদপুর-ঢাকা রুটে একসময় ঐতিহ্যবাহী 'বেঙ্গল ওয়াটার' নামে লঞ্চ সার্ভিস ছিল যা এখন আর নেই। তবে এখন বেশ ক'টি উন্নতমানের লঞ্চ প্রতিদিন ঢাকা-চাঁদপুর রুটে চলাচল করছে। এগুলির মধ্যে আব-এ-জমজম, রফরফ, ময়ূর-১, ময়ূর-৭, আল বোরাক, মেঘনা রানী, ইমাম হাসান ইত্যাদি লঞ্চ সার্ভিসের নাম উল্লেখযোগ্য।

চাঁদপুর নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রাধীন হরিণা-আলুবাজার ফেরী রুটটি সাবেক পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০১ সালে চালু হয়। ফেরীঘাটটি চালু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম-সিলেট অঞ্চলের সাথে মংলা বন্দরসহ খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের সহজ যোগাযোগ স্থাপন করা। রুটটি চালু থাকলে সড়কপথে চট্টগ্রাম থেকে মংলা যাতায়াতে ১২৮ কিঃমিঃ পথ কম হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন ঢাকা না গিয়েই চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারেন। ফলে যাত্রীদের ৮/১০ ঘন্টা সময় বেঁচে যায়। এ জন্য বিআইডব্লিউটিএ প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় করে হরিণায় ৬.৫০ একর এবং আলুবাজারে ৫.০০ একর জমির উপর ২৮টি সেমি পাকা স্থাপনাদি, বিশ্রামগার ও ৬ টি টয়লেট কমপ্লেক্স এবং বিশাল পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী পন্টুন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সংকটের কারণে ফেরী ও নৌ-চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। হরিণা-আলুবাজার ফেরী রুটে অসংখ্য

www.pathagar.com

ডুবোচর রয়েছে। পরিকল্পিত ড্রেজিং-এর মাধ্যমে সারা বছর নৌ-পথ সচল রাখা হলে ঘাটের গুরুত্ব ও যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। হরিণা ফেরীঘাট দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০টি যানবাহন আসা যাওয়া করে। উজানের পানির চাপ/স্রোত না থাকায় বর্ষার শেষ দিকে নদীতে পলি পড়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং মূল স্রোতধারা কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে নৌ-পথ সংকুচিত হয়ে আসছে। নাব্য নৌ-পথে জলযান চলাচল করার জন্য যে সকল নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয় সেগুলি জলদস্যু/দুস্কৃতিকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং চুরি করে নিয়ে যায়। নৌ-চলাচলের সহায়ক যন্ত্রপাতি যাতে জলদস্যু/দুস্কৃতিকারীরা চুরি/নষ্ট না করতে পারে এবং নৌ-পথে চলাচলরত জলযান পণ্য ও যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তার জন্য চাঁদপুরে কোষ্টগার্ডের একটি ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

চাঁদপুর বন্দর হয়ে চলাচলকারী বিআইডব্লিউটিসি-এর জলযানসমূহ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ বলে সাবেক IGRSN, BDRS, BGS, বঙ্গ ভে, পাক ভে, সোহাগপুর, সী-টাগ ইত্যাদি ছোটো বড় ১৪ টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিআইডব্লিউটিসি জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ছোটো বড় মোট পাঁচ শতাধিক জলযান নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে জাহাজের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের জাহাজ বহরের মধ্যে ছিল- যাত্রীবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, তৈলবাহী জাহাজ, উদ্ধারকারী টাগ বহর ও ফেরী বহর। অধিকাংশ জলযান এ চাঁদপুর বন্দর ঘাট হয়েই চলাচল করে। BIWTC-এর যাত্রীবাহী রকেট সার্ভিস হিসেবে খ্যাত। যাত্রীবাহী জাহাজের মধ্যে পিএস গাজী, পিএস কিউই, পিএস মোমেন্ট, পিএস সহিদ বেলায়েত, পিএস অষ্ট্রিচ, পিএস মাসুদ, পিএস লেপচা, পিএস টার্ন, এমভি সোনারগাঁও, এমভি সেলা অন্যতম। বর্তমানে পিএস অষ্ট্রিচ, পিএস মাসুদ, পিএস লেপচা, পিএস টার্ন, এমভি সোনারগাঁও এবং এমভি সেলা নামে জাহাজগুলো ঢাকা-চাঁদপুর-খুলনা রুটে চলাচল করছে। ঢাকা-খুলনা রকেট সার্ভিস ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল-নলসিটি-ঝালকাঠি-হুলারহাট-কাউখালী-চরখালী-সন্নাসী-বড়মাছুয়া-মোড়লগঞ্জ-মংলা-খুলনা পর্যন্ত যাতায়াত করে। গোয়ালন্দ-চাঁদপুর সার্ভিস বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

দারাশাহ ও রামেশ্বরী দেবী

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীতে এক আরবিয় বংশোদ্ভূত সৈনিক ছিল। তার নাম শেখ দারা। আপন সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের কারণে অল্পসময়ের মধ্যেই সে সেনাবিভাগের বড় বড় সেনাপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁর বীরত্বের খবর বাদশাহ আরওঙ্গজেব শুনতে পেলেন, তিনি তাকে একটি চৌকস সেনাদলের সেনাপতি করে সুবে বাঙ্গলায় প্রেরণ করলেন। তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যরা বিরোধিতা শুরু করে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। শেখ দারা শক্তি সঞ্চয়ের মানসে কিছুদিনের জন্য কচুয়া উপজেলার তুলপাই অঞ্চলে আত্মগোপন করলেন। শেখ দারার দেহ সৌষ্ঠব ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। তিনি ভাল তীরন্দাজ, অসিচালক ও ঘোড়সওয়ার ছিলেন। মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কাশিমপুরের পাটন রাজার দিঘির পাড়ের বিশ্রামাগারে আসতেন, দিঘিতে মাছ ধরতেন। এসময় বারদুয়ারীর নাগরাজা রামরায় নাগের পুত্র রামেশ্বর নাগের কন্যা রামেশ্বরী দেবীও ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্য পাটন রাজার দিঘিতে আসতেন। রামেশ্বরী দেবী ছিলেন বাল্য বিধবা। মাত্র আট বছর বয়সে কিছু বোঝার আগেই স্বামীকে হারান। রামেশ্বরী দেবী ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনই বিদূষী। পাট রাজার দিঘির পাড়েই দারাশাহের সাথে তার পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। সুন্দরী রামেশ্বরী শেখ দারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তিনি শেখ দারাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এক সময় শেখ দারা তাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করার জন্য রাজা রামেশ্বর নাগের কাছে প্রস্তাব করেন। রাজা প্রস্তাব শুনে ক্রোধান্বিত হন। রামেশ্বর রাজার সাথে দারাশাহের যুদ্ধ লেগে যায়। ঘোরতর যুদ্ধে নাগরাজা হেরে যান। কথিত আছ শেখ দারা শাহ রাজশ্বেরী দেবীকে নিয়ে এক লাফে বোয়ালজুড়ি খাল অতিক্রম করে তুলপাই চলে আসেন। রামেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। রামেশ্বরী দেবীর নতুন নাম হয় শেখ রামেশ্বরী দেবী। নাগ রাজা পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজত্বের অর্ধেক ও একটি ত্রিতল প্রাসাদ নির্মাণ করে শেখ দারা ও রামেশ্বরী দেবীকে দান করেন। তুলপাই গ্রামের নাম হয় 'দারাশাহী তুলপাই'। দারাশাহী তুলপাই গ্রামে এখনও শেখ দারা শাহের মাজার ও রামেশ্বরী দেবীর ভগ্ন ত্রিতল প্রাসাদ রয়েছে। প্রেমিক যুগলের বংশধররা এখনো রয়েছেন।

কিচ্ছা বলা

রাতে খাওয়ার পর এ অঞ্চলে কিচ্ছা বলার আসর বসত। প্রত্যেক পাড়ায় কিচ্ছা বলার বর্ষীয়ান বুড়ো-বুড়ি ছিল। তাদের ঘিরে বসত কিচ্ছার আসর। কিচ্ছা বলার ফাঁকে ফাঁকে চলত পান-তামাকের সৎকার। আজো গ্রাম্য শ্রমিকেরা কর্মরত অবস্থায় কিচ্ছা বলে ও শোনে। কিচ্ছা শোনার জনপ্রিয়তা চাঁদপুরের গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

এক

ছলিমুদ্দিন ও কলিমুদ্দিন নামে এক বৃদ্ধের দুই পুত্র সন্তান ছিল। দু'ভায়ের মধ্যে ছিল বেশ মোহাব্বত। শ্রদ্ধা স্নেহের কোনো ঘাটতি ছিল না। একদিন বৃদ্ধ মারা গেলেন। দু'ভাই শান্তিতে বসবাস করছেন। একসময় বড়ো ভাই ছোটো ভাইকে বললেন, ভাই শোন, আমার সংসারে লোকজন বেশি। তোর লোকজন নেই। যদি আমরা পৃথক হয়ে যাই তোর খুব লাভ হবে। ছোটো ভাই জবাব দেয়, ভাই আপনি যা ভাল মনে করেন। বড়ো ভাই বুঝতে পারলেন ছোটো ভাই পৃথক হতে রাজী। বড়ো ভাই ঘরে যা ছিল পৈত্রিক সবকিছু একে একে সমান ভাগ করে দিয়ে দিলেন। ছোটো ভাই খুব খুশি হল। পৃথকভাবে চলতে থাকলেন দু'জন। কারো সাথে কারো বৈরিতা নাই। শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক হওয়ার ঘটনা চলে গেল গ্রামের দরবারীদের (মাতব্বরদের) কানে। গোসা করলেন তারা। মাতব্বর মশায়রা বললেন, আমাদের সাথে যোগ-জিজ্ঞাসা না করে, আলাপ-আলোচনা না করে দান-দক্ষিণা না দিয়ে, না খাওয়ায়ে পৃথক হয়ে যাবে এটা কী করে হয়? তাহলে আমাদের মূল্য থাকলো কোথায়? এভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সবাই পৃথক হয়ে গেলে আমাদেরতো কোনো দাম থাকবে না। এমনটা হতে দেওয়া যায় না। এক দরবারি ছলিমুদ্দিনের বাড়ির পাশ দিয়ে যায় আর ছলিমুদ্দিনকে ডাকে- ছলিমুদ্দিন, ছলিমুদ্দিন বাড়ি আছো? ছলিমুদ্দিন জবাব দেয়, কাকা আমাকে কেন খোঁজছেন? মাতব্বর সাহেব বললেন, বাজান ভালই আছ? শোনলাম তোমরা নাকি বিনো (পৃথক) হয়ে গেছ। শোনে খুব খুশি হলাম। ভালই করছো বাবা কাউকে ডাকো নাই। নিজেরা নিজেরা বিনো হয়ে গেছ এটা ভাল করেছ। কাউকে ডাকলে কেউ বলতো এইটা, আরেকজনে বলতো সেইটা। বাবা এখনতো আসা হয় না। তোমার বাবা থাকতে আসতাম, যাইতাম, খাইতাম-খাওয়াইতাম। যাক বাবা শোন, তোমার বাবার কাছে শোনেছি তোমাদের নাকি একটি দেউড়া (কপি রাখার ষ্ট্যান্ড) আছে? এই দেউড়াটাই নাকি তোমাদের সংসারের উন্নতির কারণ? তো দেউড়াটা কে নিছে? ছলিমুদ্দিন বলছে, কাকা এটা আমার কাছেই রয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটা রেখে দিও। পথে দেখা হলো ছোটো ভাই কলিমুদ্দিনের সাথে। মাতব্বর সাহেব জিজ্ঞেস করেন কলিমুদ্দিনকে, কেমন আছো ভাতিজা? শোনলাম তোমরা নাকি বিনো হয়ে গেছ। ভালই হয়েছে, শালিস ডাকনি। নইলে এক একজনে একেকটা পরামর্শ দিত। ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতো। তো বাবা তোমার বাবার কাছে শুনেছি, তোমার একটা দেউড়া ছিল। এইটাই নাকি তোমাদের লক্ষী (দেউড়াটা ছিল ঘুনে ধরা অকেজো)। এটা নিয়েছে কে? কলিমুদ্দিন বলে কাকা ওইটাতো আমাকে দেয় নাই। মাতব্বর সাহেব বলরেন, দূর, দূর শুয়োর! ওইটা তোমার দরকার আছে না? যাক তুমি বড় ভায়ের কাছে ওইটা চাও। যদি না দেয় তুমি লোকজন ডাকো। আমরা বলবো দেউড়াটা ছোটো ভাই পায়। পরদিন ছোটো ভাই কলিমুদ্দিন বড়ভায়ের বিরুদ্ধে গ্রামের মাতব্বরদের কাছে নালিশ করে এবং দরবারের আয়োজন করে। অপর এক দরবারি ছলিমুদ্দিনকে বলে, তোমরা না শান্তিপূর্ণভাবে বিনো হয়ে গেলা। তোমার ছোটো ভাই আবার তোমাদের বিরুদ্ধে দরবার ডাকলো কেন? ছলিমুদ্দিন জবাব দেয়, কাকা আমি নাকি দেউড়াটা আমার ভাইকে দেইনি এই জন্য। তো দেউড়াটা তো ছোটো ভাই হিসাবে কলিমুদ্দিন পায়। যাক দরবারে আমরা বলবো,

www.pathagar.com

দেউড়াটাতো ছোটো ভাই পায়, দেও না দেও সেটা তোমার ব্যাপার। পরদিন দরবার। ছলিমুদ্দিন, কলিমুদ্দিন, দুজনের বাড়িতেই বিশাল খাবারের আয়োজন। দরবার চলছে। দরবারি বিভিন্ন কথা, উদাহরণ, উপমা দিয়ে চলে আসে আসল কথায়। ছোটো ভাইকে জিজ্ঞেস করে বলে, কলিমদ্দিন তুমি কেন দরবার ডেকেছো? কলিমুদ্দিনের উত্তর, আমার বড়ভাই আমাকে দেউড়ার ভাগ দেয়নি এজন্য। এক ফাঁকে অপর এক মাতব্বর ছলিমুদ্দিনের কানে কানে বলে শোন শেষ পর্যন্ত দেউড়াটা দিতেই হয় তবে কলিমুদ্দিনে হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ্মী কারো হাতে তুলে দিতে নেই। আছাড় মেরে ফেলে দিবে। ছলিমুদ্দিন দরবারের রায় মেনে নিয়ে দেউড়াটা ছোটো ভাইকে দেওয়ার সময় ঘৃণায়, রাগে, ক্ষোভে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে দেউড়াটা ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে যায়। দরবারিরা বলে উঠে ভালই হয়েছে- দেউড়া দু'ভাগ হয়ে দু'ভায়ের ঘরের দিকে চলে গেছে। লক্ষ্মী দু'ঘরেই চলে গেছে।

খ. লোকপুরাণ

বেহুলা লখিন্দর

এ এলাকায় বিস্তরভাবে বিশেষ করে বর্ষাকালে বেহুলা লক্ষীন্দর ও বেহুলা সুন্দরীর পুঁথি ছিল মুখে মুখে। বিভিন্ন স্থানে আসর বসিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবেও গাওয়া হতো তা। বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনি শুরু হলে সাত রাত লাগতো শেষ করতে।

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় রয়েছে ধনাগোদা নদী। এ নদীর এক বিশাল ইতিহাস ও চমকপ্রদ জনপ্রিয় লোককাহিনি রয়েছে। এ নদীর উপর দিয়ে যখন বেহুলা সুন্দরী যাচ্ছিল, বেহুলাকে দেখে সহোদয় ভাই-মনাগোদা ও ধনাগোদার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বেহুলা বাঁচার জন্য প্রস্তাব দেয়, দু'ভাই মারামারি করে যে জিতবে সে বেহুলাকে পেতে পারে। দু'ভাই মারামারি করে; মনাগোদা মরে যায় এবং ধনাগোদার নামানুসারে এ নদীর নাম হয় ধনাগোদা। এ নদীরই পূর্ব দিকে আশ্বিনপুর গ্রাম। একে আশ্বিনী নগর কিংবা উজানী নগরও বলা হয়। কোনো এক সময় এটাকে চম্পক নগরও বলা হতো। অত্র এলাকার জনগণের বদ্ধমূল ধারণা, এই স্থানেই কিংবদন্তির নিয়ামক বেহুলা লখিন্দর কাহিনির উৎপত্তি। এখনো এখানে বেহুলার পাটা-পুতা এবং মনসা মুড়া রয়েছে বলে দেখার জন্য উৎসুক জনতার ভিড় জমে।

বেহুলা লখিন্দর একটি পৌরাণিক কাহিনি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক কবি এই কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। পদ্মাবতী দেবী ও চাঁদ সওদাগরকে নিয়ে মনসা মঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনি রচিত। পদ্মাবতী মনসা, বিষহরি ও গৌরী নামে পরিচিত। পদ্মাবতীর পিতা শিব এবং সৎ মাতার নাম চন্ডি। প্রায়ই মনসা চণ্ডীর সাথে ঝগড়া করত। একদিন চণ্ডী আঘাত করে মনসার এক চোখ নষ্ট করে দেয়। পদ্মা রাগান্বিত হয় এবং সর্পরূপা ধারণ করে সৎ মাকে দংশন করে। পিতা শিবের অনুরোধে পদ্মা চণ্ডীকে জীবিত করে। তবে মা ও মেয়ের ঝগড়া থামে না। শিব পদ্মাবতীকে মুনির সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের রাতে মুনি পদ্মাকে গঙ্গার তীর হতে পানি আনতে নির্দেশ দিলে পদ্মা সর্পরূপা ধারণ করে মুনিকে

www.pathagar.com

দংশন করে। পিতার আদেশে পদ্মা স্বামীর প্রাণ বাঁচায়। স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিলেও তাকে গ্রহণ করেনি। বরং অভিশাপ দিয়ে বলে পদ্মা অষ্টনাগ পুত্রের জন্ম দিবে। মনসা-চন্ডীর ঝগড়া মেটাতে না পেরে শিব কন্যা পদ্মাকে নির্বাসনে পাঠায়। মনসাকে বিদায়ের সময় শিবের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে জল থেকে জন্ম হয় কন্যা নেতার। পদ্মা অষ্টনাগপুত্র ও বোন নেতাকে নিয়ে চলে যায় বনবাসে। বসবাস করে চম্পক নগরে। সেখানে অর্জন করে অনেক দৈব শক্তি। পদ্মার বাসনা দুনিয়ার সব মানুষ তাকে পূজা করুক। রাজা কুটিশ্বরের পুত্র চাঁদ সওদাগর। অপর নাম চন্দ্রধর বণিক। শিবের উপাসনা কিংবা মনসা পূজার ঘোর বিরোধী ছিল সে।

বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পদ্মাবতীর বিবাহের অনুষ্ঠান হল। শিব ও পার্বতী বহু মূল্যবান যৌতুক কন্যা-জামাতাকে প্রদান করলেন। পদ্মাবতীর বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন অনেক রাজা, সওদাগর ও মুনি ঋষি। চম্পক-নগরের রাজা চন্দ্রধরও উপস্থিত ছিলেন। সহসা পদ্মাবতীর মনে অদ্ভূত এক খেয়াল জেগে উঠল। তিনি চন্দ্রধরকে তাঁর সেবকরূপে পেতে চাইলেন। পদ্মাবতী বললেন, পিতা, চন্দ্রধরকে আমায় যৌতুকরূপে প্রদান করুন। সে হউক আমার ভক্ত-আমার সেবক। সেই থেকে চন্দ্রধর হলেন পদ্মা-বিদ্বেষী! এই চন্দ্রধরে অদ্ভূত জন্মবৃত্তান্ত আছে। পদ্মশঙ্খ নামে ছিলেন এক মুনি। মুনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও তেজস্বী। একদিন ঝড়ে তাঁর আশ্রমের কাছে একটি প্রকাণ্ড গাছ ভেঙ্গে পড়ল। সেই গাছের কোটরে ছিল দুটি পাখির ডিম। ডিম দু'টি মাটিতে পড়ে গেল, অথচ ভাগ্যক্রমে সেগুলি ভাংগল না। পরদিন পদ্মশঙ্খ মুনি ডিম দু'টি দেখতে পেয়ে আশ্রমে এনে সযত্নে রেখে দিলেন। কিছুদিন পরে ডিম ফুটে বের হল দুটি সুন্দর পাখির শাবক। মুনি শাবক দু'টিকে সযত্নে লালন পালন করতে লাগলেন। ক্রমে সেই পাখি দু'টির বংশ বৃদ্ধি হল। পাখির কলরবে আশ্রমটি সর্বদা মুখরিত হয়ে থাকত। মুনির মন ছিল বড়ই কোমল। তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত মমতা উজাড় করে পুত্রস্নেহে পাখিদের পালন করতে লাগলেন। তাদের না দেখলে মুনি চোখে যেন অন্ধকার দেখতেন। একদিন মুনি গিয়েছিলেন বাইরে, সে রাত্রে আর আশ্রমে ফিরতে পারলেন না। সেই সুযোগে একদল সাপ এসে সমস্ত পাখিগুলো খেয়ে ফেলল। মুনি ফিরে এসে ব্যাপার দেখে ভয়ানক দুঃখিত হলেন। মায়াবলে জানতে পারলেন, সাপেরা তাঁর বাচ্চাগুলিকে খেয়েছে। তিনি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন এবং সেই দুঃখেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মৃত্যুর আগে বলে গেলেন- এ জন্মে এর কোনো প্রতিকার করতে পারলাম না, পরজন্মে যেন নাগহন্তা হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। সমস্ত সর্পকূল যেন হয় আমার শত্রু। সেই মুনিই পরজন্মে কোটিশ্বর বণিকের ঘরে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম ছিল চন্দ্রধর বা চাঁদ সওদাগর। একদিন পদ্মাবতী শিবের কাছে গিয়ে বললেন- পিতা, আমি পৃথিবীতে গিয়ে আমার মহিমা প্রচার করবার বাসনা করছি, আমাকে অনুমতি দাও। শিব বলেন– তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, কিন্তু চম্পকনগরে যেয় না, কারণ নাগবিদ্বেষী চন্দ্রধর সেখানে আছে, সুযোগ পেলেই সে তোমাকে বিনাশ করবে। এই বলে শিব নেতাকে ডাকলেন। নেতাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি পদ্মাকে নিয়ে পৃথিবীতে যাও, পদ্মা যেরূপ নির্দেশ দেবে সেই অনুসারে চলবে। তবে প্রয়োজন মতো পদ্মাকে পরামর্শও দেবে। শিবের কাছে বিদায় নিয়ে নেতা ও পদ্মাবতী মর্ত্যধামে যাত্রা করলেন।

www.pathagar.com

চাঁদ সওদাগর সে মনসাকে 'কানি' বলে ঘৃণা করত। এক অনুষ্ঠানে চন্দ্রধর মনসাকে সম্মান দেখায়নি বলে পরাজয়ের গ্লানিতে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠে পদ্মা। সে ভাবল যেমন করেই হোক চাঁদ বংশকে ধ্বংস করতেই হবে। সে চাঁদ বংশকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং ঘর বাড়ি নষ্ট করে ফেলে। এতেও চাঁদ বশ্যতা স্বীকার করেনি। সে বরং চম্পক নগরে পদ্মার পূজা বন্ধ করে দেয়। এ সময় চাঁদের সাথে সনকা'র বিয়ে হয়। সনকা পদ্মাকে রীতিমত পূজা দেয়।

মনসার পূজা করে জালু মালুর বহু ধনসম্পত্তি লাভ হল। এই সংবাদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে যায় চন্দ্রধরের স্ত্রী সনিকার কানে। তিনি নিজের চোখে জালু মালুর ঐশ্বর্য দেখার জন্য দোলায় চড়ে একদিন উপস্থিত হলেন তাদের বাড়িতে। জালু মালুর ঐশ্বর্য দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, মা মনসার বরেই তাদের এরূপ ঐশ্বর্য হয়েছে। তখন সনিকাও মনসাকে পূজা করার বাসনা করলেন। সেজন্য ঘট চাইলেন জালু মালুর কাছে। কিন্তু জালু মালু কি এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘট দিতে চায়? তারা বলে, রানীমা, আর যা চাও সবই দিতে রাজী, কিন্তু ঘট দিতে পারব না। সনিকা বললেন, আমি চিরকাল তোমাদের বশ হয়ে থাকব। অন্ততঃ একটি ঘট আমাকে দাও। আমার ভয়ানক সাধ হয়েছে দেবী মনসাকে পূজা করবার। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর জালু মালু একটি ঘট সনিকা রানীকে দান করল। সনিকা আনন্দ চিত্তে ঘট নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এবার মনের মত করে একটি মণ্ডপ তৈরি করলেন সনিকা রানী। একটি সিংহাসন স্থাপন করে তার উপর ঘট বসালেন। এরপর ভক্তিসহকারে আরম্ভ করলেন পূজার। সনিকার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে পদ্মাবতী প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিলেন। রানী সনিকা মনসার পূজা করছেন এ খবর একদিন চন্দ্রধর জানতে পারলেন। তখন হেমতালের লাঠি নিয়ে ছুটে গেলেন অন্দর মহলে। গিয়ে দেখলেন সোনার সিংহাসনের উপর পাতা আছে পদ্মাবতীর আসন। সনিকা ভক্তি সহকারে পূজা করছেন, আসনের উপর বসে আছেন পদ্মাবতী। তা দেখে চন্দ্রধরের ভয়ানক রাগ হল। তিনি সনিকাকে বললেন- ছিঃ ছিঃ তোমার একি ব্যবহার? তুমি আমার পরম শত্রু কানী মনসাকে পূজা করছ? এতে সারা পৃথিবীতে আমার কুযশ রটনা হবে। সত্বর তুমি এই পূজা ত্যাগ কর। সনিকা চন্দ্রধরকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চন্দ্রধর হেমতালের লাঠি নিয়ে পদ্মাবতীকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। পদ্মাবতী প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। সনিকা পূজার জন্য যেসব আয়োজন করেছিলেন, চন্দ্রধর তা নষ্ট করে পূজার ঘটটিও ভেঙ্গে ফেললেন।

চাঁদ রাগান্বিত হয়ে পদ্মার ঘট ভেঙ্গে দেয়। পদ্মা সর্পকূলকে ডেকে বলে, তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন যে, এক রাতে দংশন করে চাঁদ বংশ ধ্বংস করে দিতে পারো? পাণ্ডুনাগ অবনত মস্তকে এগিয়ে এসে বলে, মা, আদেশ করলে এই মুহূর্তেই আমি চাঁদ বংশ ধ্বংস করে দিয়ে আসতে পারি। পদ্মার অনুমতি পেয়ে পাণ্ডুনাগ ফণাতুলে চম্পক নগরের দিকে যাত্রা করে এবং রাতের শেষ প্রহরে চাঁদের ছয় পুত্র শ্রীকর, শ্রীধর, গুণাকর, মধুকর, সৃষ্টিধর এবং দুর্গাবরকে দংশন করে ফিরে আসে। চাঁদের ছয় মৃত পুত্রের বধুগণের আহাজারিতে চম্পক নগরের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। পুত্রশোকে সনিকা পাথর হয়ে যায়। চাঁদ অবিচল। সে শঙ্খপুরী থেকে ওঝা ধন্বন্তরীকে

www.pathagar.com

ডেকে পাঠালে ওঝা ঔষধির গুণে চন্দ্রধরের মৃত ছয় পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলে। এদিকে পদ্মার প্রতিশোধের আগুন শতগুণ জ্বলে উঠে। বারবার সে চন্দ্রের কাছে পরাজয় বরণ করে। পদ্মা ভাবে যতদিন ওঝা ধন্বন্তরী বেঁচে থাকবে ততদিন তার কোনো কাজই সফল হবে না। পদ্মা গোয়ালিনী বেশে মাথায় পসরা সাজিয়ে ওঝা ধন্বন্তরীর গৃহে গিয়ে কালকূট মাখানো বিষ খাইয়ে ধন্বন্তরীর একশত বিশ জন শিষ্যকে হত্যা করে। পদ্মার এই অপকর্ম ওঝা ধন্বন্তরীর কাছে ধরা পড়ে। ধন্বন্তরী ঔষধের গুণে তার শিষ্যদের বাঁচিয়ে তুলে। ভিন্ন পথে এগুলো পদ্মা। সে কৌশলে ধন্বন্তরীর স্ত্রী কমলার সাথে সখিত্ব স্থাপন করল। প্রসঙ্গক্রমে কমলা বলল, তার স্বামী অমর। একমাত্র শিবের জটাস্থিত উদয়কাল নাগ যদি দংশন করে তবে তার মৃত্যু হবে। কথা শুনে পদ্মা উল্লসিত হয়। আপন মনের কথা শিবকে জানায়। শিব বলল, এ কি করে সম্ভব? ওঝা ধন্বন্তরীর মৃত্যু হলে নরলোকে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পদ্মা নাছোড় হয়ে পিতা শিবকে বলে, পিতা মর্ত্যলোকে আমার পূজা প্রতিষ্ঠিত হলে ধন্বন্তরীকে আবার বাঁচিয়ে তুলবো। এই প্রতিশ্রুতিতে শিব উদয়নাগকে পদ্মার হাতে তুলে দেয়। পথিমধ্যে এসে উদয় নাগ বলে–

"শুন বিষহরি বহু যত্নে ঔষধ লাগায়েছে ধন্বন্তরী
গন্ধে রহিতে নারি যোজনের পথে,
কেমনে যাইব বল ওঝার পুরীতে?

পদ্মা গাভীরূপ ধারণ করে বেড়া ভেঙ্গে ধন্বন্তরীর ঔষধির বাগানে ঢুকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঔষধি গাছ খেয়ে সাবাড় করে। গাভী তাড়িয়ে দেয় ধন্বন্তরী। এই সুযোগে ভ্রমররূপ ধারণ করে উদয় নাগ দংশন করে ওঝা ধন্বন্তরীকে। ধন্বন্তরী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ধন্বন্তরী বিহীন চাঁদ দুর্বল হয়ে গেল। কালী, ধামনা, কাছিমা, কংশতাল, কেউটিয়া এবং ভ্রমজাল নামক ছয়টি বিষধর সাপকে পদ্মা আরো বিষদান করে চম্পকের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল। চাঁদপুত্র শ্রীকর ফুলের গন্ধ নিতে গেলে ভ্রমররূপে ধামনা তাকে দংশন করে পালিয়ে যায়। অশ্বারোহনে ভ্রমণরত শ্রীধরকে দংশন করে কাছিমা নাগ। বনে শিকাররত অবস্থায় গুণাকরকে দংশন করে কালীনাগ। বাজপাখি রূপ ধারণ করে কংশতাল দংশন করে মধুকরকে। নদীতে স্নানরত অবস্থায় সৃষ্টিধরকে দংশন করে জলচর কেউটিয়া এবং কনিষ্টপুত্র দুর্গাকে ক্রীড়ারত অবস্থায় দংশন করে ভ্রমজাল। সনিকা স্বামী চাঁদের পায়ের ধরে বলে, ওগো তুমি পদ্মার পূজা দাও। অবিচল চাঁদ তার আপন প্রতিজ্ঞায় অনড়।

চাঁদ চিৎকার করে বলে ওঠে–

যে হাতে পূজেছি আমি শংকর ভবানী
সে হাতে কেমনে পূজিব বেজ্ঞাকী কানি?

সনিকাকে বললো চাঁদ, আমার পক্ষে পদ্মার পূজা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পদ্মাকে ভক্তি নয়, ঘৃণা করি। সনিকাকে প্রবোধ দিয়ে বলে, সংসারে যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু একদিন আছেই। যার যখন যেভাবে মরণ, তা হবেই। কিছুদিন পর চাঁদ চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে যাত্রার আয়োজন করে।

www.pathagar.com

বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন হল। পঞ্জিকা দেখে শুভ দিন শুভ লগ্ন স্থির করা হল। যাত্রার পূর্বদিনে চন্দ্রধর চণ্ডিকা পূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আজ্ঞামাত্র ভাণ্ডারী তার আয়োজন করল। নারীদের সুমঙ্গল গানে এবং বাদ্য কোলাহলে সারা নগরী মুখরিত হয়ে উঠল। বিশেষ জাঁকজমক সহকারে এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই সমাপ্ত হল চণ্ডিকার পূজা। সকল দেবতাদের পূজাও চন্দ্রধর সেই সঙ্গে করলেন।

এমন সময় দেখা দিলেন পদ্মাবতী। তিনি চন্দ্রধরকে বললেন– ওহে তুমি সকল দেবতার পূজা করলে, কিন্তু আমার পূজা করতে তোমার কেন এত আপত্তি? তুমি আমার পূজা কর, তোমার মঙ্গল হবে। তোমায় ছয়পুত্রকে আমি বাঁচিয়ে দিব। আমার আশীর্বাদে তুমি বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করবে।

কিন্তু চন্দ্রধরের তাতে মন টললো না। তিনি মনসাদেবীকে চূড়ান্ত অপমান করে হেমতালের লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন। পদ্মা বিশেষ অপমানিত হয়ে প্রস্থান করলেন। কিন্তু যাবার সময় বলেন গেলেন, এর প্রতিশোধ আমি গ্রহণ করব।

বাণিজ্য যাত্রার সময় ঘনিয়ে এল। যথাসময়ে গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণের দল নিয়ে চন্দ্রধর ডিঙ্গায় উঠলেন। সৈন্যসামন্তও সঙ্গে গেল। মধুকর সহ চৌদ্দটি ডিঙ্গা ভেসে চলল মহাসমারোহে।

চৌদ্দ ডিঙ্গা বোঝাই করে চন্দ্রধর স্বদেশে ফিরে চললেন। মন তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু দেবী মনসা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এবার বুঁঝি তার সুযোগ মিলল। সমুদ্রে উঠল প্রবল ঝড়। মনসা পবনদেবকে নির্দেশ দিলেন– চন্দ্রধরের সমস্ত ডিঙ্গা সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দাও। আপ্রাণ চেষ্টা করেও মাঝিরা ডিঙ্গা রক্ষা করতে পারল না। একে একে সব ডিঙ্গা সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল। একটি তক্তাকে আশ্রয় করে চন্দ্রধর লোকালয়ে আশ্রয় পেলেন। রিক্ত সর্বস্বান্ত চন্দ্রধর। সম্পদ লাভের আশায় এসেছিলেন বাণিজ্যে। কিন্তু পদ্মার চক্রান্তে আজ তিনি পথের ভিখারী। ভাগ্যচক্রে চন্দ্রধরের এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। চন্দ্রধরের এই দুর্দশা দেখে সেই বন্ধু তাঁকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করলেন এবং তাঁকে চম্পকনগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রিক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে রাজা চন্দ্রধর এসে উপস্থিত হলেন চম্পকনগরের সন্নিকটে। ইত্যবসরে পদ্মাবতী সাধারণ নারীর বেশ ধারণ করে সনিকাকে গিয়ে বললেন- রাণী, আজ তোমার পুত্র লখিন্দরের বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আজ হয়তো তোমার গৃহে ভূতের আগমন ঘটতে পারে। খুব সাবধানে থেকো।

রাণী তাই অতি সাবধানেই রইলেন। বাড়ির দাস-দাসীরাও সতর্ক হয়ে রইল। রাজা চন্দ্রধর চম্পকনগরের বাইরে এসে অপেক্ষা করছেন। দিনের আলোতে কেমন করে এই কলংক কালিমাময় মুখ তিনি প্রজাদের দেখাবেন? তাই স্থির করলেন, রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি নিজ গৃহে প্রবেশ করবেন।

কিন্তু তা করতে গিয়েই বাধলো বিভ্রাট। তস্কর ভেবে দাস দাসীরা তাঁকে প্রহার করতে লাগল। প্রহারে জর্জরিত হয়ে চৈতন্য হারালেন চন্দ্রধর। রাণী কৌতুহলী হয়ে আলো নিয়ে তস্করকে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন, এ যে স্বয়ং রাজা!

www.pathagar.com

পরিচর্যায় চন্দ্রধরকে সুস্থ করে তুললেন সনিকা। সনিকার ঘরে তখন পালঙ্কে শুয়ে আছে লখিন্দর। অপরূপ তার রূপ। চন্দ্রধরের মনে জাগল সন্দেহ, রাণী তাঁর অবর্তমানে পরপুরুষের সঙ্গে বুঝি হয়েছে ব্যভিচারিণী! সর্বাঙ্গ তাঁর শিউরে উঠল ছি! ছি!

অবশ্য ভুল ভাঙতে তাঁর বিলম্ব হল না। পুত্রকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রধর। কিন্তু পরক্ষণেই অন্তর তাঁর কেঁপে উঠল পদ্মাবতীর প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভেবে।

যাত্রার প্রাক্কালে সে চম্পক নগরীর অদূর দ্বীপে নির্মিত পদ্মার পূজাবেদী ও পূজারঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। বাণিজ্যেতে গিয়ে চাঁদ প্রচুর ধন সম্পদ সংগ্রহ করে যখন ফিরছিল পথিমধ্যে মায়া বলে ঘুর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করল পদ্মা। ঝড়ে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দটি ডিঙ্গাই কালীদহ সাগরে ডুবে গেল। কোনো মতে বেঁচে আসল চাঁদ সওদাগর, সওদাগরের দুরবস্থায় দুঃখ পেল রানী। স্বামীকে অনেক বুঝালো সে, কিন্তু অনড় চাঁদ সওদাগর। পুনরায় চাঁদ সওদাগর প্রচুর ধনরত্নের মালিক হলো। সনিকার পূজায় খুশি হয় পদ্মাদেবী। ক্রমে লখিন্দর বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠে। চাঁদ লখিন্দরের পাত্রী সন্ধানে হরিসাধু ঘটককে পাঠায়। ঘটক অনেক সন্ধান করে বহুকষ্টে কন্যার সন্ধান নিয়ে আসে। ঘটক কন্যার বর্ণনা দেয় এভাবে–

উজানি নগরে বসতি, গন্ধ বণিক জাতি,
সাহারাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বেহুলা রূপে গুণে চন্দ্রকলা,
সেই কন্যার যোগ্য লখিন্দর।
এই কন্যার গুণে হারাইলে ধন আনে,
মইলে মরা জিয়াইতে পারে।

হরিসাধু ঘটকের কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল চাঁদ সওদাগর। বললো, বিলম্ব না করে বিয়ের আয়োজন কর। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। চাঁদ সওদাগর পুত্র লখিন্দর ও তার সঙ্গিদের নিয়ে পুত্রবধু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সঙ্গিদের এক জায়গায় রেখে চাঁদ সওদাগর পুত্রকে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলো এবং ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখতে পেল বেহুলা স্নান করছিল। ঠিক সে সময় এক বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালো পদ্মা। বেহুলা পদ্মাকে দেখে অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিল। বেহুলার এইরূপ আচরণে পদ্মা রুষ্ট হয়ে বেহুলাকে অভিশাপ দিল, বিয়ের রাতেই পদ্মার কালনাগের দংশনে তোর পতির মৃত্যু হবে। বেহুলাও পদ্মাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোর অভিশাপ যদি সত্যি হয়, তবে তাকে না বাঁচালে তোরও রেহাই হবে না। দৃশ্য দেখে থেমে গেল চাঁদ সওদাগর। পরে জানতে পেল, ঐ কন্যাই তার হবু পুত্রবধু বেহুলা। বেহুলার ঐরূপ সাহস দেখে চাঁদ সওদাগর মুগ্ধ হলো এবং সাহরাজার সাথে সাক্ষাৎ করে তার আগমণের কারণ জানালে সাহরাজা নিজ কন্যা বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিয়ে দিতে সম্মত হলো। চাঁদ সওদাগর নিজের সাথে আনা লোহার চালগুলো সাহরাজাকে দিয়ে বললো, এই চালগুলি যদি আপনার মেয়ে রান্না করে দেয় তা হলে আমরা খেয়ে নিজ দেশে ফিরে যাবার আশা রাখি। বেহুলার লোহার চাল দিয়ে ভাত রান্না করে এবং অতিথিরা তা খেয়ে নিজ দেশে চলে গেল। চাঁদ নিজের

www.pathagar.com

স্ত্রীর কাছে ঘটনা খুলে বললো। সনিকা খুব সুখি হলো এবং বললো, এমন কন্যাই তো চাই। পরক্ষণে চাঁদ সওদাগর বেহুলার প্রতি পদ্মার অভিশাপের কথা জানালে সনিকা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। বললো, অমন কন্যায় কাজ নেই। ছয়পুত্রকে হারিয়ে আমি লখাইকে পেয়েছি। সুতরাং এ বিয়ে হবে না।

চাঁদ সওদাগর বলল, এ বিয়ে হবেই। বেহুলাকে আমি পুত্রবধু করে ঘরে আনবোই। আমি কথা দিচ্ছি, আমি বেহুলা লখিন্দরের জন্য লোহার বাসর ঘর সাজাব। যেই বাসর ঘরেই বেহুলা লখিন্দর রাত্রি যাপন করবে। সেই কথা সেই কাজ। চাঁদ সওদাগর কেশাই কামারকে ডেকে পাঠালো। কামারকে বললো, যত পরিমাণ লোহা লাগে দেব। বাসর ঘর সাজাও। চাঁদের আদেশ মতো কেশাই লক্ষ শ্রমিক লাগিয়ে এক রাতে লোহার বাসরঘর তৈরি করে। ঘরের ভিতর এঁকে দিল সোনা রূপা দিয়ে নানা রকমের চিত্র। চাঁদ সওদাগর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথোচিত বখশিস দিয়ে কামারকে বিদায় করে দিল। কেশাই কামার বখশিস নিয়ে বাড়িতে ফিরেই দেখে রক্ত চক্ষু পদ্মা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। পদ্মাকে দেখে কামার হতচকিত হয়ে পড়লো। পদ্মা রেগে কামারকে শাসিয়ে বললো, কোন সাহসে বেটা তুই অমন কাজ করলি? আমি সবংশে তোর নিপাত করবো। রেহাই পেতে একটি পথই খোলা আছে–

সবংশে কল্যাণ যদি চাহ আপনার।
ঈশান কোনে ছিদ্র রাখ নাগ ঢুকিবার ॥

সকালে হাতুড়ি বাটাল দিয়ে বাসর ঘরে গিয়ে দু'টি ছিদ্র কাটল কামার। ছিদ্রস্থানে মোম আর তুলার প্রলেপ দিয়ে ছিদ্র মুখ বন্ধ করে দিল। বিয়ের আয়োজন শুরু হলো। আনন্দ বাজনা বেজে উঠলো। বড় বড় গহনা ভর্তি করা হলো মূল্যবান বস্ত্র ও অলংকারাদি দিয়ে। যথাসময়ে উজানী নগরে এসে পৌছলো চাঁদ সওদাগর। সাহরাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করলো। উপঢৌকন দেখে খুশি হলো সাহরাজা। বিয়ে উৎসবে মেতে উঠলো উজানী নগর। অন্দরে চলছে বেহুলাকে সাজানোর পালা। লাল রঙের পাটের শাড়ি পরানো হলো কুঁচি দিয়ে; স্তন দু'টিকে বিভিন্ন রঙের কাঁচুলি দিয়ে ঢাকা হলো। গায়ে পরানো হলো নানা অলংকার। যথাসময়ে মন্ত্রপাঠ করে বেহুলা লখিন্দরের বিয়ে হয়ে গেল। সনিকা পুত্র ও পুত্রবধুকে লোহার বাসর ঘরে দিয়ে বাইরে থেকে লোহার কপাট এঁটে দিল। দশটি পোষা ময়ুর ও দশটি বেজিকে দশদিকে পাহারায় রেখে দিল। ছড়িয়ে দেওয়া হলো বনৌষধি, যাতে করে ঔষধের গন্ধে সাপ আসতে না পারে। চারদিকে সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে রাখা হলো। বাসর ঘরের বাইরে চারিদিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুন। চাঁদ সওদাগর নিজেও লাঠি হাতে পাহারায় রত রইলো, যাতে কোনো অবস্থাতেই পদ্মা আসতে না পারে। বাসর ঘরে শুধুই বেহুলা ও লখিন্দর। দেবী পদ্মার সামনে আজ জয় পরাজয়ের অগ্নি পরীক্ষা। তবে কি সাধারণ মানুষের কাছে স্বর্গবাসী দেবতার পরাজয় ঘটবে? ঘটবে কি পরাজয় পদ্মা দেবীর অহংকারী চাঁদ সওদাগরের কাছে? এত সব ভেবে চিন্তে পদ্মা সূর্যের কাছে গিয়ে স্তব স্তুতি করে বললো, হে সূর্যদেব আজ রাতেই লখিন্দরকে ধ্বংস করতে হবে। দয়া করে আমার কাজের সুবিধার জন্য আজকের রাতটা চার প্রহরের স্থলে আট প্রহরের জন্য প্রার্থনা জানাই। সূর্যদেব হেসে বলে, সে কী করে সম্ভব? সময়ের রথ যথা নিয়মেই

www.pathagar.com

চলে। তবে তোমার গৌরব রক্ষার্থে কার্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত আমি উদিত হব না। পদ্মা খুশি হলো। পদ্মা নাগগণকে ডেকে বললো, সাগর-পর্বতে, পাতাল-অন্তরীক্ষে যত নাগ আছে সবাইকে এই মুহূর্তে ডেকে আন। পদ্মার আদেশ পেয়ে সংবাদ দিতে আকাশ পথে উড়ে চললো পাণ্ডুনাগ। সংবাদ পেয়ে লক্ষ লক্ষ নাগ আকাশ পাতাল বেয়ে পদ্মার পদতলে এসে হাজির হয়। লক্ষ নাগের মধ্য থেকে একটা ঢোঁড়া এসে প্রণাম জানিয়ে বললো, মা আদেশ করলে এই মুহূর্তে আমি চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের কলিজাটা বিষে অংগার করে দিয়ে আসতে পারি। চাঁদ সওদাগর জানে না, আমি ইচ্ছা করলে নিঃশ্বাসে পর্বত উড়াতে পারি। লেজের বাড়িতে পারি সমুদ্র শুকাতে। ঢেঁড়ার মুখে কথা শুনে পদ্মা খুশি হয়ে তাকে ছয় তোলা বিষ দিয়ে বললো, তবে আর দেরী না করে যাত্রা শুরু কর। পদ্মার আদেশে ঢোঁড়া এগিয়ে চললো, পথিমধ্যে থেমে গেল ঢোঁড়া। দেখলো কচুবনে এক ব্যাঙ এর ব্যাঙি দু'জনে মিলে ঝগড়া করছে। তাদের দেখে ঢোঁড়ার জীবে পানি এসে গেল। এমন সুযোগ তো ছাড়া যায় না। সে মুখের বিষটুকু কচুগাছের গোড়ায় রেখে ব্যাঙ আর ব্যাঙিকে খেয়ে ফেলে। ফিরে এসে দেখে সবটুকু বিষ কচু গাছে শুষে নিয়েছে। পদ্মার কাছে ফিরে আসে বলে মাগো ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ যায় যায়। কচুবনে গিয়ে রক্ষা পেলুম। কচু গাছ আমার সব বিষ শুষে নিয়ে গেছে। ঢোঁড়ার ভণ্ডামি বুঝতে পেরে পদ্মা তার মুখের অবশিষ্ট বিষ কেড়ে নিল চিরতরে ঢোঁড়া বিষশূন্য হয়ে পড়ে। মেটেলি সাপ এসে পদ্মাকে প্রণাম করে বলল, মা তোমার হুকুম পেলে আমি পর্বত গিলে ফেলতে পারি এবং এখুনি বেহুলার সিঁথির সিদুঁর মুছে দিয়ে আসতে পারি। মেটেলির কথা শুনে তাকে ছয় তোলা বিষ দিয়ে দিল পদ্মা। বিষ পেয়ে বায়ুবেগে রওয়ানা হলো মেটেলি। পথিমধ্যে ভাবল, রাত তো অনেক বাকি একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়। এমন সময় দু'টি পাখির বাচ্চা দেখে মেটেলি চুরুতার পাতায় বিষ রেখে সে বাচ্চা দু'টিকে খেয়ে ফেলে। এসে দেখে সবটুকু বিষই বোলতা আর ভিমরুলে খেয়ে ফেলেছে। মেটেলি পদ্মার কাছে এসে কেঁদে কেঁদে বলে, মা বিপদের কথা কি বলব। আমাকে দেখে হাজার হাজার প্রহরী অস্ত্র হাতে মার মার করে তেড়ে আসল। আমি পিতৃপূণ্যে কোনো রকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। পদ্মা মেটেলির মুখে অসত্য কথা শুনে রাগে ক্ষোভে তার লেজ ধরে দূরে ছুঁড়ে মারলো। এগিয়ে এলো বোড়া। পদ্মাকে প্রণতি জানিয়ে বললো, মা তোমার নির্দেশ পেলে এখুনি চম্পক নগরে গিয়ে শুধু লখিন্দর নয়, তার গোটা বাসর ঘরটা গিয়ে খেয়ে ফিরে আসি। বোড়ার কথা শুনে পদ্মা তাকে ছয় তোলা বিষ দিয়ে চম্পক নগরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল। বোড়া খাল, বিল, ঝোপ-কন্দর পেরিয়ে উল্টে পাল্টে চলতে লাগল। হঠাৎ পথিমধ্যে দেখতে পেল একটা হরিণ। মোটা নাদুস-নুদুস হরিণ দেখে লোভ হল বোড়ার। মুখের বিষটুকু গাছের কোটরে রেখে হরিণটি খেয়ে এসে দেখে পিঁপড়া সব বিষ খেয়ে ফেলেছে। নির্বিষ হয়ে বোড়া পদ্মার কাছে গিয়ে বললো, মা কি যে বলব সে বিপদের কথা, আমাকে দেখা মাত্র কত হাতি, ঘোড়া, বাঘ-ভালুক তেড়ে এলো। আমি কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলাম। বোড়াকে দেয়া হলো কঠিন শাস্তি। এগিয়ে এলো কালনাগ। পদ্মাকে প্রণাম জানিয়ে বললো, তুমি কেন ভাবছো? আমি আজই লখিন্দরকে দংশন করে ফিরে আসব। কালির কথা শুনে পদ্মা তাকে ছয় তোলা বিষ দিয়ে বললো, কোনো প্রকার

www.pathagar.com

বিলম্ব না করে দ্রুত যাত্রা করো। পদ্মার আদেশ পেয়ে কালনাগ ভ্রমর রূপ ধারণ করে চম্পক নগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কালি গিয়ে দেখল, লক্ষ লক্ষ প্রহরী বাসর ঘরের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে এবং তাকে দেখে সবাই মার মার শব্দে দৌড়ে এলো। প্রাণভয়ে কাল আকাশে উড়াল দিয়ে পালালো। কাল ফিরে এসে পদ্মাকে বললো, মাগো কি আর বলবো। লক্ষ প্রহরী ঘিরে আছে বাসর ঘর। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তেড়ে আসল। আমি প্রাণ নিয়ে কোনরকমে বেঁচে এসেছি। লক্ষ প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব। যদি মায়াবলে সমস্ত প্রহরীকে ঘুমিয়ে দিতে পারো তাহলে লখিন্দরকে দংশন করা সম্ভব। কালনাগের কথা মত পদ্মা নিদ্রা দেবীকে স্মরণ করল। নিদ্রা দেবীর মন্ত্রে নিদ্রা গেল চম্পক নগরীর লক্ষ প্রহরী, নিদ্রা গেল হাতি, ঘোড়া, ময়ুর, নেউল। নিদ্রা গেল বাসর ঘরে বেহুলা লখিন্দর। এই সুযোগে কালনাগ খুঁজে খুঁজে বাসর ঘরের ঈশান কোণে তুলা আর মোম দিয়ে ঢেকে দেওয়া ছিদ্রপথ খুঁজে পেল এবং নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মোম গলে গেল, তুলা উড়ে গেল। সেই ছিদ্র পথে ঢুকে পরল কালনাগ। ভিতরে ঢুকে দেখে সুবর্ণ পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে বেহুলা লখিন্দর। কালনাগের মনে দয়ার উদ্রেগ হলো। কোনো অপরাধে লখিন্দরকে দংশন করবো, যা বলে বলুক পদ্মা। বিনা অপরাধে লখিন্দরকে দংশন করা সম্ভব নয়। কালীনাগ ফিরে গেল পদ্মার নিকট। সবিস্তারে বললো ঘটনা। পদ্মা কালীনাগকে বুঝিয়ে বললো, এটি শুধু তোমার প্রতি আমার আদেশ নয়। এটি শিব আজ্ঞা। আমি কথা দিচ্ছি যদি চাঁদ সওদাগর আমায় পূজা দেয় আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দেব এবং ফিরিয়ে দেব চাঁদ সওদাগরের ছয় ছেলেকে এবং চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন। আমি যা করছি বুঝে শুনেই করছি। চাঁদের ভালোর জন্য করছি। অতএব বিলম্ব না করে রাত প্রায় শেষ, যাত্রা করো। ফিরে চললো কালনাগ। সন্তর্পণে প্রবেশ করলো বাসর ঘরে। মিটমিট করে জ্বলছে ঘৃত প্রদীপ। ঘুমিয়ে আছে বেহুলা লখিন্দর। এগিয়ে যায় কালনাগ। জয়মা পদ্মা বলে কালনাগ লেজের একটা ঝাপটা দিল ঘৃত প্রদীপে। উল্টে পড়ে গেল প্রদীপ। প্রদীপের তৈল ছিটকে গিয়ে পড়লো লখিন্দরের বাহুতে। লখিন্দরের বাহুটা গিয়ে পড়লো কালিনাগের মাথায়। এই সুযোগে পদ্মার নাম স্মরণ করে কালনাগ লখিন্দরের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে দংশন করলো।

বিষের জ্বালা ছেয়ে গেল লখিন্দরের সারা গায়ে। লখিন্দর শুধু ঘুমন্ত বেহুলাকে ডাক দিয়ে বললো, প্রিয়া মোর, গা মোর কেমন করে বিষের জ্বালায়। বেহুলা হাত দিয়ে দেখে লখিন্দর আর নেই। বেহুলার চিৎকারে জেগে উঠে লক্ষ প্রহরী। জেগে উঠলো সনিকা রানী। তার আর্তনাদে কেঁদে উঠলো সারা চম্পক নগরী। জেগে উঠলো চাঁদ সওদাগর। কালনাগ ততক্ষণে লখিন্দরের আত্মা নিয়ে ছুটে চলেছে পদ্মার দিকে। সারা চম্পক নগরীতে শোকের ছায়া নেমে এলো। চাঁদ সওদাগর পুত্রের মৃতদেহ সৎকার করার প্রস্তুতি নিল। এমন সময় বেহুলা শ্বশুরের কাছে এসে বললো, বাবা আমি আমার মরা স্বামীকে দেবপুরীতে নিয়ে যাব। সেখান থেকে আমি আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে নিয়ে ফিরে আসব। বেহুলা দেবপুরীতে যাবার উদ্দেশ্যে কলাগাছ দিয়ে সুদৃশ্য ভেলা নির্মাণ করলো। চারিদিকে খুঁটি দিয়ে বেড়া বেষ্টনী দেওয়া হলো। পাতানো হলো পরিপাটি বিছানা। বেহুলা শ্বাশুড়িকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সনিকা

www.pathagar.com

বেহুলাকে বললো মাগো আশীর্বাদ করি, যাত্রা করো। মাগো, এ যে তোমার বিধির লিখন। যাত্রার প্রাক্কালে বেহুলা একটি ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেল। বললো, মাগো এই প্রদীপ ছয় মাস জ্বলবে। যদি কখনো এই প্রদীপ নিভে যায় বুঝবে তোমার বেহুলা আর কোনদিন ঘরে ফিরবে না। আর যদি জ্বলতে থাকে তাহলে বুঝবে বেহুলা তার পতি নিয়ে তোমার কোলে ফিরে আসবে। একটি পাত্রে কিছু সিদ্ধ ধান দিয়ে বললো, যেদিন এই সিদ্ধ ধান হতে অংকুর গজাবে সেদিন ভাববে তোমার বেহুলা ঘরে ফিরে এসেছে। মরা জাম গাছটি দেখিয়ে বললো, যে দিন দেখবে এই জামগাছ পত্র পুষ্পে ভরে যাবে, সেদিন বুঝবে তোমার বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। মৃত পতিকে নিয়ে ভেলায় গিয়ে বসলো বেহুলা। তরতর করে উজানের দিকে ভেসে চললো ভেলা। পদ্মার আদেশে সকল নাগ মিলিত হয়ে শকুনিরূপে এসে ছেঁকে ধরলো ভেলাটি। মরালোভী এক বিরাট শুকুনি বেশে স্বয়ং পদ্মা লখিন্দরের মৃত দেহটি খেতে চাইলে বেহুলা এটিকে মনসা দেবীর ছলনা বলে অনুধাবন করতে পারলো। এরপর পদ্মা শিয়াল রূপে অনেক শিয়ালের সাথে নদী তীরে আটকে থাকা ভেলাটিকে ঘিরে ধরে। সতী বেহুলা বলে, পদ্মার দোহাই। তোমরা আগে আমাকে খাও। তারপর মরা নিয়ে যাও। এ কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় শিয়ালের দল। এবার বেহুলার মাসীরূপে ডাক দিয়ে পদ্মা বেহুলাকে বলে, মাগো তোমার দুঃখে আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে। তোমার মত আমারও পোড়া কপাল। ছোটোকালে আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। সেই দুঃখে আমি এখানে দোকান খুলে বসে আছি। আমি বলি কি ঐ মরা নিয়ে আর নদীতে ভেসে ভেসে লাভ নেই। বরং ওসব আশা পরিত্যাগ করে নতুন করে বিয়ে করে ঘর বাঁধ। বেহুলা বললো, বাঁধলে মরা পতিকে জিইয়ে তার সাথে ঘর বাঁধবো। অন্য কারো সাথে নয়। এই আমার সত্য। একদিন বেহুলার ভেলা এসে পৌঁছলো গোদার বাঁকে। এ বাঁকে শুধু গোদাদেরই বসবাস।

এখানকার হাটের নাম গোদার হাট। বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে মনা গোদা ও ধনাগোদা তাকে বিয়ে করতে চাইলো। বেহুলার কথায় দু'ভাইয়ের মধ্যে মারামারি হয়। ভাসতে ভাসতে চললো ভেলা। লখিন্দরের মৃত দেহ পঁচে গলে খসে খসে পড়তে লাগলো। পতিব্রতা সতী নারী বেহুলার স্বামীর কংকাল নদীর জলে ধুয়ে নিল। ভাসতে ভাসতে ভেলা এক ঘাটে এসে পৌঁছলো। বেহুলা দেখলো এক ধোপানী নদীর ঘাটে পিঁড়ি পেতে কাপড় ধুচ্ছে। একটি ছোটো শিশু ধোপানীর কাপড় কাঁচায় বার বার বিরক্ত করছে। ধোপানী শিশুটির দিকে মায়া বলে তাকাতেই শিশুটি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অচেতন শিশুটিকে পিড়ির পাশে রেখে কাপড় ধোয়া শেষ করে শিশুটিকে আবার মায়া বলে চেতন করে বাড়ি যেতে ফিরার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো ধোপানী। সবই দেখল বেহুলা। বেহুলা ধোপানীকে ডাকলো, মাসী? মাসী ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালো ধোপানী। বললো, কে গো তুমি? কলার ভেলায় ভেসে যাও। বেহুলা ভেলা ভিড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল। দুঃখের কাহিনি সব খুলে বললো। ধোপানী নিজের পরিচয় দিল। আমি নেতাই ধোপানী। দেবতাদের কাপড় ধুইয়ে দেই। বেহুলার কথা শুনে ধোপানীর মায়া হলো। বেহুলাকে সাথে নিয়ে ঘরে ফিরলো ধোপানী। পরদিন নেতাই ধোপানীর সাথে ঘাটে

www.pathagar.com

আসলো বেহুলা। বেহুলা নেতাইকে বললো, মাসী যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আজকের কাপড়গুলো আমি ধুইয়ে দেই। ধোপানী বললো, না দেব বস্ত্র তুমি ধুঁতে পারবে না। বস্ত্র ধুতে গিয়ে নষ্ট হলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপরও বেহুলা বললো তোমার বোনঝির কথা রাখ না মাসী। বস্ত্র আমি নষ্ট করব না। বেহুলা খুব সুন্দরভাবে কাপড়গুলো পরিষ্কার করলে তা রোদে শুকিয়ে ধোপানী দেবপুরীতে পৌঁছে দিতে গেল। কাপড়গুলো পরীক্ষা করে দেব সর্দার শিব ধোপানীকে বললো, বলতো কাপড়গুলো আজ বেশি পরিষ্কার হওয়ার রহস্য কী? কে ধুইয়েছে কাপড়গুলো? ধোপানী শিবের নিকট বেহুলার পরিচয় দিয়ে বললো,

ধোপানী বলে, মোর ঘরে আসিল নর্তকী
ত্রিভূবনে হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
বসন ধুইয়া দিল আজিকার দিনে,
বর্ণনা হয় না তার দরশন বিনে।

সুন্দরী নারীর কথা শুনে চমকে উঠে বুড়ো শিব। শিব ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, কালই তুমি সুন্দরীকে আমার কাছে নিয়ে এস। ঘরে ফিরে ধোপানী বেহুলার কাছে সুসংবাদ জানালো ও বললো, দেব সভায় তোমাকে নাচতে হবে। ধোপানীর কথা শুনে বেহুলা ভাবলো সামনে তার অগ্নি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। দেবপুরীতে নাচের আসর বসলো। শিবের আমন্ত্রণে এলো অন্যান্য দেবগণ, এলো মুণিগণ, এলো স্বয়ং শিব পত্নী চণ্ডী। এলো তার পুত্রগণ। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পদ্মা এসে হাজির হলো। দেব সভায় বেহুলার নাচ শুরু হলো।

শিব বললো তোমার নাছে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। বলো বিনিময়ে কি চাও। কি তোমার প্রার্থনা? বেহুলা বললো, "আমি আমার স্বামী, ছয় ভাসুর ও ওঝা ধন্বন্তরীর প্রাণ ভিক্ষা চাই এবং আমার শ্বশুরের বিধ্বস্ত বাগানসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন এবং মহাজ্ঞান ফেরত চাই। এবার শিব পদ্মার দিকে তাকালো। পদ্মা বললো, বেহুলার সব শর্ত আমি পূরণ করতে পারি। শর্ত একটা, চাঁদ সওদাগরকে আমাকে পূজা দিতে হবে। পদ্মার শর্ত মেনে নিল বেহুলা। বেহুলা তার স্বামীর কংকাল সাজিয়ে দিলে পদ্মার ইচ্ছাক্রমে তাতে মেদ, মাংস ও রক্তের সঞ্চার হলো।

পদ্মার মায়া বলে লখিন্দর বেঁচে উঠলেন। প্রাণ ফিরে পেল লখিন্দর। দেবগণকে প্রণাম জানিয়ে বেহুলা প্রাণপ্রিয় স্বামী লখিন্দরকে সাথে নিয়ে দেবপুরী ত্যাগ করলো। ভেলায় চড়ে আবার কালিদহ সাগরে এসে পৌঁছল। এখানে চাঁদ সওদাগরের ছয়পুত্র ও চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন ডুবে আছে অতল জলে। বেহুলা স্মরণ করলো পদ্মাকে। বললো, মা যাত্রার সময় শ্বশুর শাশুড়িকে বলে এসেছি। কালিদহ সাগরে ডুবে যাওয়া তোমাদের ছয়পুত্র ও চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন নিয়ে যদি ফেরত আসতে পারি তবে আসব নচেৎ নয়। পদ্মার মন্ত্রে চাঁদ সওদাগরের ছয়পুত্র ও ধন্বন্তরী প্রাণ পেল এবং সাগর থেকে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন ভেসে উঠল। স্বামী লখিন্দর, ছয় ভাসুর, চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন ও ওঝা ধন্বন্তরীসহ বাড়ির ঘাটে পৌঁছলো বেহুলা। সনিকা ঘুরে ঢুকে দেখে সতী নারী বেহুলার জ্বালানো ঘৃত প্রদীপ বহুগুণ তেজে জ্বলছে।

www.pathagar.com

গ. পুথি পাঠ

সেকালের পুঁথি পাঠের আসর ছিল ভদ্র অনুষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রামে পুঁথি পাঠের সুকণ্ঠ গায়ক ও ব্যাখ্যাকার পণ্ডিত থাকত। গায়ক সুর করে দু'লাইন পুঁথি পাঠ করত, তা পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে যেত। দোনা গাজীর 'সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল' পুঁথির ব্যাখ্যা এক-এক পণ্ডিত এক এক রকম করত। কোনো আসরে দু'জন পণ্ডিত একত্রিত হলে 'পদ্মাবতী' পুঁথির দু'লাইনের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত দু'জন সারারাত পার করে দিত। সে আমলে এখানকার মুসলমান সমাজের বিয়ে-শাদী, খানা- মেজবানী ইত্যাদি উৎসবে পুঁথিপাঠের ব্যবস্থা করা হত। এমনিতে ঘরোয়াভাবেও প্রতি পাড়ায় প্রতিদিন পুঁথি পাঠের আসর বসত।

বিখ্যাত পুঁথি পাঠক : ১। আমান উল্লাহ খান, গ্রাম- বাহের খলিশাঢুলী, চাঁদপুর।

২। নোয়াব আলী প্রধানিয়া (১৯৫৬ সালে মারা যান), গ্রাম- তেতৈয়া, কচুয়া।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে চাঁদপুর জেলার রাজরাজেশ্বর ইউনিয়নের তৎকালীন জমিদার আজির আলী বন্ধুকসী তার সহযোগীদের নিয়ে এই পুঁথি পাঠের আসরে প্রচলন করে ছিলেন। আজির আলী বন্দুকসীর প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিশাল পুঁথির বই থেকে একটি পুঁথির কেচ্ছা সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করা হলো।

এক সওদাগর ও জেনের কেচ্ছা

পয়ার * সহরজাদি বলে সোন বাদসা নামদার ॥ এক সওদাগর ছিল আগে জমানার * বড়া মালদার সেই ছিল সওদাগর ॥ নগদ আসবাব আর ছিল মাতব্বর * বাতে তার ঘরে কমি ছিল নাই ॥ গোমস্তা মুছুদ্দি কত ছিল ঠাই ঠাই * দেশে২ গোমস্তা আছিল কত শত ॥ সওদাগরি কাম সেই করে অবিরত * আপনি সে দেসে২ মোসাফেরি করে ॥ সওদাগরি কামে সেই দেসে দেসে ফেরে * একবার এয়ছাই এরাদা তার হৈল ॥ ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ সফরে চলিল * খাইবার সরঞ্জাম লিল থোড়া সাতে ॥ ছালায় ভরিয়া সে ঘোড়ার উপরেতে * খোরমা আর কুলিচা ভরিয়া ছালা করি ॥ সফরে চলিল সে করিতে সওদাগরি * মঞ্জিল২ রাহা নেকলিয়া যায় ॥ কতদুরে রাহের মান্দেগী হৈল তায় * ভোক পেয়াসেতে মর্দ্দ হইল লাচার ॥ ধুপের তাবেস তাহে ছিল জোরওার * রাহা ছাড়ি গেল এক দরক্তের তলে ॥ ওতরিয়া ছালা হৈতে খোরাক নেকালে * আছিল তালাব এক নজদিগে তাহার ॥ দরক্তে বান্ধিল সে ঘোড়াকে আপনার * কুলিচা ও খোরমা মর্দ্দ বসিয়া খাইল ॥ খোরমা খাইয়া আঠি টানিয়া ফেলিল * চারিদিকে ফেলে আঠি জোরেতে টানিয়া ॥ পানি টিয়া আসিল সে ওজু যে করিয়া * দরক্তের নিচে যায় নামাজ লাগিয়া জোহর নামাজ পড়ে এলাহি ভাবিয়া * নামাজ পড়িয়া মর্দ্দ সালাম ফিরিল ॥ নামাজ হইতে জবে ফারেগ হইল * এয়ছা ওক্তে এক জেন দেয়ের আকার ॥ ছুটিয়া আইল হাতে লাঙ্গা তলওার * আসিয়া সে সওদাগরে বলে হাক দিয়া ॥ খাড়া রহ জাহ কোথা ডালিব কাটিয়া * এখনি গরদান আমি কাটীব তোমার ॥ তোমার মওত আজি হাতেতে আমার * সওদাগর দেখে তারে কাপিল ॥ ছুরত দেখিয়া তার জান উড়ে গেল * কাপিতে২ বাত কহে তার তরে ॥ কি গোনা করিনু জে মারিতে চাহ মোরে * জেন বলে তুমি মেরা ফরজন্দে মারিলে ॥ তোমাকে মারিব আমি তাহার বদলে * সওদাগর বলে আমি তারে দেখি নাই ॥ বল দেখি তাহাকে মারিনু কবে ভাই * জেন বলে তুমি হেথা খোরমা যে খাইলে ॥ চারিদিকে আঠি তার তুমি না ফেকিলে * সওদাগর বলে

www.pathagar.com

আমি খোরমা খাইয়াছি ॥ আঠি তার ময়দানেতে ফেকিয়া দিয়াছি * এহাতে তকছির কিবা করিনু তোমার ॥ কাহেকো মারিবে তুমি গরদান আমার * জেন বলে তুমি সেই খোরমা জে খাইয়া ॥ চারিদিকে আঠি জবে ফেকিলে ছুড়িয়া * আমার ফরজন্দ খাড়া এই খানে ছিল ॥ এক আঠি গিয়া তার আখিতে পড়িল * এয়ছা জোরে দানা তুমি আছিলে ফেকিয়া ॥ তখনি মরিল লাড়কা জমিনে গিরীয়া * তাহার বদলে আমি মারিব তোমারে ॥ জেয়ছা তুমি খুন কর মেরা লাড়কারে * সওদাগর বলে তারে চক্ষে দেখি নাই ॥ আমার তরছির তাহে কিছু নাহি ভাই * আমি জদি দেখিয়া মারিয়া থাকি তারে ॥ বিচারে তকছির মেরা তবে হতে পারে * এতে জদি তকছির হইয়া থাকে মেরা ॥ সেই গোনা মাফ চাহি জনা বেতে তেরা * জেন বলে আমি কভু মাফ না করিব ॥ জানের বদলে আমি তেরা জান লিব * এত বলি সওদাগরে জোরেতে ধরিয়া ॥ পাছাড়িল জমি পরে কাটিবার লাগিয়া * চাহেকি কাটীয়া গরদান তাহার ॥ সওদাগর তার হাতে হইয়া লাচার * কান্দে মর্দ্দ জেনের লাড়কা এয়াদ করিয়া ॥ কোনমতে তার হাতে ভাগিতে নারিয়া * কান্দিতে লাগিল মর্দ্দ হৈয়া জার২ ॥ জেনের খাতিরে দিল দোহাই আল্লার * জেন সেই আহাজারি দেখিয়া তাহার ॥ ধামিল সে খুন হেতে হাত আপনার এয়ছাই এরাদা জেন করিল যে দেলে ॥ কাটিব এহারে আহাজারি যে থামিলে * সওদাগর না থামিল করে হায়২ ॥ কান্দিয়া২ বলে না মার আমায় * জেন বলে যদি তেরা দুই আখি হৈতে ॥ খুন বহে আখিতে আছুর বদলেতে * তবু আমি তুঝে কভু ছাড়িয়া নাদিব ॥ বেটার বদলে তুঝে কাটীয়া ডালিব * সওদাগর বলে তারে হৈয়া জার২ করিনু এতেক জারি জনাবে তোমার * তবু কি তোমার দয়া না হইল মোরে ॥ নেহাতি কিকাটিয়া ডালিবে একবারে* জেন বলে আমি তুঝে কভু না ছাড়িব ॥ এখানি তোমারে দেখ কাটীয়া ডালিব * ছওদাগর বলে জদি না ছাড় জেনহার ॥ এরছাই এরাদা ছিল দেলেতে আমার * সহরজাদি এইতক বলিতে কাহিনি ॥ রাত পোহাইয়া ফজর হইল তখনি * এইতক কেচ্ছা বলি খামস হইল ॥ আপনার দেলে বিবি তজবিজ করিল * নামাজের ওক্ত এখন হইল বাদসার ॥ নামাজ পড়িয়া বাদসা যাইবে দরবার * বলিল দিনারজাদি বহিনের তরে ॥ কিবা আচ্ছা কেচ্ছা তুমি শুনাইলে মোরে * সহরজাদি বলে জে শুনিলে এহা পরে ॥ নেহাত হইবে খুসি কেচ্ছার আখেরে* কি করিব এই তক হায়াত আমার ॥ তবে এইবাতে বাদসার সব এক্তরার * আজি যদি জান বকসি করেন আমাকে ॥ তবে বাকি শুনাইতে পারি জে তোমাকে * সহরে এয়ার বাত শুনে আপনার দেলে ॥ তজবিজ করিয়া এহা মোনে২ বলে * কালি এই কেচ্ছা ফের তামাম শুনিব ॥ তার পরে ফজরেতে কাটিতে বলিব * সেরোজ কাটীবা তার মৌকুফ করিল ॥ নামাজ পড়িতে বাদসা সেতাবি সেতাবি উঠিল * তাহারত করি বাদসা নামাজ পড়িয়া দরবারে বসিল আসি সেতাবি করিয়া * ডজিব আপনা ঘরে সোগেতে বেটির ॥ সারা রাত বৈসে জাগে হইয়া দেলগির * ফজরে তলওার লিয়া আসিয়া পঙছিল ॥ কাটিতে বেটির গলা মৌজুদ হইল * খাড়া রহে এন্তেজার হুকুমে বাদসার ॥ সেরোজ হুকুমবাদসা নাহি দিল তার * হুকুমের ওক্ত জদি গেল যে টলিয়া ॥ উজির হয়রতে রহে তাজ্জাব হইয়া * যেকথা সহরজাদি বলিয়া আছিল ॥ আলামত তাহার নজরেসে দেখিল * তাজ্জাব হইয়া বৈসে আপনা জাগায় ॥ এইরূপে সারাদিন গুজারিয়া জায় * রাত হৈলে আসিল বাদসা খেলওত খানায় ॥ সাবেক দস্তর মত শুয়ে নিন্দা যার * ঘড়ি এক রাত বাকি ফজর হইতে ॥ জাগিল দিনারজাদি এয়ছাই নিন্দ যায় * ঘড়ি এক রাত বাকি ফজর হইতে ॥ জাগিল দিনারজাদি এয়ছাই ওক্তেতে* সাবেক দস্তও বহিনের তরে ডাকি ॥

www.pathagar.com

জাগ যদি বুবুজান বলহ আমাকে * কালিকার কাহিনির বাকি আছে যাহা ॥ শুনিবারে আমার খাহেস বড় তাহা * তামাম আদায় কর বলিয়া কাহিনি ॥ বড়ই মাকুল বাত বল যদি শুনি * সহরজাদি শুনিয়া জওাব নাহি দিতে ॥ আপনি সহর এয়ার লাগিল বলিতে * বাকি কেচ্ছা বল আজি শুনি আরবার ॥ কি বলিল সওদাগর জেনেরে যে আর * সহরজাদি বলে বাদসা আরজ জনাবে ॥ সওদাগর জেনেরে বলিল ফের তবে * একান্ত আমাদের যদি না ছাড়িবে তুমি ॥ একবাত তোমারে আরজ করি আমি থোড়াই ফোরসত মুঝে দেহ একবার ॥ তারপর মারিবে যে গর্দ্দান আমার * আপনার ঘরে আমি যাইব চলিয়া ॥ আপনার জরু লাড়কা এসেছি রাখিয়া * তাহা সবাকার সাতে বিদায় হইব ॥ মেরা মাল আছবাব ওারেছ সবে দিব * যাহাকে যে দিতে হয় তাহাকে সে দিয়া ॥ বিদায় হইয়া আসি কাম চুকাইয়া * যদি আমি হেচ্ছা নাহি আসি চুকাইয়া ॥ আপসে লড়িবে সবে মালের লাগিয়া * তবেত খারাবি বড় হইবে আমার ॥ লুটা যাইবেক মাল না পাবে হকদার * এই বাতে তুঝে আমি দিতেছি কারার ॥ এই সব কাম চুকাইয়া আপনার * এই খানে আলতত্তা পঙছিব আসিয়া ॥ দেল তেরা যাহা চাহে করিবে ধরিয়া * জেন বলে দিলে তুঝে ফোরছত এয়ছাই ॥ জদি তুমি এখানে হাজের হও নাই * সওদাগর বলে সওগন্দ যে তার ॥ পয়দা করনহার জেই তোমার আমার * জদি এই কাম সব আদায় করিয়া ॥ হাজের না হই আমি এ খানে আসিয়া * জেন বলে কতদিনে আসিয়া পৌছিবে ॥ তাহার মিয়াদ মুঝে বল দেখি তবে * ছওদাগর বলে তবে পছন্দ করিয়া ॥ একসাল বাদে আমি আসিব ফিরিয়া তবে মেরা দেলে কিছু না রবে হছরত ॥ একসাল বাদে আমি আসিব আলবত * এই দরক্তের নিচে আসিয়া পঙছিব ॥ আপনাকে আমি তুঝে সুপিয়া যে দিব * এত শুনি জেন তবে কারার লইল ॥ সওদাগর তার আগে কছম খাইল * আল্লার কছম জেন পাইল জখন ॥ সেথা হৈতে গায়েব সে হইল তখন * সওদাগর সেথা হৈতে ঘো ড়ায় চড়িয়া ॥ আপনার ঘরে মর্দ্দ চলিল ফিরিয়া * কখন হইত খুসি খালাছ পাইয়া কখন দেলগির হৈত কছম লাগিয়া * এইরূপে আপনার ঘরেতে পঙছিল ॥ খেস বে রাদার তার খবর পাইল * জরু লাড়কা জত তার চাহে মিলিবারে ॥ সওদাগর আখি খুলে না দেখে কাহারে * জার২ কান্দে মর্দ্দ দেলে বেকারার ॥ আসিয়াছি কছম জে করিয়া আল্লার * একসাল বাদে মুঝে হইবে জাইতে ॥ আখেরে মরিব আমি জালেমের হাতে * খেস বেরাদর জত দেখে সওদাগরে ॥ আপনার দেলে সবে ভাবাগোনা করে কার তেজারত বুঝি হয়েছে নোকছান ॥ এখাতেরে সওদাগর আছে পেরেসান * সওদাগর কান্দিয়া যে দম থোড়া লিল ॥ বিবি তার তরে আসি পুছিতে লাগিল * তুমি আসিবাতে বড়া খুসি হৈল দেলে ॥ ঘরেতে আসিয়া এত কি লাগি কান্দিলে * কান্দনা দেখিয়া তেরা হৈনু পেরেসান ॥ কি খাতিরে কান্দ এয়ছা হইয়া হয়রান * ছওদাগর বলে তাহে কি আর বলিব ॥ একসাল ছেত্তা আর প্রানে না বাচিব * তার পরে একে একে বয়ান করিয়া ॥ বলিল ॥ জেনের কথা বেওরা ভাঙ্গিয়া সবে কান্দে জার২ ॥ ছের ধরে কান্দে বৈসে কবিলা তাহার * নুচিয়া ছেরের বাল কান্দে বিনাইয়া ॥ পাড়ার পড়সি কান্দে তাহাকে দেখিয়া * লাড়কা বালা কান্দে তার করে সোর সার॥ কান্দনা শুনিয়া কান্দে পরেন্দা জানওার * দুই রোজ কান্দে সবে হৈয়া জার জার ॥ তার পরে সওয়াগর হইয়া কারার * পহেলা সে দেনা চুকাইল সবাকার জার সাতে লেনা ছিল কারবার * তারপরে আপনার খেস বেরাদরে ॥ তহফা জাত দিল যাহা মনাছেব জারে * তার পরে খয়রাত করিল কত মাল ॥ যে যাহা মাঙ্গিল আসি গরিব কাঙ্গেল * বান্দি ও গোলাম তার ঘরে যত ছিল ॥ সবাকারে এক বারে আজাদ করিল

www.pathagar.com

* ওারেছ হকদার তার ছিল যত জন ॥ তার তরে তালিকা করিয়া রাখে ধন * মোকরর করিল আমিন এক লোকে ॥ তালিকা মাফিক শেসে দিবেন তাহাকে * বাকি মাল দিল সব বিবিকে তাহার ॥ ফারাএজ মাফিক যে হুকুম আল্লার * এইরূপে কয় দিন গেল গোজরিয়া ॥ জাইবার দিন তার পঙছিল আসিয়া * লাচারিতে জাইবারে হইল তৈয়ার ॥ কাফন লইয়া চলে সাতে আপনার * বিদায় হইল যবে সবাকার সাতে ॥ বেবাহা মাতম পড়ে তাহার ঘরেতে * জিতাদমে জেয়ছা কেহ যায় কবোরেতে ॥ বলিয়া বিদায় হৈয়া সবাকার সাতে * জোরু লাড়কা কেহ তারে ছাড়িতে নাছিল ॥ হড়াইয়া বিবি তারে কান্দিতে লাগিল * তাহারা সকলে চাহে সাতে যাইতে তার ॥ সওদাগর জান সক্ত করে আপনার * জোরু লাড়কা সবে ফেরাইল বুঝাইয়া ॥ তোমরা যে দিবে জান কিসের লাগিয়া * আখেরে মরিতে হবে সকলের তরে ॥ বে আজলে কেহ কভু কোথাও না মরে * আমার আজল আজি পঙছিল আসিয়া ॥ একেলা মরিব আমি কি কাজ ভাবিয়া * আল্লা যাহা করে আমি রাজি আছি তাহে ॥ সে মারিলে কেবা রাখে জাকে সেই চাহে * ছবর সোকার করা চাহি হরহালে ॥ বে ছবর হৈতে নাই এলাহি মারিলে * এত বলি সওদাগর সকলে ছাড়িয়া ॥ আপনার করার মত পঙছিল যাইয়া * হৈতে তওরিল হইয়া ॥ তালাবের কেনারাতে রহিল বসিয়া * জেনের লাগিয়া বৈসে থাকে এন্তেজার ॥ দে লেতে দহসত তার কছম আল্লার * সহরজাদি এই তক কেচ্ছা বলিবাতে ॥ ফজর হইল কেচ্ছা তামাম না হৈতে * দেলেতে হছরত বড়া হইল বাদসার ॥ কি হইল তার পরে পোছে সহর এয়ার * সহরজাদি বলে হইল ফজর ॥ এই তক বাকি ছিল আমার উম্মের * আজি জদি বকসি করেন আমার ॥ কালি ফের বাকি কেচ্ছা বলিব এহার * বাদসা বলে আজি তুঝে রেয়াত করিনু ॥ শুনিব তামাম কেচ্ছা বড়া খুসি হৈনু * এইরূপে রোজ২ থোড়া২ বাত ॥ বলিয়া সহরজাদি বাড়ায় হায়াত* এয় ছাই হাজার রাত কেচ্ছা বলে ছিল ॥ বাদসা কেচ্ছার পরে ফেরেফতা হইল * সাদি বেহা দোছরা করিল নাহি আর ॥ সহরজাদি বিবি হৈল বেগম বাদসার * দোছরা রোজে বাদসা আপনি তাহারে ॥ বাকি কেচ্ছা বলিতে বলেন সে বিবিরে * সহর জাদী বলে সোন বলে সোম বাদসা নামদার ॥ সওদাগর বৈসে ছিল দেলে বেকারার * সেইখানে আইল তবে এক বুড়া পীর ॥ সাতে লিয়া তার এক হরিনি খুবির * আইল হরিনি সেই দেখিতে সুবন্দ ॥ হাজারেতে এক তাজা আমিরি পছন্দ * ছালাম আলেক আসি বলে সওদাগরে ॥ আলেক সালাম সওদাগর বলে তারে* পির মর্দ্দ বলে ভাই সোন সমাচার ॥ এখানে বসিয়া কাহে কি কাম তোমার * জেনের মকাম এই রাহের কেনারে ॥ ছায়াদার গাছ এই আছে বরাবরে * রাহি মোছাফের যত হৈতে জায় ॥ রাহা হৈতে গাছ দেখে আইসেন হেথায় * দমলিতে বৈসে সেই গাছের তলায় ॥ জেনের ফেরেব হৈতে বড়া দুক্ষু পায় * শুনিয়া এয়ছাই বাত সওদাগর বলে ॥ রাছ বটে এইবাত যে কিছু বলিলে * আমি এই গাছ দেখে ধোকায় পড়িয়া ॥ দম লিতে এইখানে পঙছিনু আসিয়া * যে ছুরাতে সেইখানে খোরমা মাইল ॥ খাইমার দানা জে রূপে ফেলিল* যে ছুরাতে আইল জেন হাতেতে তলতার ॥ যে ছুরাতে কাটীবারে হইল হৈয়ার * যে ছুরাতে আল্লার কছম সে খাইল ॥ যে ছুরাতে ঘর হৈতে ফিরিয়া আইল * পিরমর্দ্দ বলে তুঝে সাবাস হাজার ॥ তুমি যেয়ছা পালিয়াছ সওগন্দ আল্লার হাত ছাড়াইয়া কেবা আইসে জান দিতে ॥ আলবত্তা ফরজ আছে জান বাঁচাইতে * আপনা কারার তুমি করিলে বাহাল ॥ জান জাবে তার নাহি করিলে খেয়াল * দেখি জেন কি করে ছলুক তেরা সাতে ॥ এইখানে রব আমি তামাসা দেখিতে * জতক্ষন জেন না আইসে এইখানে ॥ ততক্ষন না জাইব দোছরা মাকানে * এত বলি

www.pathagar.com

দুইজনে ছিল বাত চিতে ॥ আর এক পির মর্দ্দ আইল সেখানেতে * দুই কালা কোর্ত্তা যে আসিল সাতে তার ॥ সেই গাছ তলে আসি হৈল নমুদার * ছালাম আলেক বাদে পোছে বুড়াপির ॥ তোমরা বসিয়া হেথা কিসের খাতির * পির মর্দ্দ বলে সওদাগরের বয়ান ॥ জেনের ফেরেবে বন্দ আছে এ জাওন * তামাসা দেখিতে আমি আছি এখানেতে দেখি জেন কি করে এ সওদাগর সাতে * সেই বুড়া আসি দম লিয়া নাহি ছিল ॥ আর এক বুড়া আসি তথায় পঙছিল * সাতেতে খচ্চর লিয়া আসি সেখানেতে ॥ দুই পির মর্দ্দে বাত লাগিল পুছিতে * এই সওদাগর কাজে দেলগির হইয়া ॥ এখানে বাসিয়া আছে কিসের লাগিয়া * দুই পির মর্দ্দ বলে সোন নেককার ॥ সওদাগর জে খাতিরে আছে বেকারার * একে২ বুঝাইয়া বলে বাত ॥ সে বুড়া ও বৈসে তবে তাহাদের সাত * আমিও দেখিয়া জাব তামাসা তাহার ॥ দেখি জেন কিবা করে ছলুক এহার * সেইবুড়া সেথা লিয়া নাহি ছিল ॥ আচানক ময়দানেতে গো ব্বার দেখিল * ধুঙা ধুল উড়ে গোবার হইয়া ॥ উচা হৈলজমি হৈতে ঘুরিয়া২ * তাহাদের কাছে আসি গায়ের হইল ॥ এক জেন তারপরে আসি দেখা দিল * বড়া উচা কদ হাতে লাঙ্গা তলওার ॥ আসিয়া দরক্ত নিচে হৈল নমাদার * সওদাগরে আসিয়া সে বলে হাক দিয়া ॥ উঠ তুঝে এখনি জে ডালিব কাটিয়া * জেয়ছা তুমি মারিয়াছ ফরজন্দে আমার ॥ তাহার বদলে তুঝে মারির তলওার * একথা সুনিয়া তবে সেই সওদাগর ॥ আর তিন বুড়া জারা আইল তারপর * সুনিয়া জেনের কথা লাগিল কাপিতে ॥ চারি জন এক সাতে লাগিল কান্দিতে * তাহাদের কান্দিনায় গোল বড় হৈল জঙ্গল ময়দান সব কাপিতে লাগিল * জেন তারপরে আসি ধরে সওদাগরে ॥ হাত ধরি টানিয়া আনিল থোড়া দুরে * চাহে কি কাটিয়া ডালে তলওার মারিয়া ॥ পহে লার বুড়া তাহা দেখে তাকাইয়া * আনিল হরিনী জেবা সাতে আপনার ॥ জেনের কদমে আসি গেরে একেবার * কদম চুমিয়া বলে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ আমার আরজ এক সোন মন দিয়া * এক জারা দের কর গোশ্বাকে থামিয়া ॥ আপনি এনছাফ কর দেলেতে বুঝিয়া * আমার আর মেরা এই হরিনীর বাতা এনছাফ কর বুঝিয়া নেহাত * এই সওদাগরের জে বয়ান হইতে ॥ তাজ্জাব জেয়াদা জদি হয় সব বাতে * তবে সওদাগরের জে তকসির হইবে ॥ তিন ভাগের এক ভাগ রেহাই পাইবে * এয়ছাই সুনিয়া জেন দেলেতে বুঝিয়া ॥ বলিতে বাত এনছাফ করিয়া * এইবাত তেরা আমি করিনু কবুল ॥ মেরা বাত কোন মতে না হবে অদুল * বল দেখি শুনি কেয়ছা হরিনের বাত ॥ অধীন বয়ান করে সোন নেকজাত * পহেলা বুড়ার কেচ্ছা জাহার সাতে হরিনি ছিল* ত্রিপদী * বুড়া বলে নামদার, সোন মেরা সমাচার, তুমি বাদসা জেনের সরদার ॥ করম নজর রাখ* এই জে হরিনি দেখ* বেটী হয় চাচ্চার আমার * আমার কবিলা বিবি* কি বলিব সেই খুবি* সাদি জবে হৈল দুই জনে ॥ বিবির বয়েস তবে* বার বচ্ছরের হবে* খেদমত করিত দেল জানে* দুজনে দেলানি এয়ছা* জাহানের না দেখি তেয়ছা* দেখে মুঝে লাগিল জে ধন্দ ॥ গোজারিয়া গেল সাদি* তিরিস বচ্ছর যদি* না হইল আওলাদ ফরজন্দ* এক ফরজন্দের তরে* হামেসা আরমান মোরে* এক বান্দি খরিদ করিনু * আল্লার কোদরক হৈতে* সে বান্দির সেকমতে, মেরা এক ফরজন্দ দেখিনু * লাড়কা আর বান্দি সাতে* বিবি মেরা বাতে২* আদাওতি রাখে বরাবরে ॥ তার কত দিন পরে* মালুম হইল মোরে*

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. মাছ ধরার জাল শিল্প

এ জেলার অধিকাংশ নিম্ন জলাভূমি নদী-খাল-নাল দ্বারা বেষ্টিত। এখানে এক শ্রেণির ছেলে আছে যারা সারা বছর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মাছ ধরার জাল শিল্প। তারা বিভিন্ন কর্ম নৈপুণ্যতার সাথে নানারকম জাল তৈরি করে থাকে। জাল বিক্রি করে দু'পয়সা উপার্জন করছে। এজন্য মেহারন, মাছুয়াখাল, নায়েরগাঁও প্রভৃতি গ্রামে উল্লেখযোগ্য।

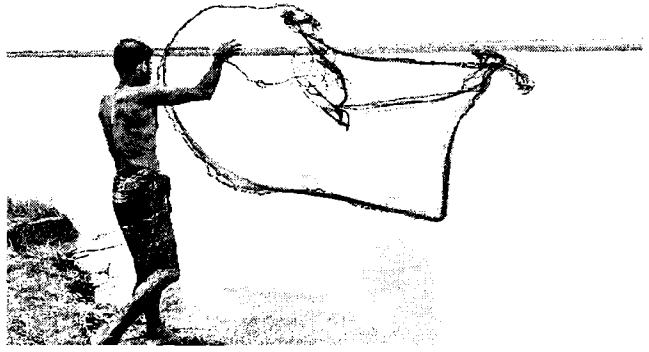

জাল দিয়ে মাছ ধরছেন একজন জেলে

অতীতের মত কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ দেখা না গেলেও কিছু কিছু নমুনা খাট, পালং, দরজা ও গৃহ নির্মাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ এলাকার কাঠমিস্ত্রিরা কাঠ দ্বারা নির্মিত সৌখিন আসবাবপত্রের উপর বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের নকশা ও নমুনা তৈরি করে থাকেন। শুধু তাই নয় তারা বিভিন্ন নৌকা, গৃহ, ছোটো-বড় লঞ্চ, লাঙ্গল ও বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে থাকে। এগুলো নানা কারুকার্যের বৈশিষ্ট্যতার পরিচায়ক। উল্লেখযোগ্য উদ্দমদী, তাতুয়া, বহরী প্রভৃতি গ্রাম। এ এলাকার মসজিদ, মন্দির ও কিছু কিছু অট্টালিকার গায়ে কারুকার্য দেখা যায় তা এলাকার বারগাঁ সহ বিভিন্ন গ্রামের রাজমিস্ত্রিদের হাতের তৈরি। এসব লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নির্দশন।

২. মৃৎ শিল্প

পোড়া মাটির কাজের ঐতিহ্য ও এ জেলায় বহুদিনের। এ জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়লে ভগ্নাবশেষ মৃৎশিল্পের নির্দশন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আশ্বিনপুর,

www.pathagar.com

লাকশিবপুর, পাট ও অন্যান্য গ্রামে মাটি খুঁড়লেই ভগ্নাবশেষ মৃৎশিল্পের স্তর পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাটির কলস, হাঁড়ি-পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ও খিরের পাত্র, মটকা, টেপা, পুতুল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। এখানকার কুমোররা সিদ্ধহস্তে এসব তৈরি করে দু'পয়সা রোজগার করত। সারা বছরই এসব কাজে ব্যস্ত থাকতো। কুমোরদের হাতে তৈরি, ছাইদানি, কলকি, ফুলদানি সৌখিন সামগ্রী এবং নানা ধরনের মাটির তৈরি খেলনা পুতুল বিভিন্ন মেলায় ও পার্বন উৎসবে শোভা পায়। এ উপজেলার পাটন, নায়েরগাঁও, কলাদি, দশপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এসব পোড়া মাটির কুটির গড়ে উঠেছে।

চাঁদপুর জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায় কুমারেরা (কোঁয়ার সম্প্রদায়) রান্নার সরঞ্জাম হাড়ি, পাতিল, চডি, গজি, কত্তি, সানকি, প্রভৃতি তৈরি করত। এদের মধ্যে এক জাতের মৃৎ শিল্পী ছিল তারা ছেলেমেয়েদের জন্য মাটির খেলনা তৈরি করত। তাদের তৈরি মাটির ঘোড়া, গরু, হাতি ও ছোটো ছোটো হাড়ি পাতিল, কাতালি ছেলেমেয়েদের নিকট খুবই প্রিয়। এগুলো সূর্যব্রত, শিবচতুর্দশী, মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে এলাকায় অনুষ্ঠিত মেলায় প্রচুর বিক্রি হয়। উক্ত খেলনাগুলি সাদা, কাল ও লাল রঙ সহ বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা হয়। এলাকার মৃৎশিল্পীরা এখনও মোটামুটিভাবে এ শিল্পের উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। তারা জালের কাঠি তৈরি করে। দধি রাখার পাতিল গোবা তৈরি করে। হাজীগঞ্জের অলিপুর, মতলবের উপাদী, নায়েরগাঁও গ্রামে বর্তমানে কুম্ভকার সম্প্রদায় রয়েছে।

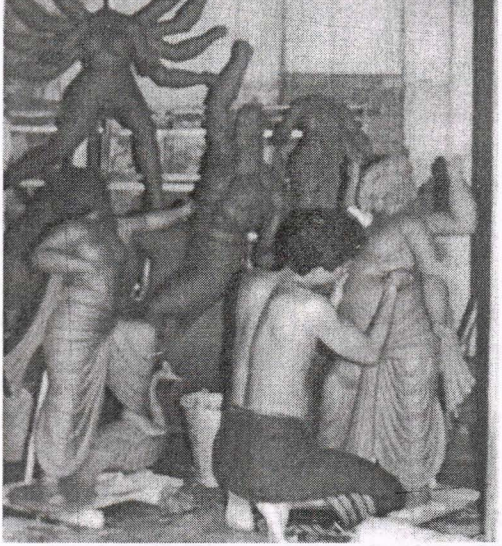

দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন একজন মৃৎশিল্পী (কুম্ভকার)

www.pathagar.com

৩. নকশি কাঁথা

এই আধুনিক যুগেও চাঁদপুর জেলায় নকশি কাঁথার প্রচলন রয়েছে। মতলব, হাজীগঞ্জ, কচুয়ার গ্রামে-গঞ্জে নকশি কাঁথার শিল্পীদের পাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রহ কাজে আমরা শান্তিনগর গ্রামে যাই। সেখানে নক্‌শি কাঁথার শিল্পী রীতা রানী পালের দেখা পাই। তিনি একটি নকশী কাঁথা সেলাই করছিলেন। বাণিজ্যিকভাবেও নক্‌শি কাঁথার প্রচলন রয়েছে। নকশী কাঁথায় নানা নকশা করা হয়।

লামচরী গ্রামে নকশি কাঁথা সেলাই করছেন এক নকশি কাঁথা শিল্পী

৪. বাঁশ ও বেত শিল্প

এ এলাকায় বাঁশ ও বেত প্রচুর না পাওয়া গেলেও যা আছে তা দিয়েই গ্রামীণ পরিবেশে এক ধরনের কুটির শিল্প গড়ে তুলেছে। গ্রামের কর্মজীবীরা বাঁশ ও বেত দ্বারা নানা প্রকার শিল্পসম্মত কর্ম করে থাকে। এ ধরনের কর্মজীবী বলতে যাদেরকে গ্রামীণ ভাষায় ছৈয়াল বলে থাকে, তারা বাঁশ ও বেত থেকে বিভিন্ন রকমের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বের করে মোড়া, চেয়ার নানা আসবাপত্র ছাড়াও গৃহের বেড়া, নৌকার ছই, মাছ ধরার বিভিন্ন ফাঁদ যেমন বেড়, চাই, ওচা, ডুলা, চালুন এবং গরুর মুখ বাঁধবার কাপাইর, কলা, ডালা, পুরা, নানা রঙ্গে রঞ্জিত করে তৈরি করে সাজি, লাই বা ঝুড়ি প্রভৃতি।

বাঁশ ও বেতের তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জাম আমচাই (আনতা), ঢেঁইয়া, বারা, পলো (হ-ল) ইত্যাদি তৈরি হয়। গৃহস্থ পরিবারের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বৈডা, লাই (টুকরী),

www.pathagar.com

আড়ি, সেরী, কুলা-চালনী (চালই), হাতপাখা (বিচইন), হাতা (আ-তা), ধোচনা (চাল ধোয়ার কাজে ব্যবহার হয়), জুঁইর তৈরি হয়। চাঁদপুর জেলার মতলব বাজার, শান্তির হাট, বড়দারগারহাট, নায়ের গাঁও, বাকিলা বাজার, সহ বেশ কিছু হাট-বাজারে এ শিল্পের কারিগরদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয় এবং তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে।

নায়েরগাঁও বাজারে বিক্রির জন্য অপেক্ষমান বেঁত ও বাঁশ সামগ্রী

৫. হোগলা/পাটি

চাঁদপুরের চরাঞ্চল ও চাঁদপুর সদর এবং মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বরিশাল অঞ্চল বিশেষ করে হিজলা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হোগলা পাতাদিয়ে পাটির মতো হোগলা তৈরি করা হয়। জিনিসপত্র প্যাকেজ করা, মসজিদের মেঝেতে বিছানো ও দারিদ্র সম্প্রদায়ের শয্যের উপকরণ হিসাবে হোগলার প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। আমরা ধনার পাড় গ্রামের হোগলা কারিগর নিরঞ্জন সরকার, লামচরী গ্রামের মনোরঞ্জন গোলদারের সাথে আলাপ করে জেনেছে, হোগলা শিল্পের বর্তমানে দুর্দিন চলছে। ইলিশ মাছের প্যাকেজিং বর্তমানে হোগলা পাটি শিল্পকে কোনোরকমে টিকিয়ে রেখেছে।

নারায়ণপুর বাজারে বিক্রির জন্য হোগলা নিয়ে বসে আছেন একজন পাটিয়ালা

www.pathagar.com

৬. শীতল পাটি

এক সময় চাঁদপুর অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মোর্তা গাছ হতো এবং মোর্তা গাছ কেটে তার মসৃণ বেতি দিয়ে শীতল পাটি বোনা হতো। কোনো বাড়িতে মোর্তা বাগান ছিল; পুকুর, দিঘি, খালের পাড়ে প্রচুর মোর্তা গাছ লাগান হতো। মোর্তা মসৃণ পিঠ সম্বলিত অংশ শীতল পাটি, পাখা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় ভাষায় মোর্তাকে মোস্তাক বলে। একটি সম্প্রদায় এই কাজ করত বাণিজ্যিকভাবে। তাদের পাটিয়াল বলতো। মোর্তার অভাবে ও বাণিজ্যিকভাবে বাজার না পাওয়ার কারণে পাটিয়াল সম্প্রদায় তাদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানো সামান্য কিছু মানুষ শিল্পটিকে ধরে রেখেছে।

৭. তাঁত শিল্প

চাঁদপুর জেলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে জিনিসটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এখানকার গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব দ্রব্যই গ্রামের কুটিরে হয়। কুটির শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এসব সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য। এখানকার কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব তাঁতশিল্পে এ জেলার সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক পরিধেয় লুঙ্গি, গামছা ছাপানো কিংবা বিভিন্ন পাড় বিশিষ্ট শাড়ি, মশারীর কাপড়, তোয়ালে ও সাদা কাপড়ের থান তৈরি হয়। সাদা কাপড়ে ছাপার কাজও হয়ে থাকে। এ উপজেলার তাতুয়া, তাঁতখানা, লামছড়ি ও বিভিন্ন গ্রামে উল্লেখযোগ্য তাঁতশিল্প ছিল। তাছাড়া সুতায় রং করা ও সাদা কাপড়ে ছাপানো কারখানাও বিভিন্ন বাজার ও তাঁতুয়া গ্রামে ছিল।

৮. শোলাশিল্প

এ জেলার শোলা ও কাগজের নানা রঙ্গের পুতুল, ফুল টোপর ও ঠোস প্রভৃতি তৈরি করে উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সেসব জিনিস গৃহসজ্জায়, হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বিয়ে অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন পার্বণে ব্যবহার করে থাকে। লামছড়ি, বোয়ালিয়া প্রভৃতি গ্রামে এসবের শিল্প দেখা যায়। এ জেলার কোনো কোনো গ্রামে মেয়েরা কাপড় ও তুলা দিয়ে প্রতীকধর্মী পুতুল করে থাকে। এগুলো আমাদের জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এখানকার গ্রামে গ্রামে নকশী কাঁথা তৈরির রেওয়াজ আজও বিদ্যমান। ঘনঘোর বরষায় যখন চারিদিকে পানি থৈ থৈ করে, মেয়েলোকদের বাইরে কোনো কাজকর্ম থাকে না তখন তারা দাওয়ায় হোগলা, মাদুর বা পাটি বিছিয়ে আপন মনে কাঁথায় বিচিত্র নকশা তোলে সেলাই করে। এ নকশী কাঁথার প্রতিটি ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এখানকার এক একটা পরিবারের জীবন গাঁথা।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

পূর্বকালে চাঁদপুর জেলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর পুরুষেরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরিধান করত। ধনী মুসলমানেরা পাজামা, পাঞ্জাবী পরত ও গরীব মুসলমানরা খালি গায়ে ও খালি পায়ে থাকত। গরীব হিন্দু গামছা পরত, ধনীরা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরত। সকল শ্রেণির মেয়েরা শাড়ি পড়ত। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনে তারা ইউরোপীয় ধাঁচের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানদের পোশাকের মাঝে কোনো প্রভেদ নেই।

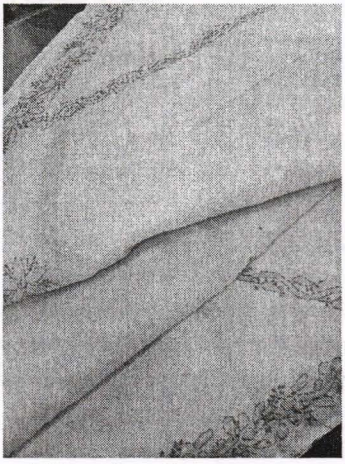

ছেলেরা শার্ট, প্যাট, টি শার্ট ইত্যাদি পরিধান করে। অন্যদিকে নারীরা সালোয়ার, কামিজ, কুতা ইত্যাদি পরিধান করে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

আটচালা ঘর

সেকালে চতুর্দিকে বেড় দেওয়া ভিটায় কুলীন ও বিত্তশালীরা বাঁশের তৈরি আটচালা বসত ঘর নির্মাণ করত। তাতে নাজির খানি বেড়া দেয়া হত। ঘরের স্বাভাবিক চারখানি চালের শীর্ষে ছোটো আকারের চারখানি চাল দিলে আটচালা ঘর নির্মিত হত। সেকালে টিনের আমদানি এদেশে তখনও হয়নি। শন দিয়ে এসব ঘরের ছাউনি দেওয়া হত। বসতঘরের সামনের প্রশস্ত উঠানের একপাশে থাকত ধানের গোলা। অপর পাশে থাকত ঢেঁকিশালা ও দাউরগা ঘর। জ্বালানী কাঠকে দাউরগা বলা হয়। বর্তমানে টিনের ছাউনি দেওয়া আটচলা ঘর দেখা যায়।

চৌচালা ঘর

স্থানীয় বিত্তশালী ও স্বল্পবিত্তের লোকেরা বাঁশের চৌচালা ঘর নির্মাণ করত। তবে বিত্তশালীরা নাজিরাখানী বেড়া দিত সে ঘরে। আর স্বল্পবিত্তের লোকেরা দোয়াধারা, তেয়াধারা বেড়া দিত। একালেও টিনের চৌচালা ঘর তৈরি করতে দেখা যায়। ইটের ঘের ও টিনের ছাউনি দেয়া ঘর দেখা যায়। মাঝেমধ্যে কাঠের চৌকাঠ করা ঘরও পরিলক্ষিত হয়।

একটি চাষি বাড়ির দুইটি চৌচালা টিনের ঘর

দোচালা ঘর

গরীব লোকেরা দু'খানি চালা ও পাটদড়ি বা তরজার বেড়া দিয়ে অল্প খরচে ঘর নির্মাণ করত, এখনও করে।

ঘরের বেড়া

এখানে ঘরের জন্য চার প্রকারের বেড়া তৈরি করা হত। যথা ঃ নাজিরখানি বেড়া, দোয়াধারা বেড়া, তেয়াধারা বেড়া, দঅনা বেড়া।

www.pathagar.com

নাজিরখানি বেড়া

এখানে নাজিরখানি বেড়া ছিল বাঁশ ও বেত শিল্পের উৎকৃষ্ট নির্দশন। নাজিরখানি বেড়া তৈরি হত দেড় ইঞ্চি বেড়ের বাছাই করা মুলি বাঁশ দিয়ে। ঐ বাঁশ দোফলা করে তরজা করলে সে তরজা চ্যাপ্টা হত পৌনে ইঞ্চি। ঐরূপ বাছাই করা বাঁশের তরজা দিয়ে সেকালে নাজিরখানি বেড়া তৈরি করা হত। অতঃপর এ বেড়ার পিঠে প্রথমে প্রস্থে খাড়া করে পাঁচ ইঞ্চি পর পর ফাঁক করে সারা বেড়ায় তিনটি করে বাঁশের শলা বাঁধা হত। লম্বায় ঐ মাপে ফাঁক করে গোয়াড় বাঁধা হত। এর দু'পাশে দুটো করে চারটি বাঁশের শলাকা থাকত। দৈর্ঘ্যের শলাসহ গোয়ার ও প্রস্থের দু'পাশে বাঁশের মলা মিলে সারা বেড়ার পিঠে পাঁচ ইঞ্চি মাপের খোপ তৈরি হত। প্রস্থের শলা ও দৈর্ঘ্যের গোয়ারের সংযোগস্থলে বেত পেঁচিয়ে গিরা দেওয়া হত। সেসব ঘরে শনের ছাউনি দেওয়া হত। সে ছাউনি ১০/১৫ বছর পর্যন্ত টেকসই হত।

দোয়াধারা বেড়া

মোট মুলি বাঁশের তরজা দিয়ে দোয়াধারা বেড়া তৈরি করা হত। বেড়া তৈরির সময় তরজা তেরছা করে দু'তরজা উপরে ও দু'তরজা নিচে দিয়ে এ বেড়া বানানো হয় বলে এর নাম দোয়াধারা বেড়া।

পাটাতন করা চৌকাট ঘর

চাঁদপুর জেলার গ্রাম ও বন্দরগুলো শতকরা সত্তর ভাগ ঘরই হচ্ছে টিন ও কাঠ দ্বারা তৈরি কাঠের চৌকাঠ ঘর। বেড়া ও ছাউনি কাঠের তৈরি চৌকাটের ওপর টিন দ্বারা তৈরি। এই মজবুত ঘরগুলোকে শ্রেণিভাগ করা হয় 'বন্দ' হিসাবে যেমন উন্নিশের বন্দ, একুশের বন্দ, তেইশের বন্দ, সাতাইশের বন্দ, উনত্রিশের বন্দ, সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশের বন্দ। বর্তমানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যোগফল = যেমন ২৩শের বন্দ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য চৌদ্দ হাত প্রস্থ নয় হাত।

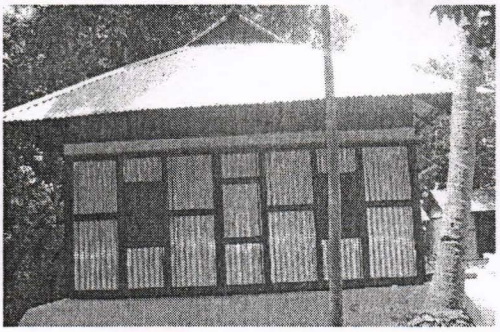

পাটাতন করা চৌচালা টিনের ঘর

দালান ঘর

চাঁদপুর জেলার পল্লি অঞ্চলে এখন প্রায়ই নতুন দালান দেখা যায়। মোট আবাসনের প্রায় ২০ শতাংশই এখন পাকা দালান। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, জাপান, আমেরিকাতে বহু বাঙালি বর্তমানে কাজ ও লেখাপড়ার জন্য প্রবাসী হয়েছে। প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষাধিক। ফলে প্রতিটি গ্রামে বহু আধুনিক দালান কোঠা নির্মাণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

১. বন্দনা সংগীত

চাঁদপুরের লোকসাহিত্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অলিখিত জীবনোপখ্যান। যুগ যুগ ধরে এর বিভিন্ন আঙ্গিকের পরিপুষ্টি সাধিত হয়ে আসছে। চিরায়ত প্রথায় লোকসাহিত্যের রূপায়ণে এখানেও জনজীবনের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। কালপ্রবাহে এখানেও একে একে গড়িয়ে চলে বাংলা সনের বারো মাস। শত শত বছর ধরে লালিত ভাষাজ্ঞান ও কথকতা চলে আসছে নিবিড়ভাবে। কখনো কখনো এ এলাকার মানুষের মাঝে অভাব অনটন থাকলেও আমোদ আহলাদের কমতি ছিল না। ভূখণ্ডটি ছোটো হলেও এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিশাল মেঘনা। মেঘনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা সকল সাহিত্য সংস্কৃতি মতলবেরই সম্পদ। এলাকার মানুষ কখনো উজান (সিলেট) কখনো ভাটি (বরিশাল) তা ধান কাটতো বিরাট বিরাট নৌকা নিয়ে। নৌকায় ইঞ্জিন ছিল না। গুণ টেনে নিয়ে যেত। মনের আনন্দে গুণ টানত আর গান গাইতো। এছাড়াও মেঘনা ও তার শাখা প্রশাখা দিয়ে নৌকা দিয়ে চলার সময় মাঝি মনের সুখে গান গাইত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে-

১. ভাটির দেশে যাও যদি তুমি হিজলতলীর হাটে
সেথায় আমার ভাইজান থাকে
কইও খবর তাহার কাছে মইলাম দুখে মরি
এছাড়া গাইত

২. আমার কাংখের কলসি গিয়াছে ভাসি
মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়ারে-

৩. মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

৪. কইও দুঃখ বন্ধের লাগাল পাইলে গ নিরলে

৫. আমি বইসা রইলাম নদীর কুলে
আমার কেবা পার করে।

এখনকার কিছু খেলাধুলা হাডুডু, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট এবং গান বাজনা, নাটক, থিয়েটার ও যাত্রা এগুলো চলতো বর্ষাকালে এবং শীতে। নাটক বা যাত্রা থিয়েটার শুরুর পূর্বে অর্থাৎ উন্মোচনী পর্বে গাওয়া হতো বন্দনা। বন্দনা হচ্ছে নিয়মিত পদ্ধতিতে লোকসংগীতানুষ্ঠান। কিংবা যাত্রা অনুষ্ঠানে উন্মোচনী পর্বে স্তুতিবাচক সংগীত। বন্দনায় স্থান পায় সৃষ্টিকর্তার মহিমাকীর্তন, পয়গম্বর ও দেব-দেবীর স্তুতি। পীর আওলিয়া ও সাধু-সন্ন্যাসীর গুণগান। ওস্তাদ, গুরু ও পিতামাতার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থ স্থানের তাৎপর্য। এই এলাকার অতীতে যে নাটক বা যাত্রা অনুষ্ঠান হতো তার প্রাক্কালে চারজন মিলে দর্শকদের সামনে মাথা নত করে এই ধরনের বন্দনাসমূহ পরিবেশন করত।

www.pathagar.com

প্রথমে আল্লাজির নাম করিলাম বন্দন ।
দ্বিতীয়ে রসুলের নামে আমেনার নন্দন ॥
তারপরে বন্দি যত পীর পয়গম্বর।
পীরের নামে হইলাম পয়দা ভব দুনিয়ার পর ॥
উত্তরে করিগ বন্দি হিমাইল শহর ।
হিমের পাহাড় যেথা শীতের কহর ॥
আকাশে পাতালে যার আছে যোগাযোগ্
তিনশ ষেষট্টি নাগে দেয় তারে ভোগ ॥
পশ্চিমে করিগ বন্দি মক্কার শহর ॥
যে জাগাতে জন্ম হইছে পীর পয়গম্বর ॥
দক্ষিণে করিগ বন্দি লম লম সাগর।
এই পার থাইক্যা হেই পার যাতে হাজার বছর ॥
পূর্বেতে করিগ বন্দি পূর্ব দিবাকর।
এক দিকে উদিলে পরে চৌদিগে পহর ॥
চাইর দিক বন্দনা কইরা মন করলাম স্থির।
আল্লাহর নামে মাথায় রইলাম ভবের যত পীর ॥
এমিন পরহে কালাম।
দশজনের পায়েতে আমার
হাজার অসালাম ॥
অ মমিন অ
উত্তরে বন্দনা করলাম কালা রাজার মাইয়া
এক তিল জায়গা বাকি নাই তার
দাউদে লাইছে খাইয়া ॥
অ মমিন অ
পূর্বেতে বন্দনা করলাম
পূর্বের ভানুশ্বর ।
এক দিকে যে ওঠে ভানু
চৌদিকে পহর ॥
অ মমিন অ
দক্ষিণে বন্দনা করলাম
লম লইম্যা সাগর ॥
লোহার ডাণ্ডা হেইক্যা মাললে
ছ মাস না লয় ঘর ।
অ মমিন অ

www.pathagar.com

পশ্চিমে বন্দনা কলাম
রসুলের ছাতি ।
যাহার দোয়াতে আল্লায়
স্বর্গে জ্বালায় বাতি ॥
অ মমিন অ
চৌকাণো বন্দনা কাইরা
মইধ্যে করলাম স্থির ।
সোনারগাঁয়ে বন্দনা করলাম পীর ॥
আশি হাজার পীর ॥

২. জারিগান

আকাশে সহস্র তারা চাঁদে রওশন সেই তারা।
মক্কা রওশন হাসান হোসেন বিয়ার রওশন শেওরা ॥
মায়ের রওশন পুত্রধন গ যদি কৃপা কর সাঁই।
দিয়া পুত কারিয়া নিলে মার সমান দুঃখিনী নাই ॥

কাকে কয় কুকিলা রে তোর বদন কেন কালা।
কাসিমকে হরিয়া নিল জয়নবের গলার মালা ॥
সেই অবধি থাকি আমি মদিনায় ফুল বনে।
সে শোকে মোর বদন কালা দুই আঁখি লাল কান্দনে ॥

অ আল্লা এই ভবের বাজারে।
সুখে বিরাজ করে মাওলায় ধন দিয়াছে যারে।
মাওলায় যারে দিছে ধন।
খুশী রাখছে মন
তার ভাবনা নাই অন্তরে।
অরে ধন পাইয়া মন ভুইলা রে রইলা
না চিনলা খোদারে ॥

হায় গরীবের জোংরা নিল কে।
বাঁশ বেত কুরুচ পাতা বহুত লাগাইছে
এমন ভাদর মাইয়া দিনে ভিজ্‌দ পারে কে ॥

আল্লা অ-
এই মদিনা চান্দের বাজার ছিল।
নানাজী রসুলের হাট আল্লায় সে ভাঙ্গিল
ডাক দিয়া কুকিলায় কয় রাইত বুঝি পোষাইল।

www.pathagar.com

ঐ আল্লা রমারম জমাজম কান্দে মাইয়ার মায়।
কার লাইগ্যা পাললাম মাইয়া কেবা লইয়া যায়
না জানি আভাইগ্যার ঝিয়ে কত ছেঁচা খায় ॥

যৎ কাসেম চলিল রণে শিরে শেওরা বান্দিয়া।
গদ্ধমদ্ধ পায়ে ধইরা কয় এ দুলাইন কান্দিয়া ॥
তুমি বিনে এই নিদানে কে হবে বান্ধব আর।
আগবতে নি হবে দেখা দাও সোয়াসী সে করার ॥

হায় ভাতিজী থাউল্যার মা তোর ছাগল
পাইলি কই।
তোর ছাগলে খাইয়া লাইছে আমজাইদ্যার
কলুই
কোপালে থাবরাইয়া মরে আবদুল্লাহর তালই ॥

অ কি আল্লা-
আল্লা রে তোর মহিমা জানে কে।
যে পাইয়াছে নামের ভেদ রে তইর‍্যা গেছে সে
আমি অধমে ডাকি পদ্মছায়া দে ॥

হানিফ কয় আইজ আমি এজিদার যুদ্ধে যাব।
কাটিয়া এজিদের ছের শিয়াল রে খাওয়াব।
তবে আমি আলীর পুত্র এই নাম ধরিব।

হায় হায় কাশিম
মায় তোমারে না দেখিলে বধিব জালিম ॥

হায় হায় সখিনা!
তোমার কোপালের লেখাভাল ত দেখি না ॥

হায় হায় কাসিম রণে চইলা যাও।
সখিনা যে কান্দন করে কুকিলেরি রাও ॥
হায় হায় মালিক।
এই জগতে কেহ নাই তোমার শরীক ॥

রমঝুমাঝুম বাজে রে হানিফার ঘোরার জিন ।
উইর‍্যা কান্দে পশুপক্ষী পানিত কান্দে মীন
বাঘে যেমন ঝম্প দিয়া ধরিল হরিণ।

www.pathagar.com

৩. খোদাতত্ত্ব

রীতিগতভাবে কুমিল্লা জেলার গ্রামাঞ্চল-প্রচলিত খোদাতত্ত্ব গানগুলোও সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস এবং তাঁরই চির রহস্যাবৃত বিধি-বিধান কর্মকান্ড বিষয়ক জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাসৃমদ্ধ। লোকজীবনে মারফতি, মুর্শিদী গানসমূহ প্রভাব বিস্তার করে।

খোদাতত্ত্ব (খোদা ও ভগবানতত্ত্ব)

১. লাগ্ পাবি না অনেক দূরে।
যারে করছ ডাকাডাকি
সে তোর সংগে মাখামাখি
শুধু করছ গলাবাজি
ডাকতে জানলে উত্তর করে ॥

২. মাওলা কে বোঝে তোর লীলা রে ।
কে বোঝে তোর খেলা ॥
আদম নবীকে তুমি বেহেস্তেতে দিলা।
শয়তানের কারণে তারে দুনিয়ায় পাঠাইলা ॥
নুহু নবীকে তুমি পয়গম্বর বানাইলা।
ওম্মতের কারণে তারে জলেতে ভাসাইলা ॥
ইব্রাহিম নবীকে তুমি আগুনে ফালাইলা।
আপনা রহমতে খোদা তাহারে বাঁচাইলা ॥
আইয়ুব নবীকে তুমি বিমারে ফালাইলা।
কুদরতের গুণে মাওলা আসান করিলা ॥
মুসা নবীকে তুমি কহুতরে নিলা।
নূরের আতসে খোদা কহুতর জ্বালাইলা ॥
আখেরী নবীরে তুমি কত দুঃখ দিলা।
আরশে মোবারকে নিয়া সুরত দেখাইলা ॥
এত দুঃখ যারে মাওলা দুনিয়াতে দিলা।
কওসরের পানি দিয়া সরবত খাবাইলা ॥

৪. নবীতত্ত্ব

১. আরব দেশে মানুষ ভেসে এল একজনা ।
তার পায়সে লোহা ঘষলে হইয়া যায় সোনা ॥
দেখ্ যত হাজীর দল
এহরাম বান্ধিয়া চল্
আরব সাগর পার হইলে তুই দেখবি মদিনা ॥
কাবা শরীফের কাছে আব জমজম কুয়া আছে
সেই কুয়ার মধ্যে কেন ডুব দিলি না ॥

www.pathagar.com

মদিনা শরীফের কাছে
স্বর্গের একটি মসজিদ আছে
সেই মসজিদে ইমাম চারজনা ॥
নূরে মোহাম্মদ নবী সাল্লে আলা।
নবী ইসলামের প্রতি
ওম্মতের সারথি
দোজাহানের নবী তরানেওয়ালা ॥
নবী আউয়ালে আহাদ
দোয়ামে আহমাদ
সিয়ামে মোহাম্মদ নবী চাঁদের উজালা ॥
চারামে রাসুল
দোজাহানের মকবুল
রঙ্গিন গোলাপ ফুল পুষ্পমালা ॥

৩. আমার দিলের শামাদানে
জ্বলে মোমের বাতি।
নবীজী গ তোমায় খুঁজি
জেগে সারা রাতি ॥

৪. আতর চন্দন হইতাম যদি রে লাগতাম
বন্ধের গায় ।
ঘামিয়া ঘামিয়া পরতাম দয়াল নবীর পায় ॥

৫. কি ফুল ফুটিল রে মক্কায়
ফুলের গন্ধে
মহানন্দে
উজল খোদার দুনিয়ায় ॥
চাইর তারকার একটি ফুল গ
পাইয়াছিল আবদুল্লায় ॥
ফুল ছিল গ অতি গোপনে
ফুলের সন্ধান কেউ না জানে
ঐ গোপনে ফুলের সন্ধান পাইলে
বিবি আমেনায় ॥

৫. মারফতি

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাঁশরী বাজে।
মুহাম্মদ রাসুলুল্লা দুলা সাজে ॥
সে বাঁশরীর পঞ্চগৎ
শরীয়ত আর মারফত

www.pathagar.com

৬. চারণ কবি সামছুল হক মোল্লার গান

চারণ কবি সামছুল হক মোল্লা ১৯৩৯ সাল থেকেই গলায় হারমোনিয়ার বেঁধে স্বরচিত কবিতা গান দিয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন সরকারের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ও সন্ধ্যাকালীন সময় বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। সাংবাদিকতা পেশায়ও নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছেন। সারাজীবনে প্রায় সহস্রাধিক গান ও কবিতা রচনা করেছেন। তার প্রকাশিত কবিতা ও গানের বই ১০টি। তাঁর লেখা কয়েকটি গান নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো :

আজও মোরা মরিণি

সালাম সালাম, লাখো সালাম, ভাইরা শহিদ একুশের,
তোমাদেরে কোনোদিনই ভুলব না, কেউ এ দেশের।

খুন দিয়েছ, জান দিয়েছ, তোমরা সবে যার লাগি,
সেইত মোরা, আর কেহ নয়, সব হয়েছি তার ভাগী;
আনবই আনব আজাদী মেহনতি সব মানুষের।

জানি মোরা জানি সবই, কেন পরাণ দিয়েছ,
জানি মোরা, জানি কেহ শাহাদাত সে নিয়েছ;
শাহাদাত সে তোমাদেরই— প্রাণ দিতে সব শোষিতের।

প্রাণ দিয়েছ, হারিয়ে গেছ, মরতে তবু দিব না,
পূর্ণ স্বাধিকার ছাড়া আর অন্য কিছু নিব না;
স্বাধিকার সে হবে শুধু শোষিত-নিপীড়িতের।

লাখো লাখো ভাই তোমাদের আজও আছি, মরিনি,
ঠিকই আছি, থাকবও ঠিক, শোষকের পথ ধরিনি;
করব প্রমাণ — আমরাও বাঘ, জ্ঞাতি তাদের, নই মেষের।

লও সালাম

লও সালাম, লও সালাম, সংগ্রামী সালাম,
মুক্তিকামী বীর বাঙালি, মুক্তি-সেনা লও সালাম।
মা-বোনির ইজ্জতেরি নিব মোরা নিব দাদ,
শোষকেরে ধ্বংস ক'রে বাঙলারে করব আজাদ;
যাহা লাগে করব সে ত্যাগ এ দেশের বাঁচাতে নাম।

জোর কদমে এগিয়ে চল, রইব না কেউ পিছনে;
দমব না কেউ, থামব না আর তাদের জুলুম পেষণে;
ত্যাগ স্বীকারে আমরা রাজী— হো'ক যত চরম দাম।

www.pathagar.com

খুনের নদী, লাশের পাহাড়, সামনে আছে জানি সব,
করব খতম আছে যতই নরপশু-দৈত্য-দানব;
মা ও বোনের, বাপ ও ভায়ের করব আদা' প্রাণের দাম।

নিজের হাতে লড়ব মোরা, ভরসা মোদের আত্মবল,
বজ্রমুঠি, শক্তপেশী, লৌহ কঠিন মনোবল
শক্তি মোদের; এসব দিয়েই পুরাবই মনস্কাম।

আমরা ও তোমরা

আমরা আমরাই আমরা
(আর) তোমরা তোমরাই তোমরা ॥
আমরা ও তোমরা যে দুই জাত,
থাকা নাহিত যাবে আর এক সাথ।
ছলে বলে কৌশলে এতদিন
রেখেছিলে এক সাথ তোমরা।

(তাই) তোমরা তোমরাই তোমরা ॥
শোষণই ন্যায়-নীতি তোমাদের,
দরদী মুখেই শুধু আমাদের,
মুখে মিঠা মনে বিষ তোমাদের,
রক্ষক নও, শুধু ভক্ষক,
বুঝে গেছি ষবে আজ আমরা।

(তাই) আমরা আমরাই আমরা ॥
আর না — আর না আর না,
ফাঁকি-বাজী ধোঁকাবাজী আর না,
তোমরা যে দুশমন কার না?
ঠকব না আর বার আমরা।

(তাই) তোমরা তোমরাই তোমরা ॥
তোমাদের ভালোবাসা গোলামী,
আমাদের ভালোবাসা ছালামী।
তোমাদের ভালোবাসা তামামই
আমাদের ধ্বংস ও মৃত্যু।
(তাই) আমরা আমরাই আমরা ॥

www.pathagar.com

ওরে আয়

ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়,
বাংলার বাপ ও মার ভাই ও বোনের,
তর্ তাজা প্রাণ আর তপ্ত খুনের
প্রতিশোধ— প্রতিশোধই নেব সেব আয় ॥
এ দেশেরি লাগি যারা দিয়ে গেল প্রাণ,
এ দেশেরই লাগি যারা হারাইল মান,
(তারা) আর কিছু নয়, শুধু প্রতিশোধই চায়; ওরে আয়
প্রতিশোধ, প্রতিশোধই নেব সবে আয় ॥

এক প্রাণ বিনিময়ে নেব শত প্রাণ;
তাজা খুন বিনিময়ে খুনই প্রতিদান;
জীবনেরে আনবই মৃত্যু ঘায়; ওরে আয়,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধই নেব সবে আয় ॥

মৃত্যুত আসবেই শুধু একই বার,
কিবা লাভ সে মরায় যেন জানোয়ার?
মরেই যে বেঁচে রব এই কামনায় ওরে আয়।
প্রতিশোধ, প্রতিশোধই নেব সবে আয় ॥

খাঁটি মালিক সত্য হাকিম

বিচারপতি, যাদের বিচার করতে তুমি
আজকে হাকিম সেই জনতা।
নাই সেদিন আর সুযোগ তোমার,
আগেই মতই করতে যা' তা'।
বিচারেরই নামে কত করতে প্রহসনই তুমি,
বিশেষ জাতের পশুর মতই তোমার প্রভুর চরণ তুমি,
নির্দ্দোষের শাস্তি দিতে, ভুলেই গেছ সেসব কিতা'।

দেশের খাঁটি মালিক যারা আজকে হাকিম সবাই তারা;
তোদের হবে ফাঁসি, গুলি, তোদের আবাস লৌহ-কারা।
সত্যি করেই বুঝবে আজি সত্য হাকিম দেশের কে তা।

কেবল তুমি নও আসামি, যাদের গোলাম তোমরা ছিলেন,
যাদের কথায় নির্দ্দোষেরে নির্বিচারে শাস্তি দিলে,
তারা ও দোষী, সবার বিচার করবে দেশের সব জনতা।

জনগণই আসল মালিক, আরত শেয়াল নয়রে রাজা,
শোষন ক'রে বাড়লে যতই হ'লে তাগড়া তাজা,

www.pathagar.com

নাই সেদিন আর শোন আগেকার ইচ্ছা মাফিক করতে যাতা।
তোমার তৈরী কারাগারে থাকবে তুমি ঠিক বিচারে,
তোমার পোষ্য জল্যাদেরাই দেবে ফাঁসী ঠিক তোমারে।
পক্ষ-তোষণ করবে না যে, থাকবে না যার উদারতা।

আমরা সৈনিক মুক্তির

আমরা সৈনিক মুক্তির,
(নই) আপোষ আর সন্ধির চুক্তির,
তরে মোরা নই নই সন্ধির।

করব কবরই করব,
এদেশেরে মুক্তই করব,
আপোষেরে পথ নাহি ধরব,
সংগ্রামে জিতবই, করব
বন্ধন মুক্তি বন্দির।

আজাদি সাগর আজ উত্তাল,
ছিঁড়ে যাক তরণীর রশি-পাল;
আমরা যে ধরে আছি কসি' হাল;
দেব পাড়ি পারাবার আজাদির।

জানি কাল বৈশাখী আসবে,
ডুববে না এ তরী ভাসবে।
ভাসবেই, ভাসবেই ভাসবে;
আঁধারের পরে আলো হাসবে,
হাসবেই, হাসবেই, হাসবে;
দুর্দ্দিন হবে শেষ গোলামীর।

মারেফতি গান

(১)

শোন শোন ইয়া ইলাহী, শোন ফরিয়াদ,
শোন—শোন, ফরিয়াদ,
এই দুনিয়া কর প্রভু মানুষের আবাদ,
প্রভু, শোন ফরিয়াদ ॥

আশরাফুল মাখলুকাত তোমার
শুধুই আহাজারি করে—
শোনে না কেউ, কেউ দেখে না,
ঝরছে আঁসু অঝোর ঝরে।
মানুষেরি জুলুম হতে বাঁচাও তাদের কর আজাদ ॥

www.pathagar.com

মসজিদে আর মন্দিরেতে
চল্‌ছে তোমার নামের খেলা,
তোমার নামের মুখোস প'রে
ঘুরছে অসীম ধরম-চেলা।
জালেমেরি জুলুমেতে হচ্ছে যে সবই বরবাদ ॥

আহকামুল হাকেমিন খোদা,
আর বা কত সইবো গো?
এই দুনিয়ায় আর কতকাল
জালেমীরাজ রইবে গো?
জালেমেরি জুলুম হতে বাঁচাও ধরা দাও নাজাত ॥

(২)

আল্লা পাকের দরবারে যার সুপারিশ হবে কবুল,
মনে মুখে লও তাঁরি নাম, তিনি মোহাম্মদ রাছুল ॥

রাহমাতের দরিয়া তিনি, রাহমাতুল্লিল আলামীন,
যাঁর হাতে রয়েছে কামিয়াবী দুনিয়া ও দীন।
লও তাঁরি নাম যা ছাড়া পাবে না কিনা ও কুল ॥

আল্লা ছাড়া নাইকো মাবুদ, নাইকো পরোয়ারদিগার,
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী, আখেরী রাছুল তাঁর ॥
দৌলতে যাঁর এই দুনিয়ার সব মানুষের ভাঙল ভুল ॥

আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ ছাড়ল হিংসা ছাড়ল জেদ,
মানুষে মানুষে কোনো রইলো না আর ভেদ-প্রভেদ।
করল স্বীকার সারা জাহান যিনি শান্তিরই রাছুল ॥

(৩)

বেহেস্তে আজ কে যাবি ভাই, চলরে বেহেস্তেতে চল,
নাই কিছুই তোর? লও শাহাদাত, তাতেই হবি তুই সফল ॥

জালেম শূন্য কর এ ধরা, মাজলুমে ফোটাও হাসি,
'কেউ ছোটো, কেউ বড়ো' ঘুচাও এই বিভেদ সর্বনাশী।
এই দুনিয়ার সব মানুষই একই সমান বলরে বল ॥

কেউ বা নফর জিন্দেগি ভর, কেউ বা বাদশা নামদার,
বলনারে ভাই এ কোন কানুন, বলনারে এ কোন বিচার?
দেরে কোরবান মাল ও তোর জান, এ দান হবেনা বিফল,

www.pathagar.com

মানুষেরে মারতে শুধু চলছে ফন্দি আর ফিকির,
চলছে শুধু আজ দুনিয়ায় জালেমেরি জয়-জিকির।
আয় জেহাদে, নাস্তানাবুদ কর জালেমের শক্তি বল ॥

ক্ষয়-ক্ষতি তোর নাইরে কিছু, নাইরে আফসোস-নাইরে ভয়,
হবি শহিদ, নয়তো গাজী, দুইই সমান, কমতো নয়।
ওরে সৈনিক, বীর মোজাহিদ, মিথ্যারে তুই কর বিকল।

(৪)

আল্লার দাস, বান্দার খাস, উঠ সবে আজ ছাড়রে নিদ,
'নাই কোন রফা জালেমের সনে, মান ইসলামী এই তাগিদ

আল্লার সেরা সৃষ্টি মানুষ, সহে লাঞ্ছনা অত্যাচার,
বল কেবা আজ বাঁচাবে তাদের, বল কেবা তার করে বিচার
এসো জালেমের রচিতে কবর, হও সবে আজ মোজাহিদ ॥

আজি মাজলুম সহে বেমালুম অত্যাচার আর অবিচার,
আকাশে বাতাসে শুনা যায় শুধু আহাজারি আর হাহাকার
লও হাতিয়ার, চল ময়দানে কাঁপাইয়া সবে দশ দিক ॥

সত্যের লাগি' শান্তির লাগি' যারা দেয় জান কোরবান,
তারাই খোদার বান্দা যে সেরা, তারাইত খাস ইনসান।
জালেম-মুক্ত কর এ ধরা, নাশ শাদ্দাদ আর এজিদ ॥

জারি

শোন শোন বন্ধুগণ, শোন সবে দিয়া মন,
লাখে লাখে কি কারণ মানুষ মারা যায়?
গেরাম ছিল সুখের বাসা, পুরাইত মনের আশা,
আজি কেন সর্বনাশা, কি হবে উপায়?
পুকুর ভরা ছিল মাছ, ফলে ভরা ছিল গাছ,
মনের সুখে বার মাস কাটাত যে জন,
মুখের হাসি আজি তার ফোটে না মুখেতে আর,
পেটের ক্ষুধা অনাহার, শেষে হয় মরণ ।
মাঠে মাঠে সোনার ধান বাঁচাইত সবার প্রাণ,
রাখালি ভাইটালি গান ভরা ছিল দেশ,
রঙ তামাসা ছিল কত, খেলাধুলা শত শত,

www.pathagar.com

আজি সবে মরার মত, সবই হল শেষ।
গাঁও গেরামের চাষি ভাই, মুখে কেন হাসি নাই?
তোমার দুঃখ সর্বদাই, সুখ কি নাহি হবে?
সৃষ্টিকর্তা পরোয়ার, হায়াত মউত হাতে যাঁর,
ভরসা উপরে তাঁর করে চল সবে।
পেটের অসুখ জ্বর-বিকারে মরল মানুষ ঘরে ঘরে,
কলেরায় বসন্তে ধ'রে উজাড় করে দেশ,
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করে আপোষ রফায় নাহি পড়ে
টাউটদেরই কথা ধ'রে মামলায় হল শেষ।
খাজনা বাড়ে টাকস বাড়ে, পাওনাদারে নাহি ছাড়ে,
সাট্রিপোটে সবই কাড়ে, যায়রে জাতিমান।
বউয়ের গায়ে কাপড় নাই, ছাওয়াল উপাস, খাবার নাই,
রোগ শোক আর হতাশারই নেয়রে শেষে জান।
পায়ে ফেলে মাথার ঘাম, পায়না চাষি কোনোই নাম।
পাট বেচিয়া মাটির দাম এর বেশি না পায়।
আকের বেলা যায় না বাদ, তামাকেও বাধায় বাধ,
হাসি খুশি স্বাদ আহলাদ নাই, সে অসহায়।
কোট কাছারি আদালতে ভোগছে চাষি শতে শতে,
উকিল মোক্তার মোহরিতে হয় যে দফা শেষ।
একের পরে একটি করে প্রায় দেখা যায় তারিখ পড়ে
বছরের পর বছর ধ'রে হয়না বিচার শেষ।
নিজের জিনিস বেচতে গেলে পানির দামই ভাগ্যে গেলে,
পাল্লা ও বাটখারার খেলে সবই লইয়া যায়।
চাষি যখন কিনতে চায় সস্তা দামে নাহি পায়,
দাম শুনিয়া ভিমরি খায়, কতই অসহায় ॥
মরার মত বাঁচায় ভাই কোনো সুখ বা শান্তি নাই,
হা হুতাসে সর্বদাই কেন দিন কাটাও?
শোন দেশের ভাইরা সবে, বাঁচতে যদি চাওগো তবে,
এক কাতারে দাঁড়াও 'কৃষক সমিতি' বানাও।
সভা কর গাঁয়ে গাঁয়ে, মিলে মিশে সকল ভায়ে,
উঠগো সমিতির নায়ে, তবেই পাবে কুল,
জুলুম শোষণ আর যত কিছু অবিচার,
থাকিবে না কিছু তার, ভাঙবে যত ভুল ॥

২.

মরি হায়রে হায়, দুঃখে হাসি পায়,
স্বাধীন দেশে কাও দেইখ্যা মরতে পরাণ চায় ॥
আস্তে আস্তে মরার চেয়ে হঠাৎ মারা গেলে,

www.pathagar.com

এই দুনিয়ার আজাব হবে তবু রেহাই মেলে।
পেটের খাবার পিঠের কাপড় ছাড়াইত দিন যায়,
তার উপরে 'আরও কিছু' কি লাভ দুনিয়ায়?
কতই ছিল মনে আশা স্বাধীন যদি হই,
ঘুইচা যাবে দুঃখ-দরদ, কিন্তু উপাস রই।
হায়রে দুঃখ কারে কই?
ছেলে মেয়ে তিরি মরল বিনা চিকিৎসায়।
এবার যদি মরি আমি দুঃখ নাইরে তায়॥
লাখে লাখে পরাণ গেল যেই আজাদি চাইয়া
কোটি কোটি মরতে আছে সেই জিনিসটি পাইয়া,
হায়রে, আজাদি স্বাদ খাইয়া।
গোলাম ছিলাম, স্বাধীন হইলাম সুদিনের আশায়,
নছিব দোষে পুড়ছে কপাল, ঠেকছি ভীষণ দায়॥
টকের জ্বালায় ঘর ছাড়িয়া গেলাম রসাল তলে,
এখন দেখি সেই গাছেও শুধুই তেঁতুল ফলে,
হায়রে বরাত করে বলে,
আজাদিত আসছে শুনি এখন সে কোথায়
মরার আগে রূপটি তাহার দেখতে পরাণ চায়॥

৭. মাজারের গান

১.

মুর্শিদ বাবা দেখা দিছে
বুকের কলপে
কথা দিয়াছে বাবায়
স্বপ্নেরই মাঝে।

বাবায় আমায় সোনার বাবা,
পিঞ্জরের ঐ পাখী
ছট ফটায়া মরে বাবায়
শিষ্য গনার লাগি।

বাবা আমার মুর্শিদ বাবা
রূপের ঐ নাগর
জোৎস্না রাইতে কইছে কথা
হইবে নাকি দেখা।

www.pathagar.com

বাবা আমার এমন বাবা
চান্দের ঐ বাত্তি
বুকের মাঝে মিশা আছে
পিঞ্জরের ঐ পাখি।
বাবা আমার দেখা দিবে স্বপ্নেরই মাঝে।

০২.

বাবা তুমি ভাণ্ডারি এ তোমার কেমন নীতি
আউল বাউল ফকির সাইজা
পইরা আছো কোনো জায়গায়।

তোমার নামে সিন্নি দিছে
তোমার কিছু শিষ্য গনায়
তুমি বাবা ভাণ্ডারি করছোনা কেন খবরদারি।

আউল বাউল ফকির সাইজা
পইরা আছো কোনো জায়গায়
ও বাবা ভাণ্ডারি
তুমি সবার গাউছল আযম মাইজ ভাণ্ডারি।

তুমি বাবা ভাণ্ডারি
হও আমাদের কাণ্ডারি
বাবা তুমি গাউছল আজম
মাইজ ভাণ্ডারির।

৩.

বাবা ও বাবা খাজা বাবা,
বাবা তুমি সুরমা দিয়া
আতর মাইরা লুকাইয়া আছ কোনো জায়গায়,
তোমার নেশায় পাগল হইয়া
খুজি তোমার আস্তানায়।

এস

আতর চন্দন গোলাপ জলে
মিশা আছ সবার মনে,

www.pathagar.com

বাবা তোমার দরবার হতে
ফিরবনা আজ খালি হাতে।

সাদা কাপড় বাঁসের পায়ায়
এক চালার এই ঘর বানায়া
শুয়ে আছো আজমীরে,
তুমি বাবা খাজা বাবা
লুকায়া আছো কোনো জায়গায়
বাবা .... ও বাবা .... আমার খাজা বাবা।

৮. বেহুলার গীত

বেহুলা লখিন্দরকে কেন্দ্র করে নির্মিত চমকপ্রদ কাহিনি শত শত বছর ধরে চলে আসছে এ অঞ্চলে। রাত জেগে মানুষ শুনত সে কাহিনি। বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি বয়ান হবে জানতে পেলে গৃহিণীরা চাল, টাকা-পয়সা দিয়ে সহায়তা করত এবং অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহিত করত। প্রাণ চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে ওস্তাদ ছোটো হলদিয়ার আক্কাছ আলী পরিবেশিত একটি গীত উপস্থাপন করা হলো—

আল্লাহ বলরে এইভাবে দিন যাবে না।
চান্দু রাজার ছিল-গ বাড়ি উজানী নগর,
ছয় পুত্র চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে হইল তল-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।
অবশেষে হইছে-গ পোলা সোনার লখিন্দর
রূজা নাহি দিব-গ আমি কালিদা সাগর,
সেই কারণে নিবে-গ পোলা সোনার লখিন্দর-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।
বার বছর কাটে লখিন্দরের লেখিতে পড়িতে,
বার বছর কাটে লখিন্দরের কামার পট্টি গিয়ে-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।
হায়রে তিন বার ছত্রিশ বছর পার হইয়া যায়,
তবু লখিন্দরের বাপ মায় বিয়ে না করায়-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

হায়রে স্বর্গের ওনা দেবী স্বর্গে দিন মন,
আসন গাড়িয়া বসে লখিন্দরের শিতান-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

www.pathagar.com

তোলা পানিতে নাও লখিন্দর তোলা ভাত খাও,
নাহি যাবে শইলের ময়লা এই দুনিয়ার পর,
ছৌলান পানিতে করলে গোসল ময়লা কাইট্যা যায়-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।
তোমার বাবা কাটছে-গ দিঘি শানে বানছে ঘাট,
চার পাড়ে লাগাইয়া গাছ নামে করছে ঠাঁট-
আল্লাহ বললে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

সেই দিঘিতে যাইও-গ তুমি বরশি বাহিতে,
খোদা যে মিলাইয়া দিবে বেহুলার সাক্ষাত-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

স্বপ্ন দেখা-গ যখন শেষ হইয়া যায়,
স্বর্গের-অ দেবী আবার স্বর্গে চইলা যায়-
আল্লাহ বললে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

ঘুম থেকে উঠে লখিন্দর ছটফট ছটফট করে,
কি দেখিলাম কি দেখিলাম রূপের প্রদীপ জ্বলে,
বেহান রাতের স্বপ্নের কথা মিথ্যা নাহি হয়-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

দৌড় দিয়া যায় লখিন্দর মায়ের সামনে,
আড়াই ঘণ্টার দাওগ বিদায় এই দুনিয়ার পর-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।
একই মায়ের একই পুত্র বাবা তুই ভালা তবে,
তোরে নাইকো দিব বিদায় এই দুনিয়ার পরে-
আল্লাহ বলরে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

আমায় যদি না দাও-গ বিদায় এই দুনিয়ার পর,
গলা-য় ছুরি দিয়া মরব তোমার সামনে-
আল্লাহ বললে মনরে এইভাবে দিন যাবে না।

৯. হঁঅলা

বিয়ে শাদি, ছেলেদের খৎনা, মেয়েদের কর্ণছেদন প্রভৃতি আনন্দ-উৎসবে হঁঅলা গাওয়া ও তদ্‌সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এ আনন্দ উপভোগ শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে গৃহস্থ কুমারী কন্যা ও বধূরা অংশগ্রহণ করে। অবশ্য পেশাদার হঁঅলা

www.pathagar.com

গায়িকাও আছে। এখন অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, মাইক, টেপ ইত্যাদির কারণে হঁঅলা গান প্রচলন উঠে গেছে।

বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানে জামাই বউকে নিয়ে কতিপয় লোক মিলে হয়লা গাইতো। চমৎকার সে সারিগান শোনার জন্য লোকজন ভিড় জমাতো। হঁঅলাগুলি ছিল এই রকম—

আচ্ছা রঙ্গে বাজাও-গ বাঁশি
তোমরা যাইতে, নয়াশ্বশুর দেশে।
হায়রে আইর-অ না মাছে গাইর-অ না করে
ছৌলান পানি পাইয়া-
বিবির-অ মায়ে গৌরব-অ করে ভাল দামান পাইয়া
আচ্ছা রঙ্গে বাজারওগ বাঁশি তোমরা যাইতে
নয়া শ্বশুর দেশে।
বাড়ির-অ ধারে আসিয়া ডুলুয়ায় ঢোল মারল বারি,
চমকাইয়া চমকাইয়া উঠেগ সেখানে বিবির মা প-রা-নী-
আচ্ছা রঙ্গে বাজাও-গ বাঁশি তোমরা যাইতে
নয়া শ্বশুর বাড়ি।

দুলাল-আ-মায়ে বাহির হইল ধান-অ দুবলা লইয়া,
দুলাল-অ ভাউজাই বাহির হইল বির কুলা সাজাইয়া-
আচ্ছা রঙ্গে বাজাও-গ বাঁশি তোমরা যাইতে
নয়া শ্বশুর দেশে।
গইন্যা মাছ-অ খায়নারে দামান ঘন ঘন কাটা-
বিবির-অ মারে কই-অ-গ খবর কইতর করত ভাজা
আচ্ছা রঙ্গে বাজাওগ বাঁশি তোমরা যাইতে
নয়া শ্বশুর দেশে।

১০. গজল

গ্রামে এক সময় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না, মতলব সিআরএল হাসপাতাল তখন হয়নি। গজল পরিবেশন করলে দেশ থেকে কলেরা বসন্ত রোগ একেবারে চলে যেত এই বিশ্বাস এলাকার মানুষের ছিল। সাধারণত সন্ধ্যার পর গাওয়া হতো। প্রথমে ১০/২০ জন নিয়ে শুরু করলেও পরে শতেক পঞ্চাশ জন হয়ে যেত। মতলবে এর প্রচলন বেশি ছিল। এই গজলের নেতৃত্ব দিতেন ছোটো হলদিয়ার এলাহী বকাউল ও আব্দুর রব সরকার। তাঁদেরও ওস্তাদ ছিল তাঁরা; এত জমাতে পারেননি। এলাহী বকাউল বয়স্ক লোক ছিলেন, একটু কুঁজো হয়ে সামনে হাঁটতেন, পাশে থাকতেন আব্দুর রব সরকার। সাথে থাকতেন অন্যান্যরা। বলতেন—

বিস্‌মিল্লাহির শির কোরান নূরের পাকতন,
অধমের আরজ আল্লাহ শোন নিরঞ্জন

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তুই বড় হক।
জলিল-অ জব্বার- নাম পাক সোবহান
আল্লাহ্ তুই বড় হক।
আল্লাহ্ তোমার নাম তোমার কাম তোমার মেহেরবানী
দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়েতে পানি,
কলমা লা ইলাহা ইলেল্লাহু।
কুলহুয়াল্লাহু কুলদেরে আল্লাহ কুলে সোবহান,
তোমার বান্দা মুসকিলে পড়ছে করনা আসান-
কলমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
দুনিয়াতে পাপের বোঝা বেশি হইছে তাঁর,
পাপের খাতিরে আইল গজব আল্লাহর
কলমা লাইলাহা ইলেল্লাহু।
দিছ্ বাল্লা দূর কর বাল্লা হকেকর-অ হাকিম
যেই না পথে আনছ বাল্লা সেই না পথে না
কলমা লা ইলাহা ইলেল্লাহু।
কালার উপর ধলারে দলানোর উপর নূর
সেই নূরে পয়দা হইছে মোহাম্মদ রাসূল
কলমা লাইলাহা ইলেল্লাহু।
আলী আলী হযরত আলী দুন্দুলে সোয়ার
ওফার কারণে আলী মারে জুলফুকার
কলমা লাইলাহা ইলেল্লাহু।

আগেকার দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয় করে পড়াতেন-

অধান বানেরে ঢেঁকিতে পাহাড় দিয়া
ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া
অধান বানেরে-

আবার বলতেন-

কাউয়ায় ধান খাইলরে খেদান্যা মানুষ নাই
খাবার বেলায় আছে মানুষ কামের বেলায় নাই
কাউয়ায় ধান খাইলরে-

বিয়ের গীত

বিয়ের সময় বিশেষ করে ছেলে বাড়িতে (ছেলে মেয়ে উভয় বাড়িতে হয়) মহিলারা রাতব্যাপী এ গীত গাইতো। যাদের পরিবার বা গোষ্ঠীতে লোকজন বেশি ছিল এবং গীত জানত। গীত গাওনী ওলারা হায়ার (প্রতিবেশী) হয়ে থাকলে প্রথম রাত পর্যন্ত চলত। গীত গাওয়া না হলে যেন বিয়ের মজাই হচ্ছে না। ছেলে কিংবা মায়ের মা আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে গিয়ে বলল, কিলো বোন কিলো খালা তোরা আসছ না।

www.pathagar.com

যে যে না আসত বল, নে তোদের জন্য আমার ছেলে/মেয়ের বিয়ে ঠেইক্যা থাকত না। ঠমক দিয়া সে চলে আসত। নে নে তোরা যে কয়েকজন আছস তোরাই গা-

ওচানা করিয়া বানাইও টঙ্গি
নেচনা ধইর-অ পি-ই-রা। (২)
বিয়ার দুলা চলিয়া যাইতে
শেররা না ঠেকব চা-লে (২)
একটু না একটু গাং এর মাঝে
বড়না বড় ঢেউ-
সেও (তার) মধ্যে ভিজিয়া গেল
রঙ্গিলা দামানের কোচা (ধূতি)
মেয়ের পক্ষে গীত-
আমার না বাবাজীর বাড়িতে আছে
বাগ বাগিচার বা-গঅ
তারও না ভিতরে শুকাইতে দিমু
রঙ্গিলা দামানের কোচা- (২)

১১. বিয়ের গান

১। সোনার দেশে সোনার কইন্যা
রূপে ঝলমল করে
নীলুয়া বাতাসে কইন্যার
শাড়ির আঁচল উড়ে
সোনার দেশে সোনার কইন্যারে

২। বিয়া বাড়িত নাইচতামরে গেলাম
আহা টেবাইয়া পড়ে মুখের ঘাম

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

ঢোল : এটি চাঁদপুর অঞ্চলের গায়কদের একটি মৌলিক বাদ্যযন্ত্র। ঢোল গানের তাল নিয়ন্ত্রণ করে। কাঠ ও চামড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ঢোল নির্মাণ করা হয়। এ অঞ্চলে অনেক ঢোল নির্মাণের কারিগর রয়েছে। আমরা হরিচরণ মন্ডল, এক ঢোলের কারিগর এর সাথে আলাপ করেছি। তিনি জানিয়েছেন, একটি ঢোল নির্মাণ করতে আম গাছের ৩/৪ হাত মোটা ২/৩ হাত লম্বা কাঠের টুকরা শুকিয়ে চেঁছে খোলস করে নিতে হয়। সর্বশেষ ১/২-৩/৪ ইঞ্চি পুরু রাখা হয় কাঠটিকে। দু'প্রান্তে চিকন ও মধ্য ভাগে মোটা কাঠকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সুন্দর করে রশি ও পিতল বা তামার রিং দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

ঢোল বানাচ্ছেন একজন স্থানীয় কারিগর

তবলা : গানের তাল নিয়ন্ত্রণের জন্য তবলা অপরিহার্য। তবলা কাঠ ও চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। চামড়ার সাহায্যে কাঠের উপর ছানি নির্মাণ করা হয়। রশি দিয়ে ডান ও বাম হাত চালানোর জন্য নির্ধারিত যন্ত্রটিকে টানা দিয়ে রাখা হয় কালো রঙের প্লেট করা হয়। কালো রঙের প্লেট সৃষ্টসুরকে সুন্দর করে তোলে।

মন্দিরা ঃ কাঁসার তৈরি গোলাকার তিন ইঞ্চি বা চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাকির মধ্যভাগে ছিদ্র থাকে, যা রশি দ্বারা সংযুক্ত। এটি একটি লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রটি রশি ধরে মাথা সহ গোটা শরীর ঝুলিয়ে বাজানো হয় যন্ত্রটি।

হারমোনিয়াম : চাঁদপুর জেলায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর হারমোনিয়াম তৈরি হয়। আমরা চাঁদপুরের পুরাণ বাজারের বিশিষ্ট হারমোনিয়াম তৈরির মিস্ত্রি বাবুল চন্দ্র মণ্ডলের সাথে আলাপ করি। তিনি জানালেন, একটি হারমোনিয়াম বানাতে সাত থেকে দশদিন সময় লাগে। সাধারণত হারমোনিয়াম সাইজ ২টি, ৩৭ অথবা ৪২ সাইজ। প্রতিটি ৩৭ সাইজ হারমোনিয়াম বানাতে খরচ পড়ে সাত হাজার টাকা এবং ৪২ ইঞ্চি সাইজের বড় হারমোনিয়াম বানাতে খরচ পড়ে দশ হাজার টাকা।

www.pathagar.com

স্থায়ীভাবে হারমোনিয়াম বানাচ্ছেন একজন হারমোনিয়াম কারিগর

একতারা : প্রাচীন এ বাদ্যযন্ত্রটির একটিই মাত্র তার হওয়ায় একে একতারা বলা হয়। তবে প্রথমদিকে এ বাদ্যযন্ত্রটি একতন্ত্রী বীণা নামে পরিচিত ছিল। ঠিক কখন, কোথায়, কিভাবে একতারার জন্ম, সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য না পাওয়া গেলেও অনেকেরই ধারণা, ফকির লালন সাঁইয়ের হাত ধরেই এ দেশে একতারার চল শুরু। সাধারণত লাউ, কুমড়া, মোটা বাঁশ বা কাঠ ও নারিকেলের খোল কিংবা পিতলের পাতলা আবরণ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে একতারা। তবে এর ওপর-নিচে অবশ্যই খোলা থাকতে হয়। একতারার বৃত্তাকার খোলা মুখের ব্যাস সাধারণত ছয় থেকে সাত ইঞ্চি হয়ে থাকে। এরপর তিন ফুট লম্বা মুলি বাঁশের ওপরের দিকে গিঁট বেঁধে নিচের দিকে এমনভাবে কাটা হয়, যাতে বাঁশ বা কঞ্চিটি চিমটা আকারের হয়। চিমটার নিচের দিকটি খোলটির দুই প্রান্তে শক্ত করে বাঁধা থাকে। তারপর খোলটির তলা চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চামড়ায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করে ছিদ্র দিয়ে সরু পিতল বা লোহা কিংবা ইস্পাতের তার দিয়ে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটি চাঁদপুর অঞ্চলের বাউলদের হাতেই দেখা যায়। বাউল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবি গ্রামাঞ্চলে কিছুকাল পূর্বেও একতারা বাজিয়ে গান করত। গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়ে চাউল সহ অন্যান্য খাবার সামগ্রী সংগ্রহ করত।

ঢাক ও ঢাক বাদ্য : শিবের লীলা বিষয়ক গান চৈত্র মাসের শেষ পনেরো দিন পরিবেশিত হয়। এই পরিবেশনায় ঢাক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাক হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র, যা ধর্ম, উৎসব, জয়যাত্রার সাথে সম্পর্কিত। কালীপূজা, দুর্গা পূজা, সরস্বতি পূজার সময় রাতে–দিনে ঢাক বাজানো হয়। হিন্দু বিয়েশাদী, আনন্দ উৎসবে ঢাক বাজানো অপরিহার্য। সাধারণতঃ ঋষি সম্প্রদায় ঢাক বাজিয়ে থাকে। ঢাক আকারে ঢোলের চেয়ে বড়। কাঠের তৈরি দু'দিক ফাঁকা একটি ড্রাম আকৃতির কাঠামোর দু'পাশের খোলা অংশে চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে ঢাক তৈরি করা হয়। যারা ঢাক বাজায় তাদের ঢাকি বলা হয়। চাঁদপুরে অনেক নামকরা ঢাকী রয়েছেন, তাদের মধ্যে পুরানবাজারের নিরঞ্জন ঢাকী ও নতুন বাজারের শম্ভু ঢাকী খুব খ্যাতিমান। জন্মাষ্টমী ও দোলপূজায়ও ঢাক বাজানো হয়। ঢাকের সাথে আরো দু'টি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়; একটি হচ্ছে ঢোল; অন্যটি পিতলের বা কাঁসার তৈরি স্কুলের বেলের মতো যন্ত্রটিকে বলা হয় কাঁসর। শক্তি পূজায় দিনে রাতে ঢাকের বাদ্য ভক্তবৃন্দকে উজ্জীবীত করে।

www.pathagar.com

লোক উৎসব

চাঁদপুর জেলার মেলাসমূহ বাঙালি জাতির অনেক উৎসব আয়োজনের সঙ্গে মিশে আছে মেলা বা আড়ং- এর ঐতিহ্য। চাঁদপুরেও বেশ কিছু প্রাচীন ও স্বাধীনতাত্তোর কালে সৃষ্ট মেলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উপজেলা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য মেলাসমূহের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো—

চাঁদপুর সদর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসব : বিজয় দিবসকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসব প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে আরম্ভ হয়। চলে এক মাস। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর চাঁদপুর শহর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়। ১৯৯২ সালে ৮ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব আরম্ভ হয়। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলায় মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব রাখা এবং বিশিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা মেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলায় শিশু খেলনা হতে আরম্ভ করে মহিলাদের বিভিন্ন তৈজসপত্রসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। বিজয় মেলা কমিটিই এ মেলার আয়োজক। মেলার মঞ্চে প্রতিদিন আলোচনা সভা ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। জেলার সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঈদ (ঈদ উল ফিতর) : সকালে 'সুগন্ধি' সাবান দিয়ে গোসল করে প্রায় সকলে মাথায় সুগন্ধি তেল মাখেন। নতুন জামাকাপড় নিদেন পক্ষে 'সাফ কাপড়' পরে পুরুষগণ কিশোরদের নিয়ে মসজিদে যান। বাড়িতে 'সেমাই' 'সে'ই হিডা' রান্না করা হয়। নামাজ শেষে সকলে মুরব্বিদের সালাম করেন। মুরব্বীরা ছোটদের 'ঈদী' প্রদান করেন। পুরুষরা পূর্বপুরুষের কবর জিয়ারৎ করেন এবং আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াতে যান। বিকালে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়।

কোরবানি : ঈদের মত সেজেগুজে মসজিদে যান। মসজিদ থেকে এসে সাধারণত সাতভাগে 'কোরবানি দেন। একাকী কোরবানি দেয়াকে 'খোদে কোরবানি' বলে। অনেক ধনী পরিবারে উট দিয়ে কোরবানি দেওয়ার প্রচলন বর্তমান সময়ে চালু হয়েছে। কোরবানির ছদকা মাংসের জন্য প্রায় ধনীবাড়িতে গরীব জনসাধারণের ভিড় লেগে থাকে। কোরবানির দিন সকালে চাউলের রুটি, 'আলবা (হালুয়া) এবং নারকেল দিয়ে মিঠা কুমড়া রান্না করা হয়।

নবীদিবস : ১২ই রবিউল আউয়াল এর সপ্তাহ খানেক আগে থেকে বিভিন্ন মসজিদের উদ্যোগে পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে চাউল, নারকেল, গুড় সংগ্রহ করা হয়। ১২ই

www.pathagar.com

রবিউল আউয়াল সেসব দিয়ে পায়েস রেঁধে সবাই মিলে খাওয়া হয়। মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নবী (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু এবং তাঁর কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে উৎসবটি খ্যাত।

মোসলমানি : ছেলেদের 'খৎনা' 'মোসলমানি' অথবা 'সুন্নত' নামে পরিচিত। ছেলেকে গোসল করানোর দিন উৎসব পালিত হয়। আত্মীয়স্বজন এ উপলক্ষে পিঠা এবং কাপড়চোপড় আনেন। ছেলেকে সামনে 'বারকোশ' সাজিয়ে একটি আসনে বসানো হয়। আত্মীয়রা সেলামি দেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়।

মসজিদে সিন্নি প্রদান : পরলোকগত বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মসজিদে নির্দিষ্ট পরিমাণে সিন্নি প্রদান অনুষ্ঠানে বাড়িতে প্রস্তুত করা চাউলের রুটি ও হালুয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বাজার থেকে কিনে আনা জিলাপি এবং মিষ্টিও বিতরণ করা হয়ে থাকে। বিতরণের আগে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেজবানি : পরলোকগত পিতা-মাতার ও আত্মীয়স্বজনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গরু জবাই করে গরুর গোশত দিয়ে বিশাল খাওয়ার আয়োজন করা হয়। বাড়িতে শামিয়ানা টানিয়ে মিলাদের পরে খাবার বিতরণ শুরু হয়। কোথাও কোথাও সকাল ৯টা থেকে বিকাল অব্দি খাওয়ার পালা চলে।

রথ উৎসব

চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলার অন্তর্গত ১নং সাচার ইউনিয়নের সাচার গ্রামস্থ তৎকালীন হিন্দু জমিদার ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় গঁঙ্গা গোবিন্দ সেন মহাশয় পারমার্থিক ধনার্জনে ব্যাকুল হয়ে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে তীর্থ দর্শনের নিমিত্তে ভারতের শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। গয়া, কাশি ও বৃন্দাবন সহ অনেক তীর্থ পর্যটন শেষে তিনি সর্বশেষ নীলাচলস্থ শ্রীক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম শ্রী হরিকে দর্শনের জন্য আসেন। সেখানে জগন্নাথ দেবের কৃপালাভ ও তার মহাপ্রসাদ সেবন করে পার্থিব জগতের সকল পাপ বিমোচন ও পারলৌকিক মুক্তি লাভের মাধ্যমে নিজ জীবন ধন্য করার প্রত্যাশায় সেন মহাশয়ের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি জগন্নাথ দেবের শ্রী বিগ্রহ দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও জগন্নাথ দেবের দর্শন পেলেন না। হয়তো বা ভক্তের ভক্তি নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই জগন্নাথদেব অপ্রকট রইলেন। জগন্নাথ দেবের দর্শন না পেয়ে সেন মহাশয় তখন অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ও ঘৃণ্য পাপী মনে করে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি জগন্নাথের দেখা না পাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো অন্ন জল গ্রহণ করবেন না। তিনি অনশন করে নিজ দেহ ত্যাগের সংকল্প করলেন। এভাবে তাঁর তিন দিন গত হলো। তাঁর সঙ্গীগন তাঁকে অনেক সান্তনা দিলেও তিনি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। অনাহারে অনিদ্রায় তিনি মৃত প্রায় হয়ে পড়লেন। জগন্নাথ দেব স্বপ্নাদেশে সেন মহাশয়কে বললেন যে, ''আমাকে যে ভক্ত ভক্তি ভরে ডাকে আমি তার হয়ে যাই। আমার ভক্তকে আমি কখনো ছেড়ে যেতে

www.pathagar.com

পারিনা। তুমি শান্ত হও। তুমি স্বপ্নে আমার যে রূপ দর্শন করলে আমি সেরূপেই তোমার নিজ নিবাস সাচারে আবির্ভূত হবো। তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার শ্রী মূর্তি গঠন করবে। আমি সাচারে দারুব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হবো।" জগন্নাথ দেবের শুভাদেশ পেয়ে প্রফুল্ল চিত্তে দেশে ফিরে এসে সেন মহাশয় এ শুভ সংবাদটি সাচার বাসীকে জানান এবং জগন্নাথদেবের শ্রী বিগ্রহ বিনির্মাণের জন্য সাচার গ্রামের রামকান্ত সূত্রধরকে বলেন। রামকান্ত সূত্রধর শ্রী বিগ্রহ নির্মাণে অপারগতা প্রকাশ করলে চাঁদপুর জেলাধীন মতলব উপজেলার অন্তর্গত বোয়ালিয়া গ্রামের সুদক্ষ কারিগর শ্রী কৃষ্ণকান্ত সূত্রধরকে আনা হয়। অতঃপর কৃষ্ণকান্ত সূত্রধর অত্যন্ত সুনিপুণভাবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করেন। গঙ্গা গোবিন্দ সেন মহাশয় শ্রী বিগ্রহ নির্মাণের পাশাপাশি মন্দির নির্মাণের কাজও যথা সময়ে সম্পন্ন করেন। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সেন মহাশয় ৫ জন শিল্পীকে রথ নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেন। শিল্পীগণ হলেন- (১) শ্রী রামকান্ত সূত্রধর (২) শ্রী রামকুমার সূত্রধর (৩) শ্রী কৃষ্ণকান্ত সূত্রধর (৪) শ্রী রামানন্দ সূত্রধর (৫) শ্রী চারু চন্দ্র সূত্রধর। উক্ত শিল্পীগণ নির্ধারিত সময়ে শ্রী রথের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে রথ যাত্রার আগের দিন ১২৭৫ বাংলা সনের ১৬ই আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণ উৎসবের মাধ্যমে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মহা অভিষেক ক্রিয়া সমাপন করা হয়। তার পর মন্দিরের প্রধান সেবক ভক্ত প্রবর শ্রী নরসিংহ পান্ডা কর্তৃক সর্ব প্রথম যখন পূজা করা হয় তখন তিনি শ্রী বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি জগন্নাথ দেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন এবং ঐ দিন অপরাহ্নে কাঁদতে কাঁদতে সেন মহাশয় মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রী বিগ্রহের দিকে তাকালে তিনিও জগন্নাথ দেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হন। এভাবে সাচারে জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে সাচার জগন্নাথ ধামে রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

শিল্পীগণ রথের চার পাশের কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন দেবদেবী, পশু-পাখি, লতা-পাতা, ফুল-ফল প্রভৃতি দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত প্রতিকৃতি অংকন করেন। তাছাড়া কলি যুগে যে সকল সামাজিক অনাচার ও ব্যভিচার হচ্ছে বা হবে তার একটি চিত্র উক্ত রথে শিল্পীগণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যা দেখে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ অত্যন্ত বিমোহিত ও আকৃষ্ট হতেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ যে, আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচিত এবং চাঁদপুরের ঐতিহ্য স্বরূপ উক্ত রথটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পুড়ে ফেলে। এর পর ভক্তরা বাঁশের সাহায্যে রথ নির্মাণ করে রথযাত্রা উদ্‌যাপন করেন। প্রতি বছর রথের দিনে এখানে বিশাল মেলা বসে।

কানফোঁড়ানি অনুষ্ঠান : মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করার পর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলের পরে খাওয়ার আয়োজন করা হয়। ধনী পরিবারে মেয়েদের জন্য নাকফুল ও কানের দুল নিয়ে মেয়ের নানা-নানী অনুষ্ঠানে আসেন। অনেক আত্মীয়

www.pathagar.com

স্বজন চাচা, মামা, খালা-খালু সোনার নাকফুল উপহার দিয়ে থাকেন। অন্যান্য উপহার সামগ্রীও দেওয়া হয়।

বৈশাখী উৎসব : বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বছরই মেহের কালীবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী উৎসব এবং ১ দিনের মেলা উদযাপিত হয়। জানা যায় প্রায় ৫শ বছর যাবত এ মেলা উদযাপিত হয়ে আসছে। মেলা উদযাপন কমিটি উক্ত মেলার আয়োজন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ পীঠস্থান হওয়ায় মেহের কালী বাড়ী সনাতন ধর্মালম্বীদের নিকট বিখ্যাত। এজন্য এ কালী বাড়ীতে মেলারও গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দু, মুসলিম সকল ধর্মের লোকজন একত্রে এ মেলার আয়োজন করে।

ফরিদগঞ্জ উপজেলা

পহেলা বৈশাখের উৎসব : প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক গান্দেরগাঁও নারিকেলতলা নামক স্থানে কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালী পূজা কমিটি'র উদ্যোগে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ১লা বৈশাখে এখানে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে অনুষ্ঠিত মেলায় দেশীয় খাবার এবং মাটির তৈরি পুতুল ও দেশীয় লোক ও কারু শিল্পপণ্য বিক্রি হয়।

আষ্টা মহামায়ার বৈশাখী উৎসব : আষ্টা মহামায়া মন্দির প্রাঙ্গন ও মন্দির সংলগ্ন আষ্টা বাজারে প্রতিবছর ২রা বৈশাখ বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে এ স্থানে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মন্দির কমিটি ও আষ্টা বাজার ব্যবসায়ী কমিটির যৌথ পরিচালনায় প্রাচীনতম এ মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। মেলায় হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের প্রচুর লোকের সমাগম হয়। মেলাতে দেশীয় ঋতু ভিত্তিক ফল, মিষ্টি জাতীয় তৈরি খাবার, মাটির তৈরি পুতুল, দেশীয় লোক ও কারুশিল্পের পণ্য ইত্যাদির দোকান বসে এবং এ সকল পণ্য বিক্রি হয়।

www.pathagar.com

লোকমেলা

বাবুর হাটের বৈশাখী মেলা

চাঁদপুর সদর উপজেলার বাবুরহাট বাজারে স্বল্প পরিসরে প্রতিবছর বৈশাখী মেলা বসে। এটি স্বতঃস্ফূর্ত মেলা। এখানে লোকজ শিল্পের নানারকম পণ্যের পশরা নিয়ে দোকানদাররা বসেন।

বড় স্টেশন মোল হেড চত্বরের ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান ও মেলা

২০১০ ইংরেজি মোতাবেক ১৪১৭ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে চাঁদপুরে সর্বপ্রথম বৃহত্তর কলেবরে বড় ষ্টেশন মোল হেড চত্বরে উদ্‌যাপন করা শুরু হয়। প্রথমে সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের মৃদু বিরোধীতা থাকলেও জেলা প্রশাসকের প্রচেষ্টায় সকলের ঐক্যমতেই চাঁদপুর হাসান আলী মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালীসহ মোল হেড চত্বরে গিয়ে ১লা বৈশাখের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ বৈশাখী অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে জেলা প্রশাসক এবং চাঁদপুর পৌরসভার মেয়রের নেতৃত্বে মোল হেডটি অবৈধ দখল মুক্ত হয়। মেয়র ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে মঞ্চ, মাইক ও প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করেন এবং জেলা প্রশাসক অন্যান্য সকল আয়োজন করে থাকেন। জেলা প্রশাসক ১লা বৈশাখ উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচ হাজার মানুষকে মঞ্চের অদূরে অবস্থিত রেলওয়ে রেস্ট হাউসে পান্তা-ইলিশ খাওয়ানোর ব্যবস্থা নেন। এ পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে ঘিরে ১৪১৭ বাংলা সন থেকে মোল হেড চত্বরে মেলা বসছে। ঐ দিন চাঁদপুর ও তার আশপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ অনুষ্ঠানে ও মেলায় যোগ দেয়। মেলায় খেলনা, পিঠা ও হ্যান্ডিক্রাফট, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়। মেলা মঞ্চে সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া ১লা বৈশাখে চাঁদপুরের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলার আয়োজন করা হয়।

হাইমচর উপজেলা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা

'প্রজন্ম বাংলাদেশ হাইমচর' নামক একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ২০০৭ সাল হতে প্রতি বছর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের সুবিধাজনক একটি সময়ে দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি অত্যন্ত জাঁকজমক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় নাগরদোলা এবং দেশীয় নানাবিধ ষ্টল বসে। প্রতিদিন মেলা মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটকের প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রামাণ্য চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মেহেরনের রথের মেলা

প্রতি বছর মতলবের মেহেরন হিন্দু সম্প্রদায়ের রথযাত্রা উপলক্ষে ঐতিহাসিক মেহেরন রাধকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে রথযাত্রা কমিটি রথ মেলা আয়োজন করে থাকে। মেলায় বিভিন্ন রকমের শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী যেমন মাটির পুতুল, হাঁড়ি পাতিল, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিস পত্র পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী লেংটার মেলা ও অন্যান্য মেলা : মতলব উত্তর উপজেলায় উত্তরাংশ অর্থাৎ মেঘনা ধনাগোদা নদী বেষ্টিত দ্বীপাঞ্চল (মেঘনা নদীর পশ্চিমাংশসহ) ২০০০ সালে 'মতলব উত্তর' উপজেলা নামে নতুন উপজেলা গঠিত হলেও শত শত বছর ধরে এই অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়। গ্রাম বা সমাজ নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু মেলা অনুষ্ঠিত হয় পীর, আওলিয়া, দরবেশ, ফকিরদের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে লেংটা বাবা (সোলেমান শাহ)'র মাজার বদরপুর পুলিশ ফকিরের দরগাহ (গজরা), আইন উদ্দিন শাহ'র মাজার, বড় হলদিয়া মেলা অন্যতম। সবচেয়ে সুপরিচিত হলো লেংটা বাবার মাজারে অনুষ্ঠিত মেলা। সারা দেশ থেকে লেংটা ভক্তবৃন্দ এখানে আসেন। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের ১৮-২১ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন এবং চৈত্র মাসের ১৫-২২ তারিখ পর্যন্ত এই ৮ দিন মেলা চলে। মেলায় যাত্রা ও আকর্ষণীয় সার্কাস দেখানো হয়। মেলায় তাঁত, কামার-কুমারদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি কেনা-বেচা হয় এবং বিভিন্ন প্রকার খেলনা ও হরেক রকমের খাবার পাওয়া যায়। এ ছাড়া ৩০ শে চৈত্র এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এলাকার হাট/ বাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল মেলায় বিভিন্ন প্রকার খাবার, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও খেলনা পাওয়া যায়। বহু পূর্বে রাঢ়ীকান্দি গ্রামে মেলা হতো এবং এ মেলায় ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মেলাটি 'বট' গাছের নিচে অনুষ্ঠিত হতো।

হাজীগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা

এ উপজেলায় হাজীগঞ্জ বাজারের ঐতিহ্যবাহী বালু মাঠ নামক স্থানে প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ১ মাস ব্যাপী এ উপজেলার শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ''মুক্তিযুদ্ধ বিজয় মেলা'' হয়ে থাকে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এখানে শিল্পীদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ছবি, কুটির শিল্পজাত, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এ প্রজন্মের নিকট উপস্থাপন করা হয় বিধায় এটি একটি প্রসিদ্ধ মেলা। সাধারণত স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, হাজীগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া এ উপজেলায় নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ছোটো ছোটো বৈশাখী মেলা হয়ে থাকে।

মেহের কালী বাড়ীর কালীপূজার মেলা

উপমহাদেশের অন্যতম পবিত্র পীঠস্থান মেহের কালীবাড়ি শাহরাস্তি উপজেলা সদরে অবস্থিত। কালী পূজা উপলক্ষে এখানে মাসব্যাপী মেলা ও দিপালী উৎসব উৎযাপিত হয়। বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ মেলা বসে।

মেহের কালী বাড়ীর পৌষ মেলা

মেহের কালীবাড়িতে প্রতি বছরে ৭-১৫ দিন ব্যাপী পৌষ মেলা উদযাপিত হয়। মেলায় বহু লোকের সমাগম ঘটে। মেলায় হস্তশিল্পজাত নানা সামগ্রী বিক্রি হয়।

www.pathagar.com

লোকাচার

চাঁদপুরে বিয়ের অনুষ্ঠান

চাঁদপুরে বিয়ের অনুষ্ঠানে তেলানী (গায়ে হলুদ) থেকে বিয়ে সম্পাদন পর্যন্ত কোথাও কোথাও পুঁথি পাঠের আসর বসত। তেলানীতে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীরা গরু, ছাগল, মোরগ, পোলাউর চাল, মাছ, পিঠা, চিনি ইত্যাদি তেলাই নিয়ে আসত। এসব প্রকারান্তরে কনের বা বরের বাবাকে বিয়ের খরচে সাহায্য করা। তেলানীতে এরা আবার বর বা কনের মুখে মিষ্টি পুরে সামনে রাখা 'ডালাতে' নগদ টাকা মান দিত। বিয়ের আগের দিন বরযাত্রী ও মেহমানদের খাবার যোগাড়ের পালা। বরযাত্রীদের সাধারণত মুরগির রোস্ট, পোলাও, কোরমা, ভাজামাছ, রান্নামাছ, মাংস, লাউ এবং খাবার শেষে দধি ও সর্বশেষ ফিরনি পরিবেশন করা হয়। দধি, ভাজা মাছ ও মাংস ছাড়া চাঁদপুরে কোনো বিয়ের খাবার পরিবেশন কল্পনাও করা যায় না। বিয়ের সময় বর আসে পালকিতে চড়ে। এসব পাল্কি সাইজ অনুযায়ী চার, আট বা বারো বেহারা বহন করে। বরযাত্রী ও বর বসার জন্য বৈঠকখানার ব্যবস্থা করা হয়।

বরের আগমনী বার্তা জানানোর একটি পদ্ধতি আছে। যে পথে বর আসবে বরের আগে আগে ২/৩জন বরযাত্রী আগেই আসবে। তখন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হৈ চে করে ওঠে, "দুলা আইছে, দুলা আইছে।" বর এসে কিন্তু হুট করে বৈঠকখানায় ঢুকতে পারবে না। বর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিজেদের আনা পাটি বা সতরঞ্জি নিয়ে পুকুরের পাড়ে কোথাও নিজেদের পছন্দ মত জায়গায় ডেরা ফেলবে। অবশ্য মুরুব্বি শ্রেণিকে পরম যত্নে ও সসম্মানে কন্যাপক্ষ বৈঠকখানায় অথবা আঙিনায় চেয়ার পেতে বা বিছানা করে বসতে দেবে। বরযাত্রী আসবার সময় কয়েক বিরা (১ বিরা = ৭২টি) পান ও কয়েক পণ (১ পণ = ২০ গণ্ডা) সুপারি কন্যা পক্ষের জন্য মান হিসেবে আনবে। এ পান-সুপারী দিয়ে কনের বাবা সমাজের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বরের আগমন সংবাদ জানাবে এবং সমাজের উপস্থিত সকলের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে বরযাত্রীদের বৈঠকখানায় বসতে দেবে। সবার নিকট অনুমতি পাওয়া না গেলে বরকে নির্ধারিত আসনে যেতে দেয়া হয় না। কোথাও কোথাও এ অনুমতির অভাবে বরযাত্রীকে দীর্ঘ পনের দিন পুকুর পাড়ে ডেরায় কাটাতে হয়েছে। এসব আনুষ্ঠানিকতা সমাপনে কখনও কখনও রাত ২/৩টা বেজে যায়। বরকে উপবেশনের অনুমতি দেয়ার পরও বৈঠকখানায় প্রবেশ পথে বরকে আটকানো হবে। আরম্ভ হয়ে যাবে বরের বুদ্ধিমত্তা যাচাই পরীক্ষা। চটুল বাক্যবাণ ও নানাবিধ শ্লোকে বরকে নাজেহাল করা হবে। এসব পরীক্ষা নেয় শালা-শালী ও তাদের বন্ধুবান্ধব। অবশ্য এসব প্রশ্নের বেশির ভাগ যোগান আসে পেছন থেকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বরকে বৈঠক খানায় ঈশান কোণে বসতে দেয়া হয়। নিতান্ত শান্ত লাজনম্র, মুখে রুমাল গোঁজা, পাগড়ি, শেরওয়ানি, পায়জামা পরা লোকটিই বর। বরযাত্রী উপবেশনের পরপরই খাবার দেয়া হয়। চাঁদপুরে বিয়ে

www.pathagar.com

পড়ানোর আগেই বরপক্ষকে খাওয়ানো রেওয়াজ। প্রথমে বরের সামনে রুমালে ঢাকা শরবত আনা হলো দু'ধরনের। দুধের ও আনারের। একজন এসে একটা শ্লোক বলে গেলে শরবত খাওয়া সম্বন্ধীয়। ব্যস্! আর যায় কোথায়! শরবত আর ছোয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শ্লোকের উত্তর দেয়া না যাবে। জানা না থাকলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এর উত্তর সংগ্রহের জন্য হয়ত ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে, বর খেতে যাচ্ছে না। বাড়িময় হাসির ফোয়ারা ছোটে, বর আটকা পড়েছে। প্রতি পদে পদে এমনিভাবে বরকে অসংখ্য শ্লোকে থেমে যেতে হয়। যেমন পান খেতে দিয়ে বলবে:

পান খাও পণ্ডিত ভাই
কথা কও ঠারে
পান সুপারীর জন্ম কবে
কোন্ কোন্ পরকারে
যে না জানে পানের আদ্য কথা
ছাগল হয়ে চাবায় বনের হারবা পাতা।

আর এর উত্তরে বলতে হবে–

পান সুপারী আছিল পাতালের নিচে
....
মালিনীরা সাত ভাই জমিন করল 'হারা'
সে জমিনে রুইল কাতির্কে গাছে ধরে মাথি।
....

এসব আনুষ্ঠানিকতার জটিলতার জন্য বরকে বরযাত্রীদের থেকে আলাদা খেতে দেয়া হয়। বরকে একটা 'বারকোশে' করে খাবার দেয়া হয়। বর তার ৭/৮ জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একই বারকোশে খেতে বসে।

বরপক্ষকে খেতে দেয়ার সময় থেকে বিয়ে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বহু স্বেচ্ছাসেবী সমস্ত বৈঠকখানা পাহারা দিতে থাকে, যাতে কেউ উঠিয়ে নিতে না পারে। আর বরপক্ষ স্বেচ্ছাসেবীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চামচ, গ্লাস, প্লেট, বিছানার চাদর, তোয়ালে, বালিশ, বালিশের কভার ইত্যাদি নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবে। এটাও ফূর্তির একটা অংশ। এসব জিনিসপত্র কখনও ফেরত চাওয়া হয় না। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, প্রায় অর্ধেক জিনিসই উধাও হয়ে গেছে। এ সময় খাবারের প্রতিযোগিতাও হয়। কে কত খেতে পারে। বরপক্ষের উদ্দেশ্য কন্যাপক্ষ চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করতে না পারলে লজ্জা দেয়া। খাবারের পাট চুকে গেলে আসেন মৌলভি সাহেব, বিয়ে পড়াবেন। তার আগে বরের আনা যাবতীয় জিনিসপত্র পরখ করে নেন উপস্থিত সমাজীরা। প্রত্যেকটি জিনিসের গুণগত মান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হয়। এতে দেশলাই, মোমবাতি, সেফটিপিন, তাগা তেকে শাড়ি গয়না সবই থাকতে হবে। মোমবাতি আনার জন্য বরপক্ষকে তিনমাইল দূরে যেতে হয়েছে, বিয়ে আরও দু'ঘন্টা পিছিয়ে গেছে, এমন ঘটনাও হয়েছে। কনের ওস্তাদ (আরবী শিক্ষক), ধোপা, নাপিত,

www.pathagar.com

স্থানীয় মাদ্রাসা-মসজিদ ইত্যাদির সাহায্যে হিসেবে বরপক্ষকে নগদ টাকা সেলামী দিতে হয়। কন্যাপক্ষকে সবকিছু বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত বরপক্ষের স্বস্তি নেই। কোনো খুঁত ধরে এ চিন্তায়। অবশ্য খুঁত ধরার মধ্যেও আনন্দ আছে যা উপভোগ্য। কেউবলবে, বড় কাপড়ার রং সুন্দর নয়; পায়ের আলতাটা কম দামের; গলার চন্দ্রহারটা তিনতোলার বেশি হবে না; বোলাক্টা পুরান সোনার, এ আবার কেমন জিনিস! এসব না বললে নাকি মেয়ের প্রতি বাপ-মা ভাই-বোনদের দরদ প্রকাশ অপূর্ণ থেকে যায়। কনের বড় ভাই যখন কেঁদে বলবে, আমার আদরের বোনকে এমন সস্তা দামের কাপড় আমি কোনোদিন পরাইনি। চাচা যখন সাশ্রুনয়নে বলবে, আমার ভাইঝির আলতা পায়ে দেয়ার সখ, তাই বলে পঁচা আলতা আনবে? তখন একটা বেদনা-বিমূঢ় দৃশ্যের অবতারণা হয়। বাপ কাঁদে, মা কাঁদে, চাচা এবং ভাইরা কাঁদে। অবশেষে সমাজের উপস্থিত সকলের সম্মতিতে বরপক্ষের আনা জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। চাঁদপুরে ঢাকার মত উকিল বাপের প্রচলন আছে। মেয়ের সম্মতিতে ইসলাম শরীয়ত মতে বিয়ে সম্পাদন হওয়ার পর বরযাত্রীদের অধিকাংশই বিদায় নেন। শুধুমাত্র বর ও বরের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার সাথী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বৈঠকখানায়। বরের শালা-শালীরা বরের জন্য নিয়ে আসে কাজ করা বঁটি-তোলা বালিশের ওয়ার, রুমাল, বিছানার চাদর, পাখা ইত্যাদি। কারণ, বর যে এখন তাদের একান্ত আপনজন। কনের নিজ হাতে তৈরি এসব বালিশের কভার, চাদর ও রুমালে ফুটে উঠে কুমারী মনের গোপন কথাগুলো সুঁইসুতার সূক্ষ্ম-সংক্ষিপ্ত ভাষায়। কোথাও লেখা থাকে 'ভুল না আমায়', কোথায় লেখা থাকে 'যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে', কোথাও কোথাও লেখা থাকে 'সুখে থাক', 'তোমারই আমি' ইত্যাদি। আরো অনেক নিয়ম পালিত হয় বিয়েতে।

বিয়ে হয়ে গেলে অবশেষে বিদায় নেবার পালা। বিদায়কালে কনের হাতে এক মুঠো বীজদান দেয়া হয়। পালকিতে চড়ার সময় ঐ বীজধান ঘরের দিকে ছুঁড়ে মারতে হয়। কনেকে বর কোলে করে পালকিতে উঠাবে। কোথাও কোথাও লজ্জায় বর কনেকে পালকিতে ওঠায় না। সেক্ষেত্রে বরের পক্ষে কোনো নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়রা কনেকে কোলে করে পালকিতে বসিয়ে দেন। বর-কনে দু'জন যায় দু' পালকিতে। কনের সাথে যায় ছোটো ভাই-বোনদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান কিশোর এবং সামর্থানুযায়ী বাঁদী-দাসী। কনের পালকি আগে যায় এবং বরের পালকি অনুগমন করে। পর্দা দেয়া পালকির পাশে পাশে কনের একহাত ধরে বেহারার সাথে হাঁটতে থাকে ঐ কিশোর। লাজনম্র বধু কোনো অসুবিধার কথা ডেকে জানাতে পারবেনা বা জানাবে না। তাই এ ব্যবস্থা। বেহারারা পথ চলতে সারিগানের মতসুর করে 'সাইর' গেয়ে চলে। একজন যখন বলে উঠে, 'চৌধুরী বাড়ির বউ যায়', অন্য বেহারারা দোহারী হিসাবে সমস্বরে বলে উঠে 'রঙের বউ'। এসব সাইর অত্যন্ত সমধুর। আকাশ-বাতাস, বাড়ী-ঘর সবই যেন বলে 'রঙের বউ'। ছোটো ছোটো বাচ্চারও অনুকরণ করে রঙের বউ সাইরে মেতে ওঠে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অতীতস্মৃতি রোমন্থন করে, আর এর সাথে তুলনা করে তাদের হারানো এ দিনটিকে। অবশেষে শত বাধা অতিক্রম করে বিজয়ীর বেশে বর বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে। উঠানে পালকি নামিয়ে বেহারারা সরে যায়, পালকি থেকে প্রথমে বর

www.pathagar.com

নেমে আসে। নেমেই কনের পালকির ওপর জোরে একটা কিল দেয়। এতে বুঝানো হয় যে, আজ থেকে কনের ওপর বরেরই সম্পূর্ণ আধিপত্য। আমাদের এ অঞ্চলে একটা কথার প্রচলন আছে যে, 'বিড়াল' নাকি প্রথম রাতেই মারতে হয়; না হয় মাথায় ওঠে। প্রথমেই কনেকে ভয় দেখানোর জন্য এ ব্যবস্থা। কনেকে পালকি থেকে নামানোর সময় নানান পরীক্ষায় কনেরও বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা হয়। পালকির সামনে একটা পিঁড়িতে একটা বালিশ পেতে তার ওপর জুতো রাখা হয় বেজোড় করে। বালিশের ওপর জুতো পায়ে দেয়া ঠিক নয়। বুদ্ধিমতী মেয়েরা বালিশ সরিয়ে বেজোড়ে ভেঙ্গে জুতো পায়ে দেবে। বউকে একটা কামরায় বসিয়ে বউ এর চারধারে ঘুরে ঘুরে মেয়েরা গীত গায়।

গীত গাওয়ার সময় কনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এ গীত দুটি'র সুরও অত্যন্ত করুণ। গীত দু'টি কনেকে তার বাপের বাড়ির কথা স্মরন করিয়ে দেয়।

এরপর কনের সামনে একই ধরনের সাতটা পাতিলে সাত ধরনের তরকারি রেঁধে ঢাকা অবস্থায় রাখবেন, এর মধ্যে একটা দুধের পাতিল থাকবে। কনেকে বলা হবে একবারেই দুধের পাতিলের ঢাকনা উল্টাতে। যে কনে একবারের চেষ্টায় সফলকাম হয়, সে বউ-এর বুদ্ধিমত্তায় সবাই আনন্দিত হয়। সবার মুখে একই কথা, 'বউ বড় লক্ষ্মী হবে'।

নানা আমোদ-আহ্লাদে বিয়ে বাড়িতে রাত গভীর হয়। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে থাকে শুধু ঠাট্টা মসকরার সম্বন্ধীয়রা আর বরের মা। বর-কনের জন্যে ইতিমধ্যে একটি ঘর সাজানো থাকে। নিতান্তই সঙ্গোপনে কনেকে বরের কক্ষে দিয়ে দেয়া হয়, সাথে দু'গ্লাস দুধ, কিছু মিষ্টি ও পান পাঠানো হয়। বর-কনের ওখানেই বাসর রাত কাটে। সকালবেলা কনের মা-বাবা কুশলাদি নেয়ার জন্য দু'জন লোক পাঠাবেন। মেয়েকে বিদায় করে মা-বাবা বড় উৎকণ্ঠায় রাত কাটান, নানা অজানা আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে। লোক দু'টি খাওয়া-দাওয়া সেরে কনের সাথে দেখা করে কনের কুশলাদি নিয়ে চলে যায়। আবার দুপুর বেলা কনের বাড়ি থেকে দু'জন লোক আসে সাথে সাথে এক বা একাধিক কলসী দুধ ও চিনি নিয়ে। এসব দুধ বরের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীর নিকট বিলি করা হয়। বিকেলবেলা কনে বাপের বাড়ী ফেরে। সেদিন জামাই (বর) কনের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী যায় না। বৌ (কনে) চলে আসার তৃতীয় দিন জামাই সবান্ধব বাড়ি বেড়াতে আসে, সাথে করে নিয়ে যাবে দুধ, চিনি, পান-সুপারী। এ বেড়ানোকে স্থানীয় ভাষায় 'আড়াইদিন্না' বলে। বিয়ের পর থেকে সত্যিকারের খরচ আরম্ভ হয়। তাই প্রবাদ আছে, 'বিয়ের সময় বিয়ে নয়, বিয়ে পর বিয়ে।' আড়াউদিন্যা জামাই শ্বশুর বাড়ি পদার্পণ করে ঐ বাড়িরই কারো মারফত মাথার টুপি খুলে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে পাঠাবে। এ টুপি সালামের প্রতীক। এ টুপিসহ একটা ট্রেতে করে একজন লোক জামাই পক্ষের আনা দুধ, চিনি ও পানসুপারী বাড়ি বাড়ি বিলি করে বেড়াবে। যে যে লোকের কাছে এ টুপি যাবে সে আবার মান হিসেবে ঐ টুপিতে টাকা দেবে। টাকাসহ টুপি জামাইকে ফেরৎ দেয়া হবে। জামাইর কাছে পরে শাশুড়ী পানের বাটা পাঠাবে। ঐ বাটায় আবার টাকা দেয়া থাকবে। একেও মানের টাকা বলে। জামাই ঐ টাকা দ্বিগুন করে দিয়ে শালা শালীদের মান দেবে। ঐ রাতে, সারারাত ভরে পাড়ার মেয়েরা ঐ বাড়ির পিঠা তৈরি করে। পুলি পিঠা, পাক্কন পিঠা, পুয়া পিঠা, রসবড়া

www.pathagar.com

ইত্যাদি হরেক রকম পিঠা তৈরি করা হয়। দশ পনের বিশ পঁচিশ এমন কি কোথাও কোথাও পঞ্চাশ প্রকারের পিঠা তৈরি করা হয়। কনের মায়ের কৌলিন্য প্রকাশ পায় নানা প্রকার পিঠা ও রান্নাবাড়িতে। এসব পিঠা জামাই ও তার বন্ধুবান্ধবের সকালের নাস্তা। এখন অবশ্য এসব প্রচলন নেই।

ধর্মীয়/সামাজিক অনুষ্ঠান, আমোদ-প্রমোদ

বতের ভাত : হিন্দুদের 'বতের ভাত (ব্রতের ভাত) আশ্বিন মাসের শেষ দিনে ভাত রেঁধে কার্তিক মাসের প্রথম দিনে খাওয়া হয়। নতুন হাঁড়ি-পাতিলে সবকিছু রাঁধতে য়।

হরব : চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে 'হরব' বসে।

দোল : বাঁশের তৈরি পিচকারী দিয়ে পানিমিশ্রিত রঙ ছিটানো হয় দোল উৎসবে।

কীর্তন : চাঁদপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চারপ্রকার কীর্তন প্রচলিত আছে।

১. হরিসংকীর্তন : এই সংকীর্তনে ঢোল/মৃদঙ্গ, মন্দিরা এবং কাসা বা ঘন্টা বাজিয়ে গান পরিবেশিত হয়। মূল গায়কের পর দোহারগণ পুনরাবৃত্তি করেন। আসরে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অথবা পারমার্থিক গান গাওয়া হয়। শনিপূজা, কালীপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষে হরিসংকীর্তন গাওয়া হয়।

২. নামকীর্তন : স্রষ্টার বহু নামের মধ্যে কয়েকটি নাম বছাই করে চতুর্প্রহরে (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত), অষ্টপ্রহর (এক সুর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত) অথবা চব্বিশ প্রহর (তিনদিন) শুধু ঐ নামগুলি অবিরাম বিভিন্ন সুরে গাওয়া হয়। যেমন- 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'।

৩. ফটিকীর্তন : বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত ও গীত।

৪. লীলাকীর্তন : বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের পদ সুর অবলম্বনে লীলাকীর্তন পরিবেশিত হয়।

ঢাকবাদ্য : শিবের লীলাবিষয়ক গান চৈত্র মাসের শেষ পনেরা দিন পরিবেশিত হয়।

রামলীলা : বিভিন্ন রামলীলার দল গান, সুরে ও বাদ্য সহযোগে রামের জীবনকাহিনি পরিবেশন করেন।

কুলানি : ভাদ্রমাসে শাইলধান রোপণের শেষে প্রায় প্রত্যেক চাষী পরিবার 'কুলানি' উৎসব পালন করেন। 'কুলানি'তে ছাইন্না পিঠা বানাতে হয়, ছাইন্না পিঠার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে দু'একটি 'ধান' ভরে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

ক্ষীর

চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার একটি বিশেষ দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন হচ্ছে ক্ষীর। মতলবের ক্ষীরের সুনাম সারা বাংলাদেশ জোড়া। গান্ধী ঘোষের ক্ষীর এই কথাটি বহুকাল থেকেই মতলবের পরিচিতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। মতলবের বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে চরাঞ্চলে প্রচুর বিশুদ্ধ দুধ পাওয়া যায়। এই দুধ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় আগুনের তাপে ঘন করা হয়। সামান্য পরিমাণ মাশকলাই ডালের গুড়ার সাথে চালের গুড়া মিশিয়ে এই ক্ষীর তৈরি হয়। ক্ষীরের শতকরা নব্বই ভাগই হচ্ছে বিশুদ্ধ দুধ। সামান্য পরিমাণ চিনি সহযোগে অমৃতসম ক্ষীর তৈরি করা হয়। মতলবের ক্ষীর আজো এর মান ধরে রেখেছে। চরের ঘাস ও নদীর বিশুদ্ধ হাওয়ায় মাঝে পালিত গাভীর দুধ ও মতলব উপজেলার ক্ষীর প্রস্তুতকারী ঘোষদের প্রস্তুতপ্রণালী পণ্যটি মোহনীয় করেছে।

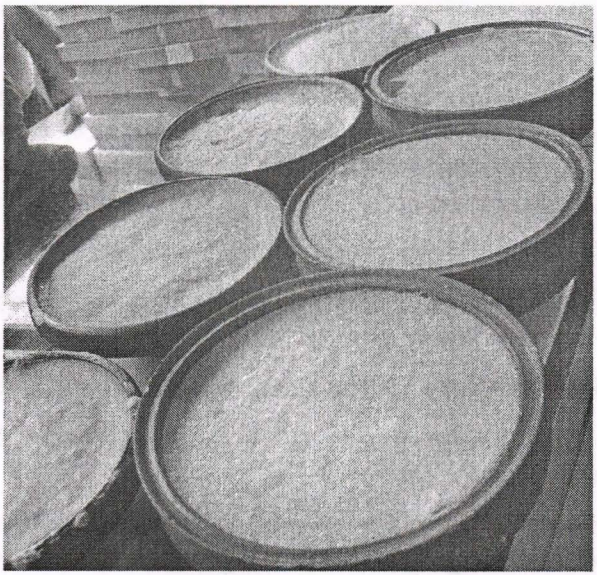

মতলবের গান্ধী ঘোষ বাড়িতে প্রস্তুতকৃত ক্ষীর

তথ্য সূত্র : সজল ঘোষ, মতলব। গান্ধী ঘোষের উত্তরপুরুষ।

খেজুর রসের পায়েস (খেজুর রসের সিন্নি)

চাঁদপুর অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। বর্তমানেও পল্লী অঞ্চলে অনেক গাছ দেখা যায়। অগ্রহায়ন মাসের শেষ দিক থেকে গাছিরা খেজুর গাছ কাটতে শুরু করে। পৌষ-

www.pathagar.com

মাঘ মাস পর্যন্ত খেজুরের রস পাওয়া যায়। খেজুরের রস সুমিষ্ট। শীতকালে গাছ থেকে হাড়ি নামিয়ে, চুলায় ফুটিয়ে রস লালচে রং ধারণ করলেই চিকন আতপ চাউল দেয়া হয়। খেজুর রসের পায়েস (সিন্নি) খুবই মজাদার। খেজুর গাছ ঘিরে একটি একটি গাছি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।

পাটি সাপটা পিঠা

চাঁদপুর অঞ্চলে সুস্বাদু এক ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। ডিম, আতপ চাউলের গুড়া, মিষ্টি সহযোগে আধাতরল মিশ্রণ তৈরি করা হয়। পাত্রে পাটির মতো বিছিয়ে দেওয়া হয় আগুনের আঁচে একটু শক্ত হলেই পাটির মতো ভাঁজ করা হয়।

চিতল পিঠা

নবান্নের সময় নতুন চাউল ঘরে এলেই চাউলের দুড়া, মাঝেমধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে মাটির পাত্রে (খোলায়) আগুনের আঁচ দিয়ে চিতল পিঠা তৈরি করা হয়। খেজুর রসের (আটরশি) সাথে পরিবেশন করা হয়।

ভাঁপা পিঠা

সাদা আতপ চাউলের আধা গুড়া মিশ্রণকে কাপ বা কাপ আকৃতির পাত্রে ঘিরে ছিদ্রযুক্ত পাত্রে রাখা হয় এবং পাত্রে পানি রেখে তার উপর ছিদ্রযুক্ত একটি ঢাকনি রাখা হয়। পূর্বে তৈরি করা এবং কাপে বা অন্য আকৃতির পাত্রে রাখা মিশ্রণটি ছিদ্রের ওপর রাখা হয়। ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসা বাষ্প মিশ্রণটিকে পিঠাতে রূপান্তর করে। মাঝে মধ্যে ভাঁপা পিঠার মাঝে খেজুরের রস ও নারকেলের তৈরি কোয়া দেওয়া হয়।

নারকেলের পুলি পিঠা

আতপ চাউলের গুড়া দিয়ে প্রথমে রুটি বানানো হয়। রুটির মাঝে নারকেল ও গুড়ের তৈরি কোয়া রেখে আর একটি রুটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন আকৃতির পিঠার চারপাশ টিপে বন্ধ করা হয়। ডুবন্ত তেলে আগুনের আঁচে পুলি পিঠা তৈরি করা হয়। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু পুলি পিঠা। নতুন মেহমান বিশেষ করে জামাই আদরের জন্য নারকেল পুলিপিঠার ব্যবহার চাঁদপুর জেলায় এখনো বর্তমান।

মুগ পাক্কন পিঠা

মুগ ডালের গুড়া, আতপ চালের গুড়া ও গুড় দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে পরে মিশ্রণের কাই প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন সাজে তৈরি করে কেটে ডুবন্ত তৈলে মুগপাক্কন পিঠা তৈরি করা হয়। মুগ পাক্কন পিঠা চাঁদপুর অঞ্চলের ঐতিহ্য। অতিথিসেবার জন্য এক অনন্য উপাদান।

অন্যান্য পিঠা :

গোটা পিঠা বা ছাইন্যা পিঠা, পোয়া পিঠা, পাতা পিঠা চাঁদপুর অঞ্চলের লোকখাদ্যের অন্তর্গত ও ঐতিহ্য বাহী।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

দুবাইওয়ালা

চরিত্রলিপি

রহিম, সুন্দরী, খায়ের, হাওয়া বিবি, গেন্দা, রানার,

(পর্দা উঠতেই রহিম মিয়া বাজার হতে পান সুপারী নিয়ে বাড়ীতে আসলো।)

রহিম : কই গেলাগো পুতের বউ,
দরজা খুইলা দেইখা যাও,
শ্বশুর তোমার আইছে বাড়ি,
পান সুপারী নিয়া যাও।

(ছেলের বউ সুন্দরী বিবি একটা হাতল চেয়ার নিয়ে ভিতর হতে বারান্দায় এলো)

সুন্দরী : আসস্যালামু আলাইকুম,
কেমন আছেন শ্বশুর আব্বা,
শরীরটা কি আছে ভালা,
সারা আসমান রোদে ভরা,
গরমটা যে পরছে মেলা।

রহিম আর কইয়না পুতের বউ,
গরম পড়ছে মেলা ঐ,
যেন খৈ ফুটেছে ভাজা ঐ।
শাশুড়ি তোমার গেছে কৈ?
পাখা লইয়া আইতে কও।

সুন্দরী আব্বা, আরাম কইরা বসেন আপনি,
কথা আছে মেলা আজ,
আদম বেপারী দিছে ফাঁক।

রহিম কৈ গেলাগো, কৈ গেলা,
বসব আমি কোন কথায়,
বুকটা আমার ফাইটা যায়,
খবরটা যদি সত্য হয়।

সুন্দরী আব্বা আপনি এবার ঠান্ডা হন,
মাথা আপনার হইছে গরম,
চিন্তা কইরেন না আর তো এখন,

রহিম হতচ্ছাড়ায় করবে ফকির,
মনে মনে করি জিকির।

www.pathagar.com

সুন্দরী : পান সুপারিগুলি আমায় দিন,
ঠান্ডা হইয়া বসেন এখন।

রহিম নিয়া যাও নিয়া যাও,
ভিতরে নিয়া যাও,
হাওয়া বিবি আছে কেমন
একটু কইয়া যাও।

সুন্দরী আম্মা আমার নাই যে ভালা,
মাজার মধ্যে উঠছে ব্যথা,
গরম কাপড়ে দিছে ছ্যাকা,
ব্যথা নাকি কমছে মেলা।

রহিম দিলের মধ্যে পড়ছে কাটা,
বিবি আমার নাইতো ভালা,
আদম বেপারী দিছে ব্যথা,
মনে পড়ছে অনেক কথা।

সুন্দরী আর বলবেন না এত কথা,
আপনার ছেলের নাইতো দেখা,
মনটা আমার করে খাঁ খাঁ

রহিম হতচ্ছারার নাইতো দেখা,
শেষ কইরাছে আমার টাকা।

সুন্দরী : আব্বা এবার শান্ত হন
আমি এবার বিদায় নেই।

(সুন্দরী ভিতরে চলে যায়। খায়ের মিয়া চেয়ার থেকে উঠে টাকার শোকে বুক চাপড়িয়ে গান ধরে।)

খায়ের : বুকটা ফাইটা যায়
আমার বুকটা ফাইটা যায়,
আদম বেপারী টাকা লইয়া চইলা যায়,
ও বুকটা ফাইটা যায়,
আমার বুকটা ফাইটা যায়।
ঝিকিমিকি আলো দেইখা,
টাকা দিছি হাতে তুইলা।
সেই টাকা লইয়া চইল্লা যায়
আদম বেপারী চইলা যায়।
ও বুকটা ফাইটা যায়
আমার বুকটা ফাইটা

(গান শেষ হওয়ার আগে মুহূর্তেই রহিমুদ্দির স্ত্রী হাওয়া বিবি কোমরের ব্যথা নিয়ে মোড়াতে মোড়াতে প্রবেশ করে)

হাওয়া বিবি : কি হইছেগো গোন্দার বাপ,
কেন এত লাপ ঝাপ,

www.pathagar.com

মাজার ব্যথায় জীবন নাশ,
তোমার জ্বালায় সর্বনাশ

রহিম : কথা কইস না মুকপুড়ি
টাকা গেছে হাজার কুড়ি।

হাওয়া বিবি : বুইড়ার উঠছে ভিমরতি,
কথা কয় তিরিশ কুড়ি।

রহিম মায় পোলায় যুক্তি কইরা,
জবাই করছ আমায় ধইরা,

হাওয়া বিবি : বখখিল জামাই বিয়া কইরা,
জীবন হইছে ভাজা ভাজা,
সয়না আমার এমন জ্বালা,
বিষ আইনা দে কয়েক তোলা।

রহিম কুটনি বুড়ির মুখে বিষ,
করে কেবল ফিস ফিস।

হাওয়া : হইছে কি তার খবর নাই,
কেবল করে হায় হায়।

রহিম মুখপড়ি গো মুখপুড়ি,
গেন্দার না কী মাথায় বাড়ি।

হাওয়া কি বললাগো গেন্দার বাপ,
পোলার কত হাক ডাক,

: কেমনে পড়লো মাথায় বাজ?

রহিম : আদম বেপারী দিছে ফাঁক,
টাকা গেছে ঝাঁকে ঝাঁক,
এবার আমি ঘরে যাই,
মাথা আমার ঠিক নাই।
ধিক ধিক ধিক
আদম বেপারীর সব কথাই ধিক।

(রহিমুদ্দিন ভিতরে চলে গেল।)

হাওয়া : ধিক ধিক ধিক
আদম, বেপারীর সব কিছুই ধিক
টাকা দিছি হাজার কুড়ি,
ছেলে দিব বিদেশ পাড়ি,
এখন আমি এ কি শুনি,
মাথায় পড়ল ঝাটার বাড়ি।

গান ও ভ্রমর আদম বেপারীরে কইও গিয়া,
গেন্দার জন্য দিছি টাকা,
সে টাকা যেন দেয় ফিরাইয়া

www.pathagar.com

ও ভ্রমর কইও গিয়া
আগে যদি জানতামরে ভ্রমর
টাকা দিবে মারিয়া
এত যত্ন কইরা আদম বেপারীরে দিতাম না ছাড়িয়া
ও ভ্রমর কইও গিয়া

হাওয়া গেন্দার বাপের হায় হুতাশ ,
জীবন আমার সর্বনাশ।
ঘরে গিয়া দেইখা আসি,
গেন্দার বাপে আছে নাকি।

(হাওয়া বিবি ভিতরে চলে যায় গেন্দার প্রবেশ)

গেন্দা : কইতুরি গো কইতুরি,
কইগো আমার সুন্দরী,
দিমু আমি বিদেশ পারি,
আনব নতুন গহনা শাড়ি।

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী : কুক কুরুতগো কুক কুরুত,
স্বপ্ন হইলো ফুককুরুত।

গেন্দা দুবাই শহর যাব আমি
তোমার জন্য আনব কি,
স্নো, পাউডার, আলতা, সাবান, নীলাম্বরী শাড়ির বাহার,
তোমার জন্য আনবো নি?

সুন্দরী শাড়ি জড়ি আনবা কি,
খবর তুমি রাখছ কি?

গেন্দা খবর তুমি পরে কও,
আগে আমার ফর্দ দাও।

সুন্দরী ফর্দ লেখার দরকার নাই,
আব্বার মাথা ঠিক নাই।

গেন্দা আব্বার মাথা ঠিক হবে
যেদিন আমি বিদেশ যাব।
কইতুরি গো কইতুরি
একটু কাছে আসবানি,
ভালো কইরা দেখব আমি।

সুন্দরী সরম তোমার নাই গো বুঝি,
দিন দুপুরে করছ কি?

গেন্দা বিদেশ আমি চইলা যামু,
তোমায় কি আর কাছে পামু

www.pathagar.com

সুন্দরী : কইও নাগো, কইও না,
ঐ কথা আর কইও না,
গেন্দা আমার প্রাণের প্রাণ,
তোমায় ছাড়া বাঁচবে না আমার জান।

গান

সুন্দরী প্রাণ বাঁচে না সখা আমার,
কেমন একলা রই,
তুমি সখা চইলা গেলে কেমনে কথা কই।
গেন্দা সখি আমার প্রাণের সখি,
তোমায় কইয়া যাই
আমার কথা মনে পড়লে ঘুমের বড়ি খাইও গিয়া যাই।
সুন্দরী : তুমি সখা নিষ্ঠুর বন্ধু কেমন কথা কও
গভীর রাইতে স্বপ্নের মাঝে তুমি দেখা দাও।
গেন্দা আমি সখা তোমার বন্ধু,
আবার বইলা যাই
আমি এবার চইলা গেলে,
কারো সাথে প্রেম কইর না ভাই।
সুন্দরী তুমি যেন কেমন বন্ধু কিছুই বুঝ না,
মনের কথা এত বলি কেন বুঝ না।
গেন্দা বোঝা শুনার কথা আমি আরতো বুঝি না,
দোহাই লাগে আমার অগো চইলা যাইওনা
গান শেষে ওরা ভিতরে চলে যায়। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে রানার)
রানার টুং টুংগা টুং টুং
টুং টুংগা টুং টুং
গেন্দার বাপে আছে নিগো,
আরেকটু দেইখা যান
আপনার পোলার ভিসা আইছে,
এইবার লইয়া যান।
হাঁটতে হাঁটতে বেলা গেল কিছুই পাইলাম না।

(রানার একটু অপেক্ষা করে)

গেন্দার বাপে নাইতো ঘরে ভিসা নিয়া গেলাম চলে,
অফিস থেইকা আনবেন গিয়ে,
আমি কিন্তু গেলাম চলে।

(রানার চলে যেতে নেয়। উইংসের চারদিক হতে চারটি মুখ বেরিয়ে আসে, একে অপরের দিকে ইশারা ইঙ্গিত করে মুখ চারটি ভিতরে চলে যায়। রানার কয়েক পা চলে যেতেই রহিমুদ্দিন প্রবেশ রহিমুদ্দি গান ধরে)

রহিম : যাইওনা যাইওনা রানারগো,
ও রানার যাইওনা চলিয়া।

www.pathagar.com

গেন্দার লাইগা আনছ ভিসা
নিওনা ফিরাইয়া,
রানার..... ও আমার রানার গো।

[রানার ঘুরে দাঁড়ায় এবং গান ধরে]

রানার : যাইমুনা, যাইমুনা, যাইমুনাগো আমি
গেন্দার জন্য আনছি ভিসা নিমুনা ফিরাইয়া,
আমি যাইমু না গো চলিয়া (গান শেষ)

রহিম শোন শোন রানার ভাইবলি যে তোমায়,
গেন্দার আমার যাইবো বিদেশ সুধাই যে তোমায়।

রানার বস্তায় বস্তার টাকা আনবে,
ভরবে বাড়ি গাড়ি,
সোনা দানা আরো আনবে হরেক রকম শাড়ী।
রঙিন বাতি জ্বলবে তোমার সকল ঘরে ঘরে,
পাইক পেয়াদা সালাম করবে মাথা ঝুকে ঝুকে।

রহিম আর কইয়ো না রানার তুমি,
মনে কষ্ট পাই,
কবে আমার আশা পুরবে চিন্তা করি তাই।

রানার চিন্তা করবেন না আরতো এখন,
ভিসা দিলাম ভাই
তাড়াতাড়ি গেন্দায় যেন বিদেশ চইলা যায়

(হাওয়া বিবির প্রবেশ)

হাওয়া : শোন ওগো গেন্দার বাপ বলি যে তোমায়,
গেন্দায় আমার বিদেশ যাবে পরাণ করে হায় হায়।

রহিম : টাকা পয়সা জমি জমা সবই গেছে আজ,
গেন্দা যদি বিদেশ না যায়, পরবে মাথায় বাজ।

হওয়া কেমন ওগো পিতা তুমি,
কেমন আমি মাতা
টাকার জন্য সোনার ছেলের শুনব না আর কথা

রহিম কয়টা বছর ছবুর করে বলব আমি কথা,
গেন্দায় যদি বিদেশ যায়, পাইবা টাকার দেখা।

রানার শোন ওগো গেন্দার মা বলি যে তোমায়,
গেন্দায় যদি বিদেশ যায় কোনো চিন্তা নাই।
বস্তায় বস্তায় টাকা আনব, আনব শাড়ি গাড়ি।
সোনা দানা ঘরে আনবে, আনবে নতুন বাড়ি
রাজপ্রাসাদে থাকবা তোমরা,
শুইবা সোনার খাটে
নীলাম্বরি শাড়ি পইরা ঘুরবা দেশে দেশে।

www.pathagar.com

হাওয়া আর কইওনা রানার ভাই স্বপ্ন দেইখা যাই,
মনটা করে উরু উরু কখন টাকা পাই,
রঙিন কাপড় পইরা আমি ঘুরবো দেশে দেশে,
গেন্দার বাপে কিছু বল্লে ধরব তারে ঠেসে,

(গেন্দা একটা ব্যাগ নিয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য ভিতর হতে আসে)

গান

গেন্দা বিদায় দেন বিদায় দেন পিতাগো
ও পিতা বিদায় দেন আমায়,
বিদেশেতে যামু পিতা বিদায় দেন আমায়,
আমার পিতা পিতা গো।

রহিম বিদায় দিলামগো প্রাণের পুত্র,
ওপুত্র বিদায় দিলাম তোমায়,
লাখে লাখে টাকা দিয়ো আমার ঠিকানায় গো,
ও পুত্র আমার ঠিকানায়।

গেন্দা বিদায় দেন বিদায় দেন মাতাগো,
ও মাতা বিদায় দেন আমায়।
আমার মাতা মাতাগো
সোনার মহর আনতে মাতা
ও মাতা যামু দুবাই শহরে,
আমার মাতা মাতাগো।

হাওয়া বিদায় দিলাম বিদায় দিলাম পুত্রগো
ও পুত্র বিদায় দিলাম তোমায় গো,
আমার প্রাণের পুত্রগো...।
রীতিমত খাওয়া খাইও,
ও পুত্র চইল মনযোগ দিয়া
মায়ের কথা মনে কইর
নীরবে বসিয়া,

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী : যাইও না যাইও না সখা,
ওসখা যাইওনা ছাড়িয়া
আমার সখা সখাগো

গেন্দা কাইন্দ না কাইন্দ না সখীগো,
ও সখী কাইন্দ না তুমি,
তোমার জন্য বিদেশ থেইকা
আনব শাড়ি জরিগো,
আমার সখি সখিগো।

সুন্দরী : ও আমার সখা সখাগো,

গেন্দা : ও আমার সখী সখী গো।

(গানের সাথে সাথে গেন্দা ও রানার যেতে উদ্যত হয়ে কয়েক পা এগুতেই ফ্রিজ)

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু দেশজ খেলাধুলার প্রচলন ছিল। বিগত শতকের চল্লিশ দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে স্থায়ী অন্ন-সমস্যার বদৌলতে চাঁদপুরের আপামর যুবক-কিশোরদের পক্ষে খেলাধুলার চর্চা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেশজ খেলাধুলার চর্চা অনেকাংশে কমে যায়। আর আধুনিক শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভের ফলে শিক্ষিত ও ছাত্রমহলে বিদেশি খেলাধুলার আকর্ষণ ও চর্চা বেড়ে যায়। এখন বিল-পাথারে মাঘ মাস থেকে চলে ইরিধানের চাষ। ছেলে বুড়ো সবাই ব্যস্ত ধান রোপণে, নিড়ানে। এলাকার কিশোররা বিল-পাথারে যেত গরু, বাছুর চরাতে। শুরু হত নানা প্রকার দেশজ খেলাধুলা। তাদের সাথে এসে যোগ দিত উঠতি বয়সের যুবকেরা। জ্যোৎস্না রাতে নিশিরাত পর্যন্ত চলত খেলাধুলা। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টিপাতের আগ পর্যন্ত এলাকার কিশোর-যুবকেরা মত্ত থাকতো খেলাধুলায়। যুগে যুগে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে দেশজ খেলাধুলার রূপ এবং নামেরও পরিবর্তন হয়েছে। বহু খেলাধুলা মানুষ ভুলে গেছে। একখেলা অন্য অঞ্চলে ভিন্ন নামে পরিচিত হত। নিম্নে চাঁদপুর অঞ্চলের খেলাধুলার একটি তালিকা প্রদান করা হলো :

কুস্তিখেলা, গরু বা মহিষের খেলা, গোল্লাছুট, বউছি, দাঁড়িয়াবান্দা, চোখবান্ধা খেলা (কানামাছি খেলা), কড়ি খেলা, জোড় না বেজোড় খেলা, দড়ি খেলা (দড়ি টানাটানি), কুত্ কুত্ খেলা, ডাংগুলি (ডান্ডা গো-লা)

লাঠি খেলা

চাঁদপুরের বিশেষ করে চরাঞ্চলের লাঠিখেলা গ্রামের সাধারণ মানুষের নৈমিত্তিক জীবনের উৎসব। বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে লাঠি খেলার আয়োজন করা হয়। আর লাঠিয়াল দল তাদের বিশেষ পোশাকে গ্রামে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি করে ডাক ভাঙ্গতে থাকেন। তাদের সে ডাক ভাঙ্গার শব্দ শুনে গ্রামের লোকজন এবং আশপাশের গ্রামগুলোতেও লাঠি খেলার সংবাদ প্রকাশ হয়ে যায়।

নির্ধারিত স্থানে মুখোমুখি হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে মূল লাঠি খেলা শুরুর আগে লাঠিয়ালরা যেসব ধ্বনি ও বাক্য ব্যবহার করেন, তা হচ্ছে- 'ও ও ও / তুমি যে কেমন বীর / তা জানবো আমি রে / ও ও ও' এ সময় উঠানে পাটি বিছিয়ে একদল বাদ্যকার ঢোল, করতাল ও কাসার ঘড়া বা কলস বাজাতে শুরু করেন। লাঠিয়ালগণ বিভিন্ন রঙের হাতওয়ালা ও স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে, সাদা রঙের ধুতি বা বর্ণিল ঘাগরার মতো এক ধরনের বস্ত্র পরে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, খালি পায়ে বিভিন্ন রঙের লাঠি হাতে খেলার মাঠে নেমে পড়েন। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে দেহে, পায়ে ও হাতে ছন্দ তুলে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করেন, যা অনেকটা দৈহিক কসরতমূলক নৃত্য। লাঠি খেলার মূল অংশ শুরুর আগেই এই নৃত্য বেশ আকর্ষণীয়। লাঠি খেলার আসরে লাঠিয়ালদের নৃত্যাংশ শেষ হলে শুরু হয় লাঠি খেলার মূল পর্ব, যাকে আক্রমণাত্মক লাঠি খেলা বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাদ্যের তালে তালে একদল আরেকদলকে লাঠির মাধ্যমে আক্রমণ করতে গিয়ে মুখে বলতে থাকেন-'খবরদার', প্রতিপক্ষের লাঠিয়ালরা একইভাবে। প্রতি আক্রমণ করতে গিয়েও বলেন-'খবরদার'। এ ধরনের লাঠি খেলার একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে খেলার মাঝে কোনো লাঠিয়ায়ের গায়ে লাঠির আঘাত লাগলে তাৎক্ষণিকভাবে থেমে যায় বাদ্য বাদন। আসলে, লাঠি খেলায় একপক্ষ তার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে চাইবে ঠিকই, কিন্তু অন্যপক্ষকে তা লাঠি দিয়েই ঠেকাতে হয়, না ঠেকাতে পারলে সে খেলার নিয়ম অনুযায়ী আপনাতেই পরাস্ত হয়ে যায়। তাই লাঠি খেলতে খেলতে কোনো লাঠিয়ালের গায়ে লাঠির আঘাত লাগলে তা খেলা বন্ধ করে দর্শককে জানানোরও একটি রীতি এই খেলার এভাবে বর্তমান রয়েছে।

কুস্তিখেলা

কুস্তি এক ধরনের শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ খেলা। ভারতবর্ষের স্বাধীন নবাব টিপু সুলতানের পতনের পর এই দেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার ও দেহ গঠনের জন্য কুস্তি খেলার প্রচলন হয়েছিল। চাঁদপুরে কুস্তির প্রচলন আগে ছিল। বর্তমানে তা কমে এসেছে।

মোরগ লড়াই

চাঁদপুরের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মোরগ লড়াই একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা। মোরগ লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের আসিল মোরগ। নির্দিষ্ট একটা রেখা টেনে মোরগ দুটি ছেড়ে দেওয়া হয়। দাগের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় দর্শক। প্রতিযোগিতায় লড়াই চলে দুই ঘন্টা। এর মধ্যে কোনো মোরগ মাঠের দাগের বাইরে তিনবার গেলে অন্য মোরগটিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। মোরগ বড়ো হলে পায়ের চার আঙ্গুলের একটি ওপরের একটি আঙ্গুল ওঠে। এই আঙ্গুলটা খুব সুঁচালো এবং ধারালো হয়। মূলত এই আঙ্গুল দিয়েই মোরগ লড়াই করে থাকে। লড়াইয়ের সময় এই আঙ্গুলের আঘাতে অন্য মোরগ ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক সময় মারাও যায়। এদের এই আঙ্গুলটাকে বিশেষ এক ধরনের ছোটো দাস্তানা পরিয়ে সুঁচালো নখ ঢেকে দেওয়া হয়। বৃত্তাকার ঘরে মোরগ দু'টি ছেড়ে দিলেই শুরু হয় লড়াই। একটি অন্যটিকে ঠোকর দিয়ে পায়ে-ডানায় আঘাত করে পরাজিত করার চেষ্টা করে। ক্লান্ত হলে মোরগ দু'টি আলাদা হয়ে যায়।

ঘুড়ি উড়ানো

ঘুড়ি উড়ানো ছিল একসময় চাঁদপুরের ঐতিহ্যবাহী খেলা। নববর্ষের দিনে ঘুড্ডি উড়ানো প্রতিযোগিতা হতো। এখন অনেকটা বদলে গেছে সেই আচার-অনুষ্ঠান। তবে বর্ষবরণের দিনে এখনও চাঁদপুর জেলার কোথাও কোথাও এই ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উড়ানো উৎসব হয়ে থাকে। ঘুড়ি কাটাকাটির মেলা এখনও অনেক জনপ্রিয়। মেলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় ঘুড়িওয়ালাদের। ঘুড়ি কাটাকাটির লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য ঘুড়ি তৈরি করেন নানা উপায়ে শক্তিশালী করে। কাঁচ গুঁড়া করে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে রিল রিল সুতা মানজা দিয়ে ধারালো করেন। কাটাকাটির সময় আকাশ

www.pathagar.com

জুড়ে থাকে শত শত ঘুড়ি। একটি আরেকটিকে ফাইটার প্লেনের মতো ধাওয়া করে। হঠাৎ সুতো কেটে যাওয়া ঘুড়ি কব্জা করতে কঞ্চি এমনকি বাঁশ নিয়েও ছোটে শিশু-কিশোরের দল।

ঘোড়দৌড়

ঘোড়দৌড় চাঁদপুর জেলার অনেক এলাকায়ই একটি জনপ্রিয় খেলা। বৈশাখি মেলার সময় এই খেলার বেশি আয়োজন করা হতো। ঘোড়ার দৌড় মূলত খোলা মাঠে কিংবা প্রশস্ত রাস্তায় অনুষ্ঠিত হতো। মাঠের চারপাশে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে ঘোড়ার দৌড় দেখার জন্য।

ঘোড়দৌড় মূলত কেটি অশ্বারূঢ় খেলা। এই খেলার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ড নির্দেশ করে যে, ঘোড়দৌড় প্রাচীন গ্রিস, ব্যাবিলন, সিরিয়া এবং মিশরে আয়োজন করা হতো। গ্রিক অলিম্পিক ইভেন্ট, রোমান সাম্রাজ্য, রথ এবং মাউন্টে ঘোড় দৌড় ছিল প্রধান শিল্প। অভিজাত ব্রিটিশ সমাজে ঘোড়ার দৌড় জনপ্রিয় ছিল। এ খেলাকে 'রাজাদের খেলা' বলা হতো।

ঐতিহাসিকভাবে, equestrians গেমস এবং ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা যাচাই করা হতো। একসময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ যুদ্ধ করত। সেই দক্ষতা অর্জনের জন্য নিজেরা মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করত। সেই অশ্বচালনা হয়ে উঠল ক্রীড়া। আর এই ক্রীড়া আস্তে আস্তে মানুষের জন্যে বিশেষ বিনোদন হয়ে উঠল। চাঁদপুর জেলার মতলব, হাজীগঞ্জ থানার ঐতিহাসিক অলিপুরে ঘোড় দৌড়ের জন্য প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি লম্বা পথ ছিল। সে পথে এক সাথে ষোলটি ঘোড়া দৌড়াতে পারতো। অলিপুরের প্রতি বাড়িতে জনসাধারণের নিজস্ব ঘোড়া ছিল। বর্তমানে ঘোড়দৌড় প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

হা-ডুডু খেলা

হা-ডুডু খেলারই আধুনিক নামকরণ কাবাডি খেলা। এটি খুবই জনপ্রিয় খেলা। গ্রামাঞ্চলের কোথাও কোথাও এটিকে 'চি' খেলাও বলা হয়ে থাকে। এ খেলায় দুই পক্ষ থাকে। প্রত্যেক দলে সাধারণত ছয় থেকে এগার জন করে খেলোয়াড় থাকে। এটি সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে একটি চিহ্ন দিয়ে এ খেলার সীমানা নির্ধারিত হয়। এ চিহ্ন রেখাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'গাঙ' বলা হয়। এটি সরাসরি নির্দিষ্ট জায়গার মাঝখান দিয়ে টানা হয়। গাঙের এপারে কেজন খেলোয়াড় প্রথম ওপারে 'চি' বা 'ডু' নিয়ে যায়। এটি 'টসে'র পরই হয় এবং এভাবেই খেলা শুরু হয়। 'চি' বা 'ডু' নিয়ে যদি কেউ এক নিঃশ্বাস সময়কালের মধ্যে প্রতিপক্ষের কাউকে স্পর্শ করে আসতে পারে, তাহলে খেলার নিয়মানুযায়ী স্পর্শ করা খেলোয়াড় 'মারা' যায়। অথবা তাকে যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা গাঙের ওপারে আটকে রাখতে পারে, তাহলে সে মারা যায়। আবার পরবর্তী পর্যায়ে কেউ 'চি' নিয়ে গিয়ে যদি কাউকে ছুঁয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে, তাহলে 'মরা শাম' (খেলোয়াড়) জেতা হয়ে যায়। দু'পক্ষই এরকম হতে পারে। এভাবে খেলতে খেলতে যাদের দল নিঃশেষ হয়, তারাই প্রকৃতপক্ষে হেরে যায়। এটি

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে শক্তির খেলা। এবং এতে বিভিন্ন কলা-কৌশল ও ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন। এ অঞ্চলে 'চি' নিয়ে যাওয়ার সময় অনেক রকম ছড়া কাটা হয়। যেমন–

ক. ডক্কু ডক্কু কানাইয়া
নৌকা দিমু বানাইয়া
যদি নৌকা উড়ে
বিয়া দিমু দূরে।

খ. এ তারা ঢুল ঢুল বেতারা ফুল
চম্বা তুল্‌তুল্ বাইগন ফুল।

গ. চি-কুৎ-কুৎ বনের বন
ঘড়ি বাজে টনটন। ইত্যাদি

দাঁড়িয়াবান্ধা

দাঁড়িয়াবান্ধা খেলার প্রতি দলে সাধারণতঃ ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকে। এ খেলা মাঠ বা বিরান জমির এক ধারে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখায় চিহ্নিত থাকে এবং এটিকে আঞ্চলিক ভাষায় 'কোট' বলা হয়। 'কোট' শব্দ সম্ভবতঃ ইংরেজী কোর্ট (court) থেকে এসেছে। কেননা কতকগুলো নির্দিষ্ট কোটের ভিতরেই এ খেলা চলে। 'টস্' এর মাধ্যমে এ খেলা কে আগে খেলবে তা নির্ধারিত হয়। পয়সার এপিঠ ওপিঠই অনেক সময় তার মীমাংসা দেয়। তারপর খেলা শুরু হয়।

খেলা চলাকালে খেলার নিয়মানুযায়ী দলের একজন মারা পড়লে পাট্টি ওঠে যায়। অথবা কেউ সীমানা লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ কোটের বাইরে গেলেও তা ঘটে। তবে এভাবে কোটের রেখার বাইরে চলে যাওয়াকে এখানে 'জল্লা' বলে। আবার অনেক সময় 'কাঁচা-পাকা' হলেও খেলায় বিপত্তি ঘটে। কাঁচা হলো যারা প্রথম খেলা শুরু করে তারাই ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে একটির পর একটি কোট অন্য পক্ষের পাহারা এড়িয়ে পিছনের দিকে যায়। পাকা এর বিপরীত। কাজেই এক দলের এমন দু'জন কোনোক্রমে একই কোটে ঢুকে গেলেই কাঁচা-পাকা' হয় এবং খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন প্রতিপক্ষ সুযোগ পায় এবং এভাবেই খেলাটি চলে। তিন, পাঁচ অথবা সাত পাট্টি খেলার মাধ্যমে এ খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। এ খেলাকে এখানে 'রেডি খেলাও' বলা হয়।

গোল্লাছুট ও বম খেলা

গোল্লাছুট ও বম খেলা প্রায় অনুরূপ খেলা। গোল্লাছুট সাধারণতঃ খোলা মাঠে-ময়দানে খেলা হয়। বম খেলা বাড়ি ঘরে।

গোল্লাছুট খেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। একটি 'গোল্লা' থেকে ছুটে গিয়ে মাঠের বা ক্ষেতের নির্দিষ্ট আইল পর্যন্ত সবাই নিরাপদে পৌছাতে পারলেই একদল জিতে যায়। অথবা দল প্রধান বা রাজা একা মাঠ নিরাপদে পেরুতে পারলেও দলের জিত হয়। আবার রাজাকে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা মারতে পারলেও সবাই মরে যায়। তখন অন্যপক্ষ খেলার চান্স পায়। এভাবেই খেলাটি চলে।

www.pathagar.com

বম খেলায়ও একজন খেলোয়াড় একটি গোলের ভিতর থেকে 'বম' বা শ্বাস নিয়ে বেরিয়ে দূরে অপেক্ষারত কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়কে স্পর্শ করতে ছুটে যায়। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা সাবধানে গা বাঁচিয়ে থাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে। তবে এরই মধ্যে যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দেখতে পায় যে, তার বম বা শ্বাস নিঃশেষ হয়ে গেছে- তখন সবাই তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে কিল-ঘুষি দিতে থাকে। এরপর একজন গোল্লায় যায়। বম দিতে শুরু করে। এইভাবে যে কোনো দলের সব খেলোয়াড় মযে বিপক্ষ দলের জয় হয়।

বউচি খেলা

এটিও গোল্লাছুট ও বম খেলার অনুরূপ। বউচি খেলায় নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটো 'গোল্লা' তৈরি করা হয়। এক গোল্লায় এক পক্ষ থাকে। অন্য গোল্লায় বউ। বউকে ঘিরে প্রতিপক্ষ। কিন্তু তারা সীমানার মধ্যে ঢুকতে পারে না। প্রথম গোল্লা থেকে 'চি' নিয়ে বেরিয়ে 'বউ' এর দল প্রতিপক্ষকে ছুঁতে চেষ্টা করে। না পারলে বউ- এর গোল্লাতে গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। এদিকে প্রথম গোল্লা থেকে আরেকজন খেলোয়াড় 'চি' নিয়ে আসে। এক সময় 'বউ'কে নিয়ে বীরের মতো পথের সমস্ত প্রহরা এড়িয়ে প্রথম দল গোল্লায় চলে আসে। তবে লক্ষনীয় এই যে, যদি কোনো অবস্থায় 'চি' অর্থাৎ শ্বাস শেষ হয়ে যায় বউ-এর দলের কোনো খেলোয়াড়ের এবং তখন যদি প্রতিপক্ষ তাকে স্পর্শ করতে পারে, তবে খেলার নিয়মানুযায়ী বউ এর দলের খেলোয়াড় মরে যায়। এভাবে মরতে মরতেও খেলার হার হতে পারে। অথবা বউকে নিরাপদে অন্য গোল্লায় নিয়ে গেলেও জিত হয়, যে কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি। চট্টগ্রামে এ খেলাকে 'চি-বুড়ি খেলা বলে। এ খেলায়ও ছড়া কাটে। প্রতিপক্ষকে 'চি' নিয়ে স্পর্শ করবার সময় বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় সামনের দিকে এগোয় আর ছড়া কাটে এভাবে :

টিক্ টিক টিকের গুটা
হাতি মারলাম মোটা মোটা
বইশ (মহিষ) মারলাম লাভে
তলোয়ার কাঁপে।
তলোয়ার ভোঁতা
ইস্টিশনের মাথা
হা-ডুডু লতাপাতা
কাল যাব কলিকাতা
গাব না খাইলে খাইবে কি?
গাবের মত মজা কি?

ডাংগুলি

এ খেলা সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে। বাঁশের তৈরি বিশেষ করে 'জিংলা বাঁশ' দিয়েই তৈরি হয় ডাং ও গুলি। ডাং দুই-দেড় হাত লম্বা হয়। আর 'গুলি' সাধারণতঃ এক 'বিঘত' হয়ে থাকে। এ দিয়েই কোনো 'গোপাট' বা বাড়ির ঘাটায়

www.pathagar.com

অথবা কোনো খোলা মাঠেও এ খেলা চলে। দু'জন অথবা এর বেশি নিয়েও এ খেলা চলতে পারে।

একটি ছোট্ট লম্বা চিকন গর্ত খুঁড়ে এর মধ্যে গুলিটি রাখা হয় এবং ডাং দিয়ে এর মাথায় আঘাত করা হয়। এতেই গুলিটি লাফিয়ে ওঠে। এ ওঠার মধ্যে ডাং দিয়ে একে 'বাড়ি' দেয়া হয়। একজন তিনবার এভাবে 'বাড়ি' দেবার চান্স পায়, যদি না সে ইতিমধ্যে দু'দুবার গুলিতে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বারেও যদি গুলিতে আঘাত করতে না পারে, তাহলে সে মরে যায়। অন্যপক্ষ তখন মারার সুযোগ পায়। এছাড়া, ডাং দিয়ে গুলিতে আঘাত করার কালে যদি প্রতিপক্ষ একে লুফে নিতে পারে, তাহলেও সে মরে যায়। অথবা গর্তের ওপর সমান্তরালে বিছানো ডাংটিকে গুলি দিয়ে স্পর্শ করতে পারলেও সে মারা পড়ে।

ডাংগুলির একটু ভিন্ন ধরনের খেলাও এখানে প্রচলিত আছে। নিয়মটি এই রকম ডাংগুলিতে আঘাত করার পর প্রতিপক্ষ অপর পক্ষের নির্দিষ্ট বিন্দুতে অন্য একটি খাড়া ডাংকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে। এদিকে অন্যপক্ষ এটিকে ফেরাতে চেষ্টা করে। কোনো সময় যদি গুলিটা গর্তে পোঁতা-ডাং এর অন্তত এক হাতের মধ্যে এসে পড়ে এবং স্থায়ী হয়, তখন অপর পক্ষ মরে যায়। এবার প্রতিপক্ষ খেলার সুযোগ পায়। এ খেলায় একপক্ষ অপর পক্ষের গুলিটা ফেরাতে পারলে এর দূরত্ব ডাং দিয়ে মাপা হয় এইভাবেঃ এক্কা, দুক্কা, তেনা, ছারা, পাঞ্চা, ছুইল, বইল, কদম, গুট, গাইয়া। 'গাইয়া' হলেও একজন দু'বার মারার সুযোগ পায়। এ খেলাকে কোনো অঞ্চলে ডাংটুকু, কোনো অঞ্চলে ট্যামডাং, আবার কোনো অঞ্চলে 'কেটবাড়ি' খেলা বলে। শহরগুলিতেই এর নাম ডাংগুলি।

ঘুঁটি -দাড়া

ঘুঁটি-দাড়া বা দাড়া-ঘুঁটি খেলায় দুইটি পক্ষ থাকে। এক এক দলে পাঁচ থেকে সাতজন হতে পারে। 'মোতা' বাঁশ দিয়ে দুই-তিন হাত পরিমাণ লম্বা দাড়া বানানো হয়। কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় ঘুঁটি। প্রায় টেবিল-টেনিস বলের মতো। এ খেলায় একদল 'উজানে' থাকে, অন্যদল 'ভাটি'তে। কোন বিরান জমি বা মাঠেই এ খেলা হয়। কারা 'উজানে' বা 'ভাটিতে' যাবে- তাও 'টসের' মাধ্যমে নির্ণীত হয়। 'উজানে' যারা থাকে তারা প্রথমে দাড়া দিয়ে ঘুঁটিকে আঘাত করে। এ খেলায় একজন তিনবার করে দাড়া দিয়ে ঘুঁটিকে আঘাত করার সুযোগ পায়। তিনবারেও যদি কেউ আঘাত করতে না পারে, তা'হলে সে মরে যায়। আবার কেউ আঘাত করতে পারলেও বিপক্ষের কেউ যদি ঘুঁটিটি লুফে নিতে পারে- তাহলেও তার একই দশা হবে। এ খেলা চলাকালেও ভাটি দলের একজন বা দুইজন 'উজান' দলের পিছনে অবস্থান করে। এর কারণও এই যে,- ভাটি থাকাকালে বিপক্ষের যেসব ঘুঁটি তারা ধরতে ব্যর্থ হয়, সে সব আবার পিছনে ছুঁড়ে দেয়া হয়। এদিকে এগুলোকে বাঁধা দিতে দাড়া নিয়ে উজানের দলও প্রস্তুত থাকে। ভাটি দলের এ ছুঁড়ে দেয়া ঘুঁটি যদি বিপক্ষের বাঁধা ডিঙ্গিয়ে পিছনে যেতে পারে এবং ভাটি দলের কেউ লুফে নিতে পারে, তাহলেও 'উজান' দলের একজন খেলোয়াড় খেলার নিয়মানুযায়ী মরে যায় এবং এভাবেই বিভিন্ন রকম খেলোয়াড় মরার ভিতর দিয়ে এ খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। এটি অনেকটা ক্রিকেট খেলার মতোই।

www.pathagar.com

কানামাছি

এ খেলায় একজন 'কানা' সাজে। 'কানা' অবশ্য 'টসের' মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তারপর তাকে রুমাল অথবা গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা কৃত্রিম কিল-ঘুষি ও লাথি দিতে থাকে। এর মধ্যে 'কানা' যদি কাউকে স্পষ্টই ধরে ফেলতে পারে, তখন সে মুক্তি পায় এবং অন্য একজন আবার কানা সাজে। এ ভাবেই খেলাটি চলে। চট্টগ্রামে একে 'তেইক্যা-চুরি' খেলা বলে।

লুকোচুরি

এ খেলাটিও বেশ কৌতুকপ্রদ। এটিও দলবদ্ধ খেলা। এ খেলার নিয়ম হল- একদল একটি গাছ বা নির্দিষ্ট স্থানকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদল বাড়ি ঘর বা আশে-পাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে লুকায়। তারপর একসময় 'কুক' দেয়। তখনই প্রতিপক্ষ তাদেরকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়ায়। দলের সবাইকে খুঁজে পেতে ছুঁতে পারলেই খেলায় জিত হয়। কেউ যদি সমস্ত প্রহরা এড়িয়ে গাছটি বা নির্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করতে পারে, তাহলে তাদেরই জয় হয় এবং দ্বিতীয়বার লুকোবার সুযোগ পায়। এভাবেই খেলাটি চলে।

বাঘবন্দি, ছ'ঘুঁটি, বার ঘুঁটি, ষোল ঘুঁটি ও পাঁচ ঘুঁটি খেলা

এগুলো প্রায় একই ধরনের খেলা। অবসর সময়ে ঘরে বসে এ খেলা চলে। মাটিকে আঁকিবুঁকি করে বাঘবন্দি ঘর বানানো হয়। অনুরূপভাবে ছ'ঘুঁটি, বার ঘুঁটি ও ষোল ঘুঁটির ঘর বানানো হয়। দুই পক্ষের মধ্যে এ খেলা চলে। ছু'ঘুঁটি নিয়ে চলে ছ'ঘুঁটি খেলা, বার ঘুঁটি নিয়ে চলে বারঘুঁটি খেলা এবং ষোল ঘুঁটি নিয়ে চলে ষোলঘুঁটি খেলা। ঘুঁটি কাটতে কাটতে যার ঘুঁটি আগে নিঃশেষ হয়, সেই হেরে যায়। বাঘবন্দি অবশ্য বুদ্ধির খেলা। যে ঘুঁটিরূপী বাঘকে বাঘবন্দি ঘরের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে এনে বন্দি করতে পারে, তারই এ খেলায় জিৎ হয়। 'পাঁচ ঘুঁটি' নামেও একটি খেলা আছে। এটি পাঁচটি ঘুঁটির সমাহারে খেলা হয়।

কড়ি খেলা/ মার্বেল খেলা

কড়ি খেলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই খেলে। মার্বেল খেলাও তাই। কড়ি খেলাটি কড়ি দিয়ে খেলে। সেই জন্যই এইরূপ নামকরণ। চারটি কড়ি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এ খেলা শুরু হয়। যার কড়িগুলো চালের পর উপুড় হয়ে পড়ে সেই খেলাকে প্রথম এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা লাভ করে। চারটি কড়ি একসঙ্গে চিৎ হয়ে পড়লে একজন ষোল পয়েন্ট পায়। দু'টি বা একটি চিৎ হয়ে পড়লে পরস্পর কড়ি ঠুকাঠুকির মাধ্যমে দুই পয়েন্ট অর্জন করে এবং খেলাও তারই হাতে থাকে। কোনো সময় এক সঙ্গে তিনটি কড়ি চিৎ হয়ে পড়লে এবং একটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়লে খেলার বাজিমাত ঘটে। এভাবেই খেলাটি চলে এবং একজন পঞ্চাশ অথবা শত পয়েন্ট অর্জনের মাধ্যমে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

লাটিম খেলা

আঞ্চলিক ভাষায় লাড়ুম। এ খেলাটি দুইজন বা তিন/চারজন মিলেও খেলতে পারে। গাব গাছের শক্ত ডাল বা এ জাতীয় কাঠ দিয়ে লাটিম তৈরি করা হয়। এগুলো সাধারণতঃ কাঠমিস্ত্রিরাই বানিয়ে থাকে। লাটিমের মুখের দিকে কামারকে দিয়ে একটি শানিত পেরেক ঢোকানো হয়-যাতে প্রতিপক্ষের লাটিমকে সহজেই ঘায়েল করা যায়। তারপর একটি দুই-দেড় হাত দড়ি দিয়ে লাটিমকে পেঁচিয়ে ধরা হয়। উঠান বা রাস্তার পাশে অথবা খালি যে কোনো জায়গায় এ খেলা চলতে পারে। এ খেলার নিয়ম হলো-মাটিতে একটি ছোটমত গোলাকার বৃত্ত আঁকা হয়। এরপর একজন সকলের লাটিমগুলো একত্রে করে কিছু ওপর থেকে এই বৃত্তের মাঝখানে ছেড়ে দেয়। এতে যে লাটিমটি বৃত্তের ভিতরে থাকে সেই লাটিমই সকলের আক্রমণের শিকার হয়। এরূপ করতে করতে যখন এটিও কারো আঘাতে বের হয়ে যায়, তখন যার লাটিমের আঘাতে বের হয়েছে, সেই আবার এর শিকার হয়।

কুৎকুৎ খেলা

এ খেলার জন্য ছ'টি লম্বালম্বি কোঠা বা ঘরের দরকার হয়। দুইজন বা এর অধিক খেলোয়াড় মিলেও এটি খেলা যায়। একটি চাড়া (পাতিলের ভগ্নাংশ) নিয়ে প্রথম ঘরে একজন খেলোয়াড় এক ঠ্যাং তুলে ঢুকে। তারপর চাড়াটি অন্য পা দিয়ে ঠেলে কুৎকুৎ শব্দ করতে করতে সামনের ঘরের দিকে এগোতে থাকে এবং ছ' এর ঘরে এসে থামে। পুনরায় ছ' এর ঘর থেকে সে শূন্য ঘরে ফিরে যায়। খেলা চলাকালে কারো ঠ্যাং ছুটে গেলে অথবা চাড়াটি অথবা কারো পা ঘরের কোন দাগের মধ্যে পড়লে খেলার নিয়মানুযায়ী তাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। তখন্য অন্যেরা খেলার চান্স পায়। এভাবেই খেলাটি চলে। একে এখানে 'ঝিক খেলাও' বলে। 'চাড়ার নামই 'ঝিক'। তাই এরকম নামকরণ।

ছড়া-খেলা

বিভিন্ন ধরনের খেলার ছড়াও এখানে প্রচলিত আছে। 'ব্যাঙ্গের মাথা' ছড়াটি এখানে একটি জনপ্রিয় খেলার ছড়া। দু'জনে ছড়া কাটার মাধ্যমে খেলাটি শুরু হয়।

গাচ্ছা খেলা

চাঁদপুর অঞ্চলে এক ধরনের খেলা দেখা যায়। এটি 'গাচ্ছা খেলা' নামে পরিচিত। একজন গাছের ওপর থাকে, অন্যজন মাটিতে। মাটির জন গাছের জনকে ছড়ায় ছড়ায় প্রশ্ন করে এইভাবে ঃ

প্রশ্ন : গাচ্ছারে ভাই, গাচ্ছা। কিরে ভাই গাচ্ছা? গাছে উঠ্ছত্ কেরে?

উত্তর : বাঘের ডরে।

প্রশ্ন : বাঘ কই?

উত্তর : ছালি-মাডির তলে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কিতা করে?
উত্তর : বইদা পাড়ে।
প্রশ্ন : ক'কুড়ি কডা বইদা?
উত্তর : ছ'কুড়ি ছডা বইদা।
প্রশ্ন : আমাকে একটা দিবে?
উত্তর : ছইতাল্লে নিবে।

অমনি মাটির জন গাছ বাইতে শুরু করে এবং এক সময় গাছের এডাল ওডাল করে গাচ্ছাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় এবং তখনই 'গাচ্ছা' খেলার নিয়মানুযায়ী মরে যায় এবং আবার নতুন করে খেলা আরম্ভ হয়। চট্টগ্রামে এটিকে 'দুধ খেলা' বলে।

ইসনি-বিসনি

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ খেলা খেলে থাকে। মাটিতে হাত রেখে কিল দিয়ে দিয়ে ছড়া কেটে এ খেলা চলে। যে 'মধ্যম ফুল' পায়, সেই আবার সবার হাতে কিল মারার সুযোগ লাভ করে। ছড়াটি এই রকম ঃ

ইসনি বিসনি সোয়া গো
চাইল কারানীর বউ গো
কার চাইল কার গো?
শীমের চাইল কারি গো?
শীম আইছে ঘাইম্যা
ধর ছাতি নাইম্যা।
ছাতির ওপর কদম ফুল
চরহি আইন্যা গান তুল ॥
ও চরহি চরহি লো
মাগের ঘাটে যাইতাম না
পান-সুপারি খাইতাম না
চিনি চম্পা মধ্যম ফুল।

চট্টগ্রামে এর একটি 'পাঠ' আছে এইরকম–

এসকি মেসকি কাইমের দারা
কাইম গেরিয়ে রাজার পাড়া
রাজার বউয়ের বাইট্টা চুল
টাইনতে টাইনতে লাম্বা চুল
লাম্বাচুলের তলে
দুয়া ভিলকি জ্বলে

www.pathagar.com

সোনার হাত কাডি দিলাম
কে-চেচ-ৎ

ওপেন টু বায়স্কোপ খেলা

একদল ছেলেমেয়ে পরস্পরে কাঁধ ধরাধরি করে এ খেলা শুরু করে। আর ছড়া কাটে এইভাবে :

ওপেন টু বায়স্কোপ
নাইট টেন তেইস্কোপ
চুল টানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠক খানা
সাহেব বলেছে- যেতে
পান-সুপারী খেতে।
পানের আগায় মরিচ-বাটা।
স্প্রিংগের চাবি আঁটা।
যার নাম রেণুবালা
তারে দিলাম মুক্তার মালা।

গরুর দৌড় ও গরুর লড়াই

গরুর দৌড় ও গরুর লড়াইয়ের এককালে খুব প্রচলন ছিল। বড় খোলা মাঠে বা চষা জমিতে এসবের আয়োজন করা হত। গরুর লড়াই খুব জনপ্রিয় ছিল এবং গরুর দৌড়ও। গরুর দৌড় বা লড়াইয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে ঢোল পিটিয়ে দেয়া হত। এতে মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত। সাধারণতঃ দুই বাড়ির দু'টি ষাঁড় বা দুই গ্রামের দুটো ষাঁড়ের মধ্যে লড়াইয়ের আয়োজন করা হত। গরুর দৌড় হত অঞ্চল জুড়ে। অর্থাৎ দশ পনের গ্রামের লোকেরা এতে অংশগ্রহণ করতে আসত। পুরস্কারেরও ব্যবস্থা থাকত এসব অনুষ্ঠানে।

লোক-সংস্কৃতি বড় একটা রূপান্তর হয় না। একই ধারায় আবহমানকালে ধরে চলে আসে। নগর সংস্কৃতির মতো দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। তবু যে যুগের হাওয়া এড়িয়ে চলতে পারে, এমন নয়। 'পপ' সংগীত লোক সংস্কৃতির উপাদান ও উপকরণে নির্মিত হলেও যুগের হাওয়ায় একে নগর সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করেছে। আধুনিকীকরণের নামে এটি ঐতিহ্যিক মূল্য হারিয়েছে। স্থায়ী হবার কথাটা আমরা এখনও ভাবতে পারছি না। প্রাসঙ্গিক কারণেই এ ব্যাপারে আমাদের মার্কিন লোক বিশেষজ্ঞ রায়না গ্রিনের কথা মনে রাখা দরকার। '... পৃথিবীর সব জায়গাতেই লোক সংস্কৃতির উৎস এক ও অভিন্ন। লোক সংস্কৃতির ব্যাপারে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ ভালো, কিন্তু সেটা হতে হবে তাঁর নিজস্ব মৌলিকতাকে অক্ষুন্ন রেখেই, যতটুকু স্বাভাবিক নিয়মে এসে যায় সেটুকু পর্যন্ত আসা ভালো- তার বেশি নয়।"

www.pathagar.com

লোক পেশাজীবী

চাঁদপুর সদর

কুমার: এ সম্প্রদায় আর আগের মত তাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যবসা আকঁড়ে নেই। আগের মতো কুমার সম্প্রদায়ের লোকদের হাঁড়-কলসি বানানো দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। সিলভারের তৈজস সামগ্রী তাঁদের তৈরি পণ্যের স্থান দখল করায় অনেকে পূর্ব পুরুষদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। চাঁদপুর সদরের তরপুরচন্ডী ইউনিয়নে এবং পুরাণ বাজারে এখনও বেশ কিছু কুমার রয়েছে।

জালের কাঠি তৈরি করছেন নারী কুম্ভকার

মুচি: জীবিকা নির্বাহের জন্য মুচি সম্প্রদায় রাস্তার পাশে ছোটো পরিসরে তাদের পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুচিদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে তাদের পূর্ব পুরুষের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।

কামার: কামার সম্প্রদায় এখনও তাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যবসা আঁকড়ে আছে। তাদের তৈরি দা, বটি বর্তমানে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। অল্প সংখ্যক কামার সম্প্রদায়ের লোক তাদের পূর্ব পুরুষদের পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

একজন কর্মকার হাপরের বদলে আধুনিক যন্ত্র দিয়ে কাজ করছেন

শীলসম্প্রদায় : চাঁদপুর জেলার হিন্দুদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের পদবী শীল, মজুমদার, সরকার, বিশ্বাস। এরা পৈত্রিক পেশা হিসাবেই ক্ষৌরকর্ম করে থাকেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। তবে নায়েরগাঁও দক্ষিণ, মতলব উত্তরের চরহরিগোফ, সিপাহীকান্দি, বোয়ালিয়া, হাজীগঞ্জের অলিপুর, মৈশমুড়া, কচুয়ার তুলাতুলী এলাকায় বসবাস করে।

ঘোষেরহাট এলাকায় শীল সম্প্রদায়ের একজন ক্ষৌরকারের কাজ

মৃৎ শিল্প : ফরিদগঞ্জ উপজেলায় লোক ও কারু শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৃৎ শিল্প। পাইকপাড়া গ্রামে কুমার সম্প্রদায় এ শিল্পের সাথে শত বছরেরও বেশি সময় ধরে

www.pathagar.com

জড়িত রয়েছে। এ শিল্পের পণ্যের চাহিদা বর্তমানে হ্রাস পাওয়ায় এ জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ পরিবার বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

ভাস্কর সমীরণ দত্ত : শাহরাস্তি উপজেলার মেহার (উত্তর) ইউনিয়নের ঘুঘুশাল গ্রামের পাল বাড়িতে ভাস্কর সমীরণ দত্ত গাছ ও মাটি দিয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরি করেন। এ ছাড়া শাহরাস্তির বিভিন্ন গ্রামে কামার ও কুমার রয়েছে যারা এখনও তাদের পেশায় আছে।

ইলিশ জেলে : চাঁদপুর জেলায় পশ্চিম অঞ্চলের স্থায়ী এলাকা এবং চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার উৎস হচ্ছে ইলিশ মাছ ধরা, ইলিশ মাছ বিক্রি করা করা, ইলিশ মাছের ব্যবসা করা এবং ইলিশ মাছের রপ্তানি করা। চাঁদপুরের অর্থনীতি সুনাম ও স্মারক ইলিশ নির্ভর। চাঁদপুরের হিন্দু-মুসলমান দুই শ্রেণির মানুষই ইলিশ মাছ শিকার করে। এদের কেউ ছোটো নৌকা দিয়ে জালের সাহায্যে মাছ ধরে। আবার বড় নৌকা দিয়ে ১০-১২ হাজার ফুটের কারেন্ট জাল দিয়ে নদীর গভীর এলাকা থেকে মাছ শিকার করে। তাদের নিজস্ব কোনো নৌকা এবং জাল নেই। মহাজনের কাছে দাদন দিয়ে তারা নৌকা ও জাল ক্রয় করে থাকেন। যখন ইলিশ মৌসুম থাকে না তখন মহাজনের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে থাকে, যাকে দাদন বলে। দাঁড়বাহী স্থানীয় নৌকার স্থলে বর্তমানে ইঞ্জিনের নৌকা ব্যবহৃত হচ্ছে। জাটকা ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে জাটকা মৌসুমে চাষীদের কষ্টের অন্ত থাকে না। তারপরও চাঁদপুরের ইলিশ জগদ্বিখ্যাত। এখান থেকে টন টন ইলিশ মাছ ভারতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়ে থাকে।

নদীতে জালে সদ্য আটকা পড়া ইলিশ মাছ হাতে একজন জেলে

বেদে সম্প্রদায় (বাইদ্যা) : মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ বেদে পরিবার। চাঁদপুর সদরের ডাকাতিয়ার পাড়, মতলব উপজেলা সদর, বরদিয়া আড়ং, নায়েরগাঁওয়ে তাদের বসবাস। এরা সাধারণত নৌকায় বাস করে। বর্তমানে ঘর নির্মাণ করেও বসবাস করতে দেখা যায়। এদের নারীরা জিনিষের পসরা মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়ায়। পুরুষেরা সাধারণথ মাছ ধরে থাকে। তবে এদের অনেকে ব্যবসা

www.pathagar.com

করছেন। কিছু কিছু লোকের অবস্থা স্বচ্ছল। স্বাধীনতা পূর্বকালে মতলবগঞ্জ জে.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়াত স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারীর ঐকান্তিক চেষ্টায় পল্লীকবি জসিম উদ্‌দীন একাধিকবার মতলব আগমন করলে প্রতিবারেই তিনি মতলবের এ বেদে পরিবারবর্গের সান্নিধ্যে সময় কাটান এবং তাদের সুখ দুঃখের সাথী হন।

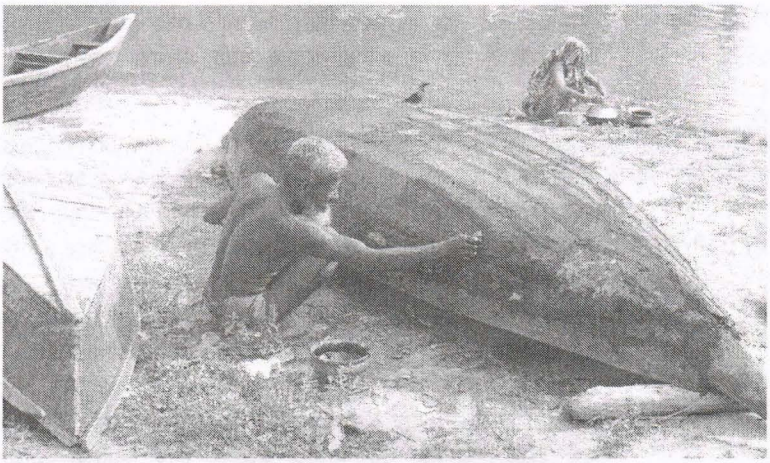

নায়েরগাঁও এলাকায় বেদে সম্প্রদায়ের একজন লোক নৌকা মেরামত করছেন

চাঁদপুরের অধিবাসীদের পেশা অনুসারে বংশপদবী ও ব্যাখ্যা

মিয়াজী- পূর্বে যারা মৌলভী/ মুন্সী/ আলেম/ ইমাম ছিলে তাদেরকে সম্মান করে মিয়াজী ডাকা হতো।

বকাউল- গ্রামে বিয়েশাদী অনুষ্ঠানে যারা ডেকোরেশন করতেন তাদেরকে বোয়াল বা বকাউল বলা হতো। যারা বেশি ইবাদত করেন তাদেরকে বকাউল্লাহ বলা হতো। বংশপদবীর ক্ষেত্রে প্রথমটিই ব্যবহৃত হয়।

প্রধানিয়া- কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রামে অন্যান্য সকলের মধ্যে যারা বংশে বা ক্ষমতায় উঁচু ছিল তারা নিজেদেরকে সকলের মধ্য 'প্রধান' হিসেবে গণ্য করত অন্যরাও সেটা মানতো।

কাজী- বিচারক, 'কাজী-উল-কুজাত' দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। সাধারণত মুফতি, উলেমা ও আইন বিশারদগণের মধ্য হতে কাজী নিয়োগ করা হতো। প্রদেশ, সরকার এবং পরগণা এ তিন স্তরে কাজী নিয়োগ হতো।

মৃধা- বাড়ির বড় হলে গিরদা, পেয়াদা বড় হলে মৃধা।

পেয়াদা- জমিদার বা রাজদরবারের অস্ত্রধারী বার্তাবাহক।

চৌধুরী- প্রাক্ মুসলিম ভারতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কমিশনভিত্তিক রাজস্ব কর্মকর্তা। পরে মুসলিম আমলেও তা বহাল ছিল যাদের অনেকেই পরে জমিদার (রাজস্ব সংগ্রহকারী) হন।

www.pathagar.com

তালুকদার- জমিদারের অধঃস্তন মধ্যস্বত্বভোগী। জমিদারের অধীনে তালুকের খাজনা আদায় করতেন।

দেওয়ান- মুঘল রাজস্ব প্রশাসনে কেন্দ্র বা সুবাহ এর সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তাকে দেওয়ান বলা হতো। ফারসি শব্দ দেওয়ান অর্থ রাজস্বকার্যের তত্ত্বাবধায়ক।

পাটোয়ারী-মুসলিম শাসনামলে গ্রাম হিসাবরক্ষক। তাকে গ্রামের পরিবার প্রধান, জমির পরিমাণ, পণ্যের পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি হিসাব রাখতে হতো।

মজুমদার- রাজস্ব আদায়কারী।

মণ্ডল- গ্রামপ্রধান।

মুন্সী- লেখক/কেরাণী।

সরকার- পরগণা পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান। জমিদারদের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষক (বাজার সরকার)। বাদশাহী আমলে রাজকর্মচারীকে প্রদত্ত খেতাববিশেষ।

হাওলাদার/হালদার- জমিদার বা তালুকদারগণ তাদের জঙ্গলময় অনাবাদী জমি চাষাবাদের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হাওলা করে দিতো। হাওলা গ্রহণকারীরাই হাওলাদার যারা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারতো।

হাজরা- হাজার সৈন্যের অধিনায়ক, গ্রামের মোড়ল, হাজার টাকার মালিক।

ঘোষ- গোয়ালা, কায়স্থ বাঙালি হিন্দুর পদবী।

জমাদার- হেড কনস্টেবল, দারোয়ানদের সর্দার, সুবেদারের নিম্নস্থ কর্মচারী।

ঢালী- ঢালধারী, ঢালধারী সৈনিক

পাঠান- পাকিস্তানের উত্তর–পশ্চিমের মুসলমান গোত্রবিশেষ। একটি উঁচুমানের সম্মানসূচক বংশপদবী।

খান/খাঁ- অভিজ্ঞ/জ্ঞানী। পাঠানদের উপাধি, মুসলিমদের সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ, সুলতান বা বাদশা কর্তৃক হিন্দুকে প্রদত্ত উপাধি বিশেষ।

ফরাজী/ফরায়েজী- হাজী মুহম্মদ শরীয়ত উল্লাহর মতানুসারী ব্যক্তি। ইসলামি ফরজ যারা মেনে চলেন। ব্রিটিশ বিরোধী ফরায়েজী আন্দোলনে যারা সমর্থক ছিলেন।

বেপারী/ব্যাপারী- ব্যবসায়ী, বণিক, কারবারী, সওদাগর।

ফকির- সংসারত্যাগী মুসলমান সন্ন্যাসী, সাধু পুরুষ, ভিক্ষুক।

দাস- জেলে, ধীবর হিন্দু মৎস্যজীবী। হিন্দু বৈদ্যদের বংশপদবী।

সাহা- ব্যবসায়ী, বণিক, সাহু, সাউ, সাহুকার, হিন্দুদের উপাধী বা পদবি বিশেষ।

নাগ- নাগ অর্থ সাপের মণি হলেও নাগ শব্দটি হিন্দু বাঙালিদের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রায়- রাজার মতো সম্পদশালী ও প্রভাবশালী। ইংরেজ আমলে প্রদত্ত খেতাব।

আকন/আখন্দ- ফার্সি ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিক অর্থে উপাধিবিশেষ।

www.pathagar.com

বন্দুকসী- বন্দুকধারী।

তরফদার- কোনো কোনো জমিদারির পরগণার অংশ বিশেষকে তরফ এবং তরফের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে তরফদার বলা হতো।

সিকদার/শিককার- মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে শিকদার বলা হতো।

ওজি- যারা হজ্ব করতেন। কোনো বাড়ির কেউ হজ্ব করলে সে বাড়িতে ওজি বাড়ি বলা হতো।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা

কবিরাজি

গত শতাব্দীতে কবিরাজি শিক্ষা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কবি হরদুর্গা কবিরঞ্জন, শক্তিচরণ চৌধুরী প্রমুখ সেকালে বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। এ'শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবিরাজদের মধ্যে মহেশ কবিরাজ, বিশ্বেশ্বর কবিরাজ প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। চাঁদপুরে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে 'কবিরাজ বাড়ি খাবাইলেঅ রোগী 'বাঁইচত ন' [স্বয়ং কবিরাজকে বেটে খাওয়ালেও রোগী বাঁচবে না] এ' থেকে বোঝা যায়, কবিরাজগণ স্থানীয় গাছ-গাছড়া বেটে রোগীদের সামনেই ঔষধ বানাতেন। বর্তমানে কবিরাজি চিকিৎসা নেই বললে চলে।

ঝাড়ফুঁক

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের মতো চাঁদপুরেও সাপের ওঝা, জিন চালানকারীর অভাব নেই। চোর ধরবার জন্য বাটি চালান, পান পড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। তুলারাশির লোক ছাড়া বাটি চলে না। প্রয়োজনে তুলারাশির লোকও পাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগে পানি পড়া, গুড় পড়াও কেউ কেউ খেয়ে থাকেন। একটি প্রবাদ থেকে 'পানি পড়া'য় কপালপোড়া গেছে' এ রকম সংবাদ লাভ করা যায় :

ভালার লাই খাইলাম জলহড়া (পড়া)
জলহড়া গেল্ কোয়ালপোড় ।

কলেরা বসন্ত ইত্যাদি মহামারীতে ঝাড়ফুঁকের কদর বেড়ে যেত। কলেরা সম্পর্কে লোকের অন্ধ বিশ্বাস, গ্রামীণ চিকিৎসা প্রণালী। 'অজ্ঞ জনসাধারণের একটা ধারণা ছিল ওলাওঠা কদাকার স্ত্রীলোকের বেশে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রবেশ পূর্বক হাওয়া হইয়া নাভীর ছিদ্র পথে লোকের দেহাভ্যন্তরে গমন করে এবং তথা হইতে মুখ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। পেটে অবস্থানকালে উহা মানুষের নাড়ীভুঁড়ী ছিন্ন করিয়া দেয়। গৃহে উহার প্রবেশ রোধের জন্য তাই তাহারা সন্ধ্যার আগে-ভাগে আপন আপন গৃহের দরজার বাহিরে একটি পাত্রে আগুন রাখিয়া দিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিত। .... তারপর বাড়ীর সীমানা হইতে উহাকে দূরে রাখার জন্য মুসলমানরা ঘনঘন আজানধ্বনি করিত এবং হিন্দুরা তামা-কাঁসা বাজাইত। নারী-পুরুষ সকলে কিছু পরিমাণ কর্পুর কিংবা উহার অভাবে কাগজি লেবুর পাতা সঙ্গে রাখিত। ..... বাজার হইতে মুদ্রিত দোয়া কিনিয়া আনিয়া অষ্ট ধাতু নির্মিত তাবিজে পুরিয়া উহা বাহুতে নীলবর্ণের সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইতো।

..... হাট-বাজার হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পরিহিত সব জামা-কাপড় সহ পুকুরে নামিয়া স্নান করিয়া তবে গ্রহে প্রবেশ করিতে হইত।

ওলাওঠা শব্দটি উচ্চারণ সকলেরই জন্য নিষিদ্ধ ছিল। হঠাৎ যদি কেহ উহা উচ্চারণ

www.pathagar.com

করিয়া ফেলিত তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনবার তওবা শব্দ উচ্চারণ করিয়া, হিন্দু হইলে জিভ কাটিয়া, উহা প্রত্যাহার করয়া লইতে হইত।"

কলেরা-বসন্ত শুরু হলে মাটির তৈরি পাতিলের ঢাকনীতে দোয়া-দরুদ লিখে অনেকে ঘরের সামনে টাঙিয়ে রাখেন। রাতের বেলায় লোকজন নিম্নলিখিত জিকির করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান :

লা এলাহা ইল্লাল্লাহু
করিম রহিম তুই আল্লাহ
জলিল জব্বর তুই আল্লাহ
হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহু
নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
লা এলাহা ইল্লাল্লাহু।

বর্তমানে কলেরা-বসন্ত হ'লে জনগণ এলোপ্যাথি-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। মতলবে আইসিডিডি আরবি হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ার পর কলেরা চাঁদপুর জেলা থেকে বিদায় নিয়েছে।

মৃত্যু প্রসঙ্গ : চাঁদপুরে কারো মৃত্যু হলে সাধারণভাবে বলা হয়- 'সারি গেছে'। মুসলমানদের অধিকাংশ পরিবারের কোনো গোরস্থান নেই বলে সাধারণত পুকুর পাড়ে কবর দেওয়া হয়। কবরের ওপরে 'কাউপলা' গাছ লাগানো হয়। বর্ষায় মৃত্যু হলে মাঝে মাঝে বাক্স বানিয়ে বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ রাখা হয়।

স্বামীর মৃত্যু হ'লে স্ত্রীর অলংকার খুলে ফেলা হয় এবং স্ত্রীকে সাদা শাড়ি পরতে হয়। সাদা শাড়ি না হোক, চেক শাড়ি কোনো অবস্থাতেই পরা চলে না।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের রান্না বন্ধ থাকে। বাড়ির অন্যান্য পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন।

গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর সাধারণত কোনো স্বামী মৃত স্ত্রীর মুখ দেখতে পারেন না।

হিন্দুদের মৃত্যুর পর 'বল হরি, হরি বল' উচ্চারণ করতে করতে আত্মীয় স্বজন মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলেন। সাধারণত বড়পুত্র পিতার মুখাগ্নি করে; সাধারণ হিন্দুরা চল্লিশ দিন পর শ্রাদ্ধ করে এবং ব্রাহ্মণ দশদিন পরে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পাদন করে। নাথযুগীগণ মৃতদেহকে না পুড়িয়ে কবর দিয়ে থাকেন। মৃতদেহকে কবরে বসিয়ে দেওয়া হয় কবরের ওপরে একটি ডাব কেটে উপুড় করে রেখে দেওয়া হয়।

মৃত্যুভয় : কোনো পরিবারের শিশু সন্তানদের পরপর অকাল মৃত্যু হলে অর্থাৎ কোনো পরিবারের সন্তান না বাঁচলে ছেলেদের নাম বেউচ্চা, হোঁরা ইত্যাদি রাখা হয়। 'বেউচ্চা' মানে 'বেচা হয়ে গেছে' আর 'হোঁরা' মানে আবর্জনা মাত্র। তাকে যম নিতে উৎসাহী হবে না। কেউ কেউ নবজাতকের কানে 'বালি' পরিয়ে দেন। মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারসমূহ এসব সংস্কার থেকে মুক্ত।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাড়ি ও গৃহনির্মাণ প্রাণী, খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে চাঁদপুরের কিছু লোকপ্রথা, লোকসংস্কার ইত্যাদির পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সব অঞ্চলেরই মতই নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়ে এসব লোকপ্রথা ও লোকচিন্তা কখনো পরিবর্তিত আর কখনো বা বিলুপ্ত হচ্ছে।

▸ মহিলাগণ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বাপের বাড়িতে 'নাইয়ুর' যান। এ কয়মাসে শ্বশুর বাড়িতে কাজের চাপ কম থাকে।

▸ ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য শিশুদের মাঝে মাঝে সোনা-রূপার পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। নতুন গরু কিনে আনলে গরুর গায়ে সোনা-রূপার পানি ছিটানো হয়।

▸ প্রথম নাতির জন্মের পর নানা-নানী গরু উপহার দেন। নাতির দুধ খাওয়ার কথা বলা হলেও এখানে কৃষিনির্ভর সভ্যতার ইঙ্গিত মেলে।

▸ নববধু আনবার পর বরের মা ছেলেকে এক রানে এবং পুত্রবধুকে অন্য রানের ওপর বসিয়ে বলেন- 'পুত ভার না বৌ ভার' উত্তর আসে 'ঘরের কামে বৌ ভার' (চালাক ও দক্ষ অর্থে), দেওয়ানে-দরবারে ছেলে ভার।

▸ সন্তানের জন্মের ৬ষ্ঠ দিনে (চট্টি) হিন্দুগণ সন্তানের পাশে কলম, বেদ, গীতা এবং মুসলমানগণ কলম ও কুরআন রাখেন।

▸ হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে, কুরআনের ওজনের সম পরিমাণ চাউল মৌলবিকে দিতে হয়।

▸ চরের ধান কোনো ঋতুতে প্রথমবার কেটে কারো সাথে পথে কথা না বলে একগুচ্ছ সরাসরি বাড়ি নিয়ে আসতে হয়।

▸ শিশুসন্তান জন্মের পর এবং তুফান শুরু হলে অসময়ে আযান দিতে হয়।

▸ মুরব্বী এবং অনাত্মীয়ের সামনে 'আমার বৌ' উচ্চারণে লজ্জা। বলতে হয়, 'আঙ্গো হরিবার (পরিবার), 'আঙ্গো ঘরের গিরছ' ইত্যাদি।

▸ বোনের দেবর অথবা ভাইয়ের শালার মধ্যে 'তালতো ভাই সম্পর্ক। এরা পরস্পরের কান ম'লে ঠাট্টা করেন।

মন্ত্রতন্ত্র

▸ 'ইল বিল/কুত্তার দাঁত খিল'- বললে কুকুরে কামড়াবে না।

▸ কেলার মৈধ্যে 'আইড্যা'

হাঁপের মধ্যে মাইড্যা'

www.pathagar.com

মাইনষের মৈধ্যে বাইড্ডা (বেঁটে)
এই তিনজাত নেওইড্ডা (ন্যাওটা, হটকারী) ।

▶ অল্প ব'সের আজী (হাজী)
বালার না'র (নৌকার)মাঝি
এই দুই বড় পাজি।

▶ দুধ দওইন্না গরু লাইচ্চাইলঅ ভালা
[যে গরু দুদ দেয়, সে গরু লাথি দিলেও ভালা]

▶ আমনা কবাম বামনা করে

[নিজের কাজ ব্রাহ্মণেও করে]

তন্ত্রমন্ত্র

১। কারো দাঁতের মাড়িতে বা শরীরের অন্য অংশে রস প্রাবল্য ঘটলে অথবা বাত সান্নিপাতিক ব্যাধি দেখা দিলে ব্যাধিগ্রস্ত অংশ হাত বলিয়ে বৈদ্যমন্ত্র সহযোগে ফুঁ দিতে বলে-

অন্তরসা দন্তরাসা।
যার আছে গুরুর দশা ॥
জানি আশি করি বাসা
সুলতান ফকির কয় ।
জানি আশা যেবা কয়
দন্তরসা বিনাশ হয় ॥

২। কারো মৃত্যু কামনায় কেউ কারো প্রতি বান টোনা প্রয়োগ করে থাকলে কঙ্কাল সার মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয় পরিজন ওঝা নিয়ে আসে। ওঝা তখন বান টোনা নষ্ট করতে গিয়ে বলে-

বান বান টোনা বান ।
কাইট্যা করলাম খান খান ॥
কাল বিরিক্ষর বিষ নাম ।
বান টানা সোনারাম ॥
কাইট্যা বান যে করে নষ্ট ॥
তার সাত পিরি ভ্রষ্ট।
বাণ করলাম নষ্ট ॥

www.pathagar.com

ধাঁধা

চাঁদপুরে ব্যবহৃত শুল্লুক/ধাঁধা

এলাকার মানুষ অবসর পেলে কয়েকজনে মিলে আড্ডা মারার সময়, কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীরা খেলার ছলে কিংবা বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ঠাট্টা সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে শুল্লুক (ধাঁধা) বলা একটি সাধারণ বিষয়।

১। আগায় খসমস, গোড়ায় মৌ/খাইতে পছন্দ করে আমার বউ–আখ।

২। হাজার পরাণের বেড়া দিয়া ঘরখানা মো বান্দি/রূপে গুণে সেরা আমি শাড়ি নাহি পিন্দি–মাকড়শা।

৩। তিন অক্ষরে নাম যার সকল স্কুলে দেয়/প্রথম অক্ষর বাদ দিলে চুম্বক টান দেয়/শেষের অক্ষর বাদ দিলে/সব প্রাণীরা খায়–রুটিন।

৪। রাখা যায় আমার মধ্যে অনেক অনেক জিনিস আমি হই নানা রকম কেউকি আমায় চিনিস?–ঝুড়ি।

৫। জীবন আছে নড়ে না জায়গা থেকে নড়ে না বলতে পারবেনা যে এটা সে হবে কান কাটা–গাছ।

৬। উড়লে পাখি ঝিরঝির বসলে পাখি বাঁধা আহার করতে গেলেও পাখির লেজটা থাকে বাধা–জাল।

৭। বাঘ হয়ে লাফ দেয়/কুকুর হয়ে বসে পানিতে ছেড়ে দিলে/শোলা হয়ে ভাসে- ব্যাঙ।

৮। সবুজ বাড়ি সবুজ ঘর/সবুজ আমার বুক/সে বুকে আগলে রাখি/ শত মায়ের পুত–খেলার মাঠ।

৯। কৃষ্ণ কালো আমি তাই করো না হেলা আমায় ছাড়া রূপে তুমি হবে নাগো সেরা–চুল।

১০। মাথার মুকুট গোলগাল পেটের ভিতর হাত পা চলে কিন্তু নড়ে না / এটা কি বলো না?–শামুক।

১১। লাথির পর লাথি মারে/নাই কোনো লাজ তবু মাথা উঁচু করে/দেয় যে সে লাফ-ঢেঁকি।

১২। ছোটো বেলায় ঘোমটা দিয়ে যায় শ্বশুর বাড়ি যৌবনে হয় ন্যাংটা, পড়ে সে শাড়ি–বাঁশ।

১৩। লম্বা সাদা দেহ তার, মাথায় টিকি রয় টিকিতে আগুন দিলে, দেহ হবে ক্ষয়–মোমবাতি।

১৪। শিরে টুটি সরু গো হাত নাই এক পাত–ছাতা।

১৫। রাঙা বউ হাটে যায় ঘাড়ে ঘাড়ে থাপ্পড় খায়–মাটির হাড়ি।

www.pathagar.com

১৬। সবুজ মিয়া আডো যায়/পথে পথে চিমটি খায়–লাউ।

১৭। উপ্তর তলে মগুরডা/বাইশ হাত লেঙ্গুরডা–জাল।

১৮। আতরা, বাডাইল বাইশটা চোরে নিল তিনডা, রইল কডা?–তিনটা।

১৯। হাত আছে পা নাই/ গলা আছে মাথা নাই–শার্ট।

২০। মাথায় ছাতা, পোদে কাদা, তার উপরে বসে ভগবান দাদা–শাপলা।

২১। আড়াত থাকে পাতে মুতে–লেবু।

২২। গেছিলাম চাইতে দিলা না আইতে–চাই।

২৩। আছাড়া দিলে ভাংগে না/টিপ দিলে সয়না–ভাত।

২৪। আল্লার কী কুদরত/এক পুকুরে দুই জল–ডিম।

২৫। কাটলে বড় হয়! এইডা আবার কী কয়?–পুকুর।

২৬। কাটলে কাটে না/খাইলে ফুরায় না–পানি।

২৭। নাই মুখ নাই জিহ্বা/টিপ দিলে কয় কথা–রেডিও।

২৮। মায়ের গর্ভে থাকিয়া সে মায়ের মাংস খায়/মাটিতে পড়িয়া সে ছয় পায়ে যায়–আমের পোকা।

২৯। বিলে না ঝিলে না জন্ম তার খালে, পেটের ভিতর পা জিহ্বা তার গালে–শামুক।

৩০। চার পায়ে বসি, আট পায়ে চলি/ বাঘও নয় কুমিরও নয় আস্তা মানুষ গিলি–পালকি।

৩১। চলিতে চলিতে তার মাথা হলো ভার/মাথা কাটিয়া দিলে চলিবে আবার–পেন্সিল।

৩২। উপর থেকে এল ঘোড়া হাত পাও জোড়া জোড়া কাঠ খেয়ে কাঠেই বাথরুম করে এমন ঘোড়া কোথায় খোজে পাবে?–করাতি।

৩৩। চার অক্ষরে নাম তার সে একটা পাখি/শেষের দুটা বাদ দিলে বাবার ভাইকে ডাকি–কাকাতুয়া।

৩৪। চলে কিন্তু হাটে না, এমন কি জিনিস বল না?–টাকা।

৩৫। জলেতে জন্ম যার/ জলে দিলে সর্বনাশ–লবণ।

৩৬। দাদা দেয় একবার/বৌদি দেয় বারবার–সিঁদুর।

৩৭। একখানি পুকুরে পানি উড়ুউড়ু করে/এমন বাপের সাধ্যি নাই সেথা মাছ ধরে–হুক্কা।

৩৮। শুতে গেল দিতে হয়/না দিলে ক্ষতি হয়, কালিদাশ কয় / যা ভাবছ তা নয়–দরজার খিল।

৩৯। হাত নাই পা নাই, পিঠ দিয়ে চলে/রাত দিন জলে!–নৌকা।

৪০। এমন এক ব্যাটা কী/রাজার পাতে বসে খায় ক্ষীর–মাছি।

৪১। বাড়ির পিছে শিমের গিল/নিজের মাথা নিজে গিল–কচ্ছপ।

www.pathagar.com

৪২। এক মায়ের দু ছেলে কেউ কাউকে দেখতে না পারে–চোখ।

৪৩। ঢুকতে গেলে ব্যথা পায়/ ঢুকে গেলে আরাম পায়–চুড়ি।

৪৪। নির নিচে হিজল গাছ/ কাটতে গেলে বার মাস–ছায়া।

৪৫। গাছের আগায় হইলের পোনা/এরে ভাই ওরে মনা–খেজুর।

৪৬। পানির নিচে হিজল গাছ/কাটতে গেলে বার মাস।–ছায়া।

৪৭। মামা ডাকে মামা বলে বাবাও ডাকে তাই ছেলে মেয়ে ও মামা ডাকে নহে মার ভাই–চাঁদমামা।

৪৮। ঘর আছে দুয়ার নাই/মানুষ আছে কথা নাই–কবর।

৪৯। তোমার বাড়ি গেলা/খুলে দিয়ে বসলাম–জুতা।

৪৯। আল্লাহর কী কুদরত/গাছের আগায় শরবত–নারকেল।

৫০। কাটতে গেলে কাঁদতে হয় এ জিনিস কী হয়?–পিঁয়াজ।

৫১। ডাক দিয়া ভয় দেহায়/আলো দিয়া পথ দেহায়–বিজলি।

৫২। পানির মাঝে জন্ম যার/পানি ঘরবাড়ি/ফরিক নহে ওজা নহে/মুখে থাকে দাঁড়ি–চিংড়ি মাছ।

৫৩। এক ছাগলের তিনমাথা/খায় শুধু লতাপাতা–পাহাল/চুলা।

৫৪। এক থাল সুপারি/গুণতে পারে কোন বেপারি?–তারা।

৫৫। সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস / মায়ে ছুঁলে পুত মরে একী সর্বনাশ–লবণ

৫৬। এমন এক রসিক চান, নাকে বসে ধরে কান!–চশমা।

৫৭। আমি নানী বাড়ি গেলাম/নানী আমায় দেখে দরজা বন্ধ করে দিল–শামুক।

৫৮। বউ এর ভাই নয়তো সে/তবু তো শালা/দুলাভাই নাইবা ডাকে/জ্ঞানতো দেয় মেলা–পাঠশালা।

৫৯। পড়াশোনাতে আমি/ তোমার লেখাপড়াতেও আমি / ফ্যাশনেও লাগি কাজে / চিনো আমায় তুমি?–চশমা।

৬০। হাজার আলোর শিখা হয়ে/কোন সে প্রদীপ জ্বলে/অন্ধকারে পথ দেখায়/জীবন সুন্দর করে।–শিক্ষা।

৬১। নানী বাড়ি গেলাম/ রক্ত দিয়ে ভাত খেলাম–লালশাক।

৬২। লালগাভী বন খায় / জল খেয়ে মারা যায়–আগুন।

৬৩। ডানা নাই সে উড়ে যায়/মুখ নাই তার তবু সে ডেকে যায়–মেঘ।

৬৪। জলে জলে জীবন কাটে/নদী নালা পুকুর ঘাটে–জেলে।

৬৫। এটু খানি বেডাডা, লোহার তামাক খায়/বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়–কুড়াল।

৬৬। এক গাছে তিন তরকারি/আজক কথা বলি হাড়ি–সজনে গাছ/কলাগাছ।

৬৭। আমি তুমি একজন/দেখতে একইরূপ/আমি কত কথা বলি/তুমি কত চুপ–আয়না।

www.pathagar.com

৬৮। আমি থাকি খালে খালে/তুমি থাকো ডালে/একদিন দেখা হবে মরণের কালে—মাছ-মরিচ।

৬৯। মেয়ে লোকের হাতে নাচে/সাতশত মুখ তার আছে—চালুন।

৭০। এ ঘর যাই, ও ঘর যাই/দমদমাইয়া আছাড় খাই—ঝাটা।

৭১। বাইশ আত মাডির তলে, বাইন্যার ঘর/বান নাই তুফান নাই, তবু বাইন্যার ডর—ইঁদুর।

৭২। মামুর বাড়ির আতিডা গুণ গুনাইয়া যায়/হাজার টেহার মইচ খাইয়া আরো খাইতে চায়—পাটা।

৭৩। সাত আত মাডির তলে, বাইদ্যা বেডির ঘর / বাঘ নাই ভাল্লুক নাই, তবু বেডির ডর—ইঁদুর।

৭৪। লরে ভাই বনে যাই/ডাল ভাইঙ্গা জল খাই—আখ।

৭৫। এই দেখি এই নাই, তারা বনে বাঘ নাই—বিজলি।

৭৬। হুল হুলানি বয়সের কালে ডুলেনি পাকলে নেংটা করে বাজারে নিয়ে তুলে—তেঁতুল।

৭৭। এক অঙ্গ, দুই অঙ্গ, তিন অঙ্গ জোড়া/দেবে তার মাথা গেল পোড়া/ভাবে বোঝা যায় পেটে করে রাও/মায়ের স্তনের মত চুষে চুষে খাও—হুক্কা।

৭৮। বন্ধু গেল বন্ধুর বাড়ি/বন্ধু দিল দুয়ার বাড়ি—শামুক।

৭৯। গাঙের পাড়ের ঘুঘুটা/শুইয়া আহার করে / লেঙ্গুরে পারা দিলে কেৎকুৎ করে।—ঢেঁকি

৮০। এক গাছ এক বুড়ি/চোখ তার চৌদ্দকুড়ি—আনারস।

৮১। রাজার বাড়ির ঘোড়া/এক বিয়ানে বুড়া।—কলা গাছ

৮৩। এক থাল সুপারি/গুণতে পারে কোন বেপারি—তারা।

৮৪। ছোটো একটা ছেমডি/খায় না ধোয় না তবু সুন্দরী—রসুন।

৮৫। উপরে সবুজ ভিতরে লাল/তার ভিতরে গুল্লির টাল।—পেঁপে।

৮৬। পাখি নয় তবু উড়ে / মোম নয় তবু গলে—মেঘ।

৮৭। হাত নাই, পা নাই দেশে ঘুরে / তার অভাব হলে লোকে অনাহারে মরে।—মুদ্রা

৮৮। হারাইলে খুঁজি তারে / পাইলে নেই না ঘরে—পথ / রাস্তা

৮৯। তিন কোণা মধ্যে গাঁথা / ফালদা ফালদা মারে যাতা।—বেলুন

৯০। তুমি আমি একজন দেখিতে একই রূপ / আমি যখন কথা বলি তুমি তখন চুপ।—ছবি/ ফটো

৯১। এক ছাগলের তিন মাথা / ছাগলে খায় লতাপাতা।—চুলা /উনান।

৯২। হাতটা করে টিপাটিপি / মুখটা করে কালো / বচ্চরাইয়া ডুইকল্যা গেলে / দুইও জনের বালা।—চুড়ি।

৯৩। খাঁচার ভিতর পেঁচার ছাও / টান দিয়া আছাড় দাও।—হিঙ্গুল।

www.pathagar.com

৯৪। লরে ভাই বনে যাই / নল ভাইংগা জল খাই।–আখ।

৯৫। কাল কাল মোরগটা কাল ঘাস খায় / রাইত ইলে মোরগটা খোড়ল যায়।–ক্ষুর।

৯৬। থাল থাল পিতলের থাল / থাল খাইল গুনে / বিন্দাবনে আগুন লাগে / কোন শালায় নিভাইতে পারে।–সূর্য।

৯৭। খাঁচার ভিতর পেঁচার ছাও/তিন মাথা, ছয় পাও।–পাল্কী।

৯৮। এদ্দুরানিক গাছটাত কত ফল ধরে/একটা ফল খাইলে পোলা বাবা বাবা করে।–মরিচ।

৯৯। কালা ছাগলের গলায় গড়ি/হত্তি আডে গড়াগড়ি।–তেলের বোতল।

১০০। হাতীর দাঁত ময়ূরের পাখ/এ শুল্লুক না ভাংগাইতে পারলে গাধার জাত।–মূলা।

১০১। টানলে কমে কাটলে বাড়ে/এমন জিনিস আছে কি সংসারে?–সিগারেট ও পানি।

১০২। একটি চিলের দু'টি পা/চার্চিলের কয়টি পা?–দুই পা।

১০৩। এক ঘরে এক থাম/বল তার কি নাম?–ছাতা।

১০৪। কোন গান জনপ্রিয় নয়?–মেশিনগান।

১০৫। কোন ধানে চাল নেই।–অভিধানে।

১০৬। কোন ড্রাইভার গাড়ি চালায় না?–স্ক্রু ডাইভার।

১০৭। কোন স্টেশনে কোনো গাড়ি থামে না?–রেডিও ষ্টেশনে।

১০৮। হুল হুলানী হুলে/ বয়সের কালে ডুলে / পাকলে নেংটা করে বাজারে নেয়।–তেঁতুল।

১০৯। ইড়িং বিড়িং তিড়িং তাই/চোখ দু'টো তার মাথা নাই।–কাঁকড়া।

১১০। খোসা আছে বোঁটা নাই/বলত কি জিনিস ভাই?
অথবা, এক মায়ের দুই ছেলে/কেউ কাউকে দেখতে না পেলে।–চোখ

১১১। উত্তর থেকে আইল টুনি/টুনির সারা গায়ে বুনি।–কাঁঠাল।

১১২। ছেলে মাকে বলে/মূর্খের স্ত্রী পণ্ডিতের মা/হাটের থেকে কি আনবা/বলে দাও না? মা বললেন- কামার এর 'মার' মারি/পাঠা এর মারি 'পা'/লবঙ্গ এর 'বঙ্গ' মারি/আনতে হবে তা।–কাঁঠাল।

১১৩। উপরের থেইক্যা পড় বুড়ি/ কাঁথা কাপড় লইয়া / সেই বুড়ি ঝগড়া করে সবার মাঝে বইয়া।–হুক্কা।

১১২। শিশুকালে জটাধারী / জোয়ানকালে উলঙ্গ / বুড়াকালে জটাধারী মধ্যে মধ্যে সুড়ঙ্গ–বাঁশ।

১১৩। ঢেঙ ঢেঙ ঢেঙটা/ছেলেবেলায় কাপড় পরা/বুড়ো বেলায় নেংটা।—বাঁশ।

১১৪। হালের বলদ গোশতের শিং/চলছে বলদ গাদলার দিন।—শামুক।

১১৫। বন্ধু গেল বন্ধুর বাড়ি/বন্ধু দিল দুয়ার বাড়ি।—শামুক।

১১৬। ধরিলে হাঁটে না/না ধরিলে হাঁটে।—শামুক।

www.pathagar.com

১১৭। বুড়ো দাদু পথ চলে সোজা/পিঠে তার মস্তবড় বোঝা।—শামুক।

১১৮। শুড় দিয়ে করি কাজ/নই আমি হাতি/পরের উপকার করি/তবু খাই লাথি।—ঢেঁকি।

১১৯। গাঙের পারের ঘুঘুটা/শুইয়া আহার করে/লেঙ্গুরে পাড়া দিলে কেইকাৎ করে।—ঢেঁকি।

১২০। এক গাছ এক বুড়ি/চোখ তার চৌদ্দকুড়ি।—আনারস।

১২১। এক জনের নাম সাউদ/তার সারা গায়ে দাউদ।—আনারস।

১২২। ইন্দ্র নয় তবু তার সহস্র নয়ন/লোহা নয় তামা নয়, তামাটে বরণ/মোরগ নয়, মুরগি নয়, শিরে মোহন চূড়া/তারে পেলে খুশি হয় ছেলে পেলে বুড়া।—আনারস।

১২৩। দুহিনি ঝিহি মাকড়ের আঁশ/ফুল নাই ফল নাই ধরে বার মাস।—পান।

১২৪। খড়িতে জলাজড়ি ফলে অধিবাস/ফুল নাই, কড়া নাই, ধরে বার মাস।—পান।

১২৫। ঘরের পিছনে গাই/এক বিয়ানে নাই।—কলাগাছ।

১২৬। রাজার বাড়ির ঘোড়া/এক বিয়ানে বুড়া।—কলাগাছ।

১২৭। ঠান ঠনঠন ভিটায় বাড়ি/কোন পণ্ডিতের পাছায় দাড়ি।—রসুন।

১২৮। অষ্টচরণ, ষোল হাঁটু/মাছ ধরতে যায় নিমাই ঠাকুর/শুকনো ঢেঙ্গায় পেতে জাল/মাছ ধরে খায় চিরকাল।—মাকড়সা।

১২৯। উপপুরুত দুপ্পুরুত/দুম্বা বে।—ছাগল-লাউ।

১৩০। গ্রামের গদাই আলহাদর/দুপুর দাপুর দায়/দোতালাতে চন্দ্র বানু/হুক্কি দিয়া চায়।—কুকুর।

১৩১। জন্মে সাদা ক্রমে কালা/গলায় লোহার মালা/ঝাপটি মারিয়ে চাপিয়ে ধরে/মাথায় নেঙ্গুর তার।—ঝাঁকি জাল।

১৩২। আমি গেলাম দোস্তের বাড়ি/দোস্ত দিল দুয়ার বাড়ি।—শামুক।

১৩৩। ছোড মোড পোলাডা/লোহার তামুক খায়/সাত গাঙ্গ পারি দিয়া/শ্বশুর বাড়ি যায়।—সাপ।

১৩৪। হাত আছে পা নাই, মাথা তার কাটা/আস্ত মানুষ গিয়ে খায়/বুক তার ফাডা।—জামা।

১৩৫। ছোড খাড পোলাডা/রাঙ্গা কোর্তা গায়/হাঁটু দিয়অ বন্দুক মারে/দালান চিড়া খায়।–বজ্রপাত।

১৩৬। গাছে গাছে হাপ বায় / হাপের আন্ডা মাইনষে খায়।—বেতফল/বেতম।

১৩৭। আছে ফল দেশে নাই/খাই ফল যোগা নাই।—শিলা/বরফ।

১৩৮। পানিতে পড়ল রুই/পানি বিনা কিছু নই।—বরফ/শিলা।

১৩৯। দেইক্যা আইলাম মিয়া বাড়ির হাটে/এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।—দরজার খিল।

www.pathagar.com

১৪০। উঁচু উঁচু বুকটান/এক বেটার চার কান।—চৌচালা ঘর।

১৪১। রহিমুদ্দি সলিমুদ্দি মিল্লা ডাহে/তবু বেটা ফিরা নাহি চাহে।—সময়।

১৪২। পাঁচ বেডা তুইল্যা দিল/বত্রিশ বেডার ঘারে/দুয়ারে আছে কুটনাবুড়ি/টাইন্যা নেই ঘরে।—আঙ্গুল, দাঁত/জিহ্বা।

১৪৩। তিন কোণা মধ্যে গাঁথা/ফালদা ফালদা মারে যাতা।—পেলুন।

৬৮। নাকে বসে ধরে কান/এই কোন শয়তান।—চশমা।

৬৯। তুমি আমি দেখিতে একইরূপ/আমি যখন কথা বলি তুমি তখন চুপ।—ছবি/ফটো।

৭০। হাত নাই পা নাই/দেশে দেশে ঘুরে/তার অভাব হলে লোকে অনাহারে মরে।—মুদ্রা।

৭১। এক হাত গাছটা/ফুল তার পাঁচটা।—হাতের আঙ্গুল।

৭২। আসি আনি নাই/আসিয়া পাইছি।/পাইয়া হারাইছি/আবারও পাইছি/এবার হারালে আর পাবো না।—দাঁত।

৭৩। বিনা সুতার মোহন মালা/কেউ দেখেনা তারে/ইহার এমন নিঠুর ধারা/সারা করে ছাড়ে।—প্রেম।

৭৪। মরার পোন্দেদা জেতা যায়/এইনি মুনিষ্যে খায়।—চাঁই।

৭৬। সমুদ্রে জন্ম আমার/থাকি সবার ঘরে/একটু পানির পরশ পেলে/তখন যাই মরে।—লবণ।

৭৭। ডাল নেই, পালা নেই/আছে শুধু পাতা/নাক নেই, মুখ নেই / তবু কয় কথা।–বই।

৭৮। অকুল সমুদ্রে মরু জল তাতে নাই/রাশি রাশি স্থলভাগ, ঘর বাড়ি নাই।—মানচিত্র।

৭৯। তুমি ডাক যারে সে নাই ঘরে/তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে আমার শ্বাশুড়ীর মারে।—জামাই ও শালার বউ।

৮২। টুয়েনটি সিক্স সোলজার/তালতলা দিয়ে যায়/টুয়েনটি তাল পড়লে কে কয়টা খায়?—১টি করে।

৮৩। লম্বায় লম্বা আনে/মরায় জেতা আনে/বেউক্যায় টাইন্যা আনে—বরশি।

৮৪। শাখা হাতি ছোলাদাঁতি/ছেলে বলছ কার নাতি/ছেলের বাপ যার শ্বশুর/তার বাপ আমার শ্বশুর। —ভাই ও বোন।

৮৫। গোদা ন'মন/গোদী ও ন'মন/গোদার দু'পু ও নম'মন/নৌকায় ধরেও ন'মন এখন ওদের নদী পার করাও।

৮৬। আল্লাহর কি কুদরত/লাঠির ভিতর শরবত।—আঁখ।

৮৭। তিন তারাঙ্গা ধানের ডাঙ্গা/খাইতে মধু, পাতা রাঙ্গা।—পানি ফল।

৮৮। বাগুন পাতা লোতা লোতা/গাছটা ছুইড়া একটি পাতা।—চাঁদ।

www.pathagar.com

৮৯। হায় তরমুজ করি কি/বোটা নাই ধরব কি?—ডিম।

৯০। ওঠ রিং দুঠো রিং/লাল হরিণের ছাও।/পুটকি দিয়া জবাই করে/সব গোষ্ঠি খাও।—পিঁয়াজ।

৯১। জলেতে জন্ম জল ছুঁইলে মরে/ক্ষণে উড়ে ক্ষণে পড়ে ধরে তো এমনও সুজনো পঙখি নাহি যার পা।—ঘুড়ি।

৯২। গেছিলাম আনতে দেয় দেইক্যা আনলাম না বলতো তা কি?—আচড়া।

৯৩। আমি যাকে আনতে গেলাম/তাকে দেখেই ফিরে এলাম/সে চলে গেলে তাকে নিয়ে এলাম।—বৃষ্টির পানি।

৯৪। জন্মে সাদা কর্মে কালো/গলায় গজমতি হার/হাত নাই পা নাই/চৌদ্দ হাত লেঙ্গুর কার? —জাল।

৯৫। বল সুজন, রক্ত বিরক্ত, উদাম চলি / ঘোমটা টানি। এদের সম্পর্ক কী?
উত্তর : রক্ত- ভাই, বিরক্ত- স্বামী, উদাম চলি- মা, ঘোমটা টানি–শাশুড়ী।

৯৬। ঠেইল্লা দিলে মেইল্ল্যা যায়/ভিতর গেলে আরাম পায়/যে বলে ভণ্ড তার পাঁচশত টাকা দণ্ড/ বস্তুটা কি?—ছাতা।

৯৭। এক বৎসরে কোয়াল (কপাল) হিরে কার?—খেঁজুর গাছ।

৯৮। এক হাত গাছটি / ফল তার পাঁচটি। কি?—হাত সহকারে হাতের আঙ্গুল।

৯৯। এই দেখি এই নাই/ এলি বনে গাছ নাই—বিজলী।

১০০। চার কলসী দুধে ভরা, ঢাকনা ছাড়া উপড় করা—গাভীর ওলান।

১১১। উপর থাকে পড়ে বুড়ি/ বুড়ি গেল গাংগের তুলি- নোঙ্গর।

১১২। তিন অক্ষরে নাম তার জলেতে ভাসে / মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে উড়ে- চিতল।

১১৩। চারকোণে চারখুঁটি / মাঝখানতে ভিটা/ টানলে দেখবে সাদা / খাইতে কিন্তু মিঠা- গাভীর দুধ।

১১৪। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে / রাতের বেলায় জাগে / ঘর নেই বাড়ি পরের / পরের উপকার লাগে–চাঁদ।

১১৫। পশু নয়, পাখি নয় কোন ছাগলের মুখে দাঁড়ি–রসুন।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

- মোততে ছাগি ধরে না/শেষে লইরাইয়া লাগুর পায় না
- কীবা পদের চেহারা/নাম নাকি পেয়ারা/করে আবার কুয়ারা/দেইখ্যা যাওগো বুয়ারা
- কইও কথা বুইজ্জা/পাও ফালাইও মাইপ্পা
- করবো কীবা দেশ টেহায়/পোন মারছে বিশ টেহায়
- চিনন নারী বুদ্ধিতে/পুরুষ চিনন সম্পদে
- ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট চাটে/বৌ নষ্ট পড়শি বাড়ির ঘাটে।
- বাপ-পুতে ডাইকা ভাই/কোনো রকম দিন কাটাই
- যার লাগি নাই/মেজবানি বোইতও নাই
- মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা/যথা ইচ্ছা তথা যা
- গাছের রান্না সূর্যে সারা, সূর্যে করো চাষ/আলো ক্ষেত্রে গাছগাছালি/ফসল বারোমাস
- যদি বড়ে আগুনে/রাজা লাগে মাগুনে/যদি বড়ে পৌষে গোলা ভরে তুষে/যদি বড়ে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ
- ষোল চাষে মুলা/তার অর্ধেক তুলা/তার অর্ধেক পান বিনাচাষে পান
- রাগ মনিবের রাইয়ত ভালো/রাগ শাশুড়ির বউ ভালো
- সুন্দরী না পায় বর/ঘরণি না পায় ঘর
- মেয়ে বিয়ে দেও ভাতে/ছেলে বিয়ে করাও জাতে
- আউশ কইরা ফোড়াইছে কান/জিনিস পড়তে যায় পরান
- শাশুড়ী আনে বউ এর মুখ/জিংলায় আনে পাহার মুখ
- যার বিয়া তার খবর নাই/পাড়া পড়শির ঘুম নাই
- মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি?!
- হস মাডিতে বিলাই খামসায়/টাইড মাডিরে শাবলও ডরায়
- কালে হরি, কালে বউ/কাছা দিয়া খাইও মৌ
- নিন্দে ফুল পিন্দে, আসে ঘর বসে
- হাতি ঘোড়া গেল তল/ভেড়া বলে কত জল
- আমিও হইর অইলাম/ে দেশে কাত নামল
- চুন খাইয়া মুখ তাতছে/দই দেখলে ডর লাগে
- আতি যদি হান্দে পড়ে/চামচিকায় লাথি মারে
- একেতো নাচুইন্না বুড়ি/আরো দিসে ঢোলে বাড়ি

www.pathagar.com

- হবাই মা রান্ধে না/ততা আর পানসা
- চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে
- খালি কলসি বাজে বেশি
- পিঠা বল, বিড়া বল, ভাতের সমান নয়/চাচি বল, জ্যেঠী বল, মায়ের সমান নয়।
- অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
- লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
- বিদেশে বি-রাজ্যে যার পুত মারা যায়/পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মায়।
- যেচকে তেচকে মিলে হুটকিচে বাইগন মিলে।
- যদি থাকে বন্ধের মন, গাঙ হাচরতে কতক্ষণ
- নিম তিতা, নিসিন্দা তিতা আর তিতা জহর/এই থেইক্যা অধিক তিতা দুই সতিনের ঘর।
- সংসার কথা খানি মধুর রসের খনি/নিচে দিয়া চাছ কাডে উপড়ে দেয় পানি।
- টিবে টাবে নাও বায় তারে কয় নাইয়া/ঠারে ঠারে কথা কয় তারে কয় মাইয়া।
- দুই সতিনের ঘর খোদায় রক্ষা কর।
- ভালোর সাথে থাকলে খায় গুয়া পান/মন্দের সাথে থাকলে কাডা যায় দুইডা কান।
- রদ পাইলাম বাইন্দা/যৌবন গেল কাইন্দা।
- আগে ছিলাম ছোচা বিলাই ধর্মে দিছি মন/তুলসির মালা গলায় দিয়া চলছি বিন্দাবন।
- চোরে যে চুরি করে এইডা করে ভালা/গরীবে চাইলে মুকখান করে কালা।
- ঘন জ্বালা পাতলা গুছি/লক্ষী বলে আমি আছি।
- নিশিতে কাকের ডাক, দিনে শিয়ালের হাক/বাড়ির দক্ষিণে গিদ্দিন্নের (শকুন) বাসা/ছাড়োরে ভাই ভবের আশা।
- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ/পাকলে করে ঠাস ঠাস/নছিব যদি মন্দ হয়/নইচা ভাইঙ্গা পোন্দ বয়।
- আম খাইঅ রসেমসে/কাডল খাইঅ কোষে/আইট্টা কলার বাকল খাইঅ/মনের বিলাসে।
- অভাবে স্বভাব নষ্ট।
- নসিব মন্দ অইলে/দুর্বা খেতেও বাঘে ধরে।
- নিজের নাই লারা মাতা/কিবা কমু পরের কথা।
- বেহায়ারে মারে পিছা/বেহায়া কয় হাছা মিছা।
- পাঁডারে দেয় বলি পাডিয়ে আঁসে/পাঁডায় কয় তোর লিগাও বরকি ঈদ আছে।
- যেই দেশে যেই বাও/পাতলা মরুদা নাও বাও।
- কম জাত বালা ত কম আক্কাল বালা না।

www.pathagar.com

- যত গুড় তত মিডা।
- চুরি করনি রইল বালা/দুয়ার দরনীরে বাইন্দা হালা।
- ধর্মের ঢোল আমনেই বাজে।
- গাছ নাই বনে ভেরণ গাছই সার।
- নামাজি কোরানি/ছিক্কার তলে আত বাড়ানী।
- মোল্লা বাড়ির বিলাইও পাঁচ কলমা জানে।
- পরের তান হরণে/গতি নাই তার মরণে।
- সব মাছে গু খায় গাউরা মাছের নাম পলে।
- বাড়ির গরু কোলার ঘাস খায় না।
- ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
- আগের লাঙ্গল যে দিকে যায়, পেছনের লাঙ্গলও সেদিকে যায়।
- বাইন্যার কাছে দইন্যা বেচে, মেঘও রোদও পেতিয়ালের বিয়েও।
- তাঁতির পুতে বাতি (ইঁদুর) মাইলা/মাটিতে না রাখে পাও।রাজার পুতে হাতী মাইরা/লাজে না করে রাও।
- জাগিয়া না করে রাও / হগল কতার বুঝে বাও।
- বিদেশে বি-রাজ্যে যার পুত মারা যায় / পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মায়।
- ভালোর সাথে থাকলে খায় গুয়া পান / মন্দের সাথে থাকলে কাডা যায় দুইডা কান।
- নিশিতে কাকের ডাক, দিনে শিয়ালের হাক / বাড়ির দক্ষিণে গিদ্দিনের (শকুন) বাসা ছাড়োরে ভাই ভবের আশা।
- পটল বুনলে ফাল্গুনে/ফলন বাড়ে দ্বিগুণে। ফাল্গুনে না বুনলে ওল/শেষে হয় গণ্ড গোল। খনা বলে চাষার পো/শরতের শেষে সরিষা রো। সরিষাবুনে কালাই মুগ, বনে বেড়াও চাপড়ে বুক। কার্তিকের উনো জলে/দুনো ধান খনা বলে। তামাক পোঁত গুটি গুটি। হাত বিশেক করি ফাঁক/ আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ। গাছ গাছালী ঘন সরে না/ফুল হবে তো ফল হবে না।
- ঘন জ্বালা পাতলা গুছি / লক্ষী বলে আমি আছি।
- নছিব যদি মন্দ হয়, / নইচা ভাইঙ্গা পোন্দ বয়।
- নসীব মন্দ অইলে / দুর্বা খেতেও বাঘে ধরে।
- অভাবে স্বভাব নষ্ট।
- বেহায়ারে মারে পিছা/বেহায়া কয় হাছামিছা।
- নিজের নাল লালা মাথা, / কিবা কমু পরের কথা।
- যেই দেশে যেই বাও, / পাতলা মুরুদা নাও বাও।
- পাঁডারে দেয় বলি, / পাডিয়ে আঁসে, / পাঁডায় কয় / তোর লিগাও বরকি ঈদ আছে।

www.pathagar.com

- যত গুর তত মিডা।
- কম জাত বালা ত কম আক্কাল বালা না।
- ধর্মের ঢোল আমনেই বাজে।
- চুরি করনি রইল বালা/দুয়ার দরনিরে বাইন্দা হালা।
- বাড়ির গরু ঘাটার ঘাস খায় না।
- লেজ নাই গরুর ঘাঘরা ক্ষেত দিয়ে পথ।
- গরুরে দিওনা ভালা ঘাস / বউরে দিওনা পরবাস।
- মেঘও রোদও পেতিয়ালেরও বিয়েও।
- পিড়িয়ে বসে পেরুর খবর।

ডাহের কথা (ডাকের কথা)

১। ঘরের কতা পরের কয়
তারে কয় পর।
চৈত মাসে কাঁথা গায়
তারে কয় জ্বর।

২। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা
প্রতি কথায় ছন্দ।
বালকে বালকে কথা
প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব ॥
বুরায় বুরায় কথা
কথায় কথায় কাশি।
যুবায় যুবায় কথা কথায় কথায় হাসি ॥

৩। হিন্দুর দাড়ি
বিধবা নারী।
নদীর কুলের বাড়ি
বনে চরা গাই
এই চারে বিশ্বাস নাই।

৪। অল্প বয়সে দাড়ি
বিধবা নারী।
নদীর কূলে বাড়ি,
বনে চড়া গাই।
এই চারে বিশ্বাস নাই।

www.pathagar.com

৫। নদীর ধারে বাস,
বালির উপর চাষ।
সু-অদৃষ্টের আশ,
নারীর মুখের হাস।
এর উপরে যার বিশ্বাস,
তার সাত পুরুষে কাটে ঘাস ॥

৬। ঘর বাঁধো খাটো।
গরু কিনো ছোটো ॥
বিয়ে করো কালো।
তাই গৃহস্থের ভালো ॥

৭। দর দরাইয়া আঁড়ে নারী
চউক পাহাইয়া চায়।
এই অভাগিনী নারী
পুরুষ আগে খায় ॥

৮। বাড়ির শোভা বাগ বাগিচা
ঘরের শোভা ওশারা।
দাঁতের শোভা মাজন মিশি
চোখের শোভা ইশারা ॥

৯। গোছল কইরা যেবা নারী
কেশের আগা চায়
ছয় মাসের আয়ু থাকতে
স্বামী মারা যায়।

১০। অতিভাব যেখানে
নিত্তি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্তি
ঘটবে একটা কীত্তি ॥

১১। যত আয় তত ব্যয়।
হুদা ভাতে নুন ক্ষয় ॥

১২। স্ত্রীর ভাগে ধন।
পুরুষের ভাগ্যে জন ॥

১৩। যত বেইল পরে।
তত বল হরে ॥

www.pathagar.com

১৪। গাছে ওডে মরতে।
জামিন হয় ভরতে ॥

১৫। অতি ভাব যেখাসে নিত্তি যাবে সেখানে/ যদি যাবে নিত্তি / ঘটবে একটা কীত্তি ॥

১৬। কানে কচু নাকে তেল/খালি পেটে মূলা/ তবে কেনে মিছামিছি , কবিরাজের বাড়ি গেলা ॥

১৭। খালি পেটে জল/ভর পেটে ফল, এতেই সুফল ॥

খনার বচন

১। যদি বরে আগনে/রাজা যায় মাগনে ॥ যদি বরে পৌষে । করি হয় তুষে ॥ ঐদি বরে মাগে। আগুন লাগে বাগে ॥ যদি বরে মাগের শেষ। ধন্য রাজার পূর্ণ দেশ॥

২। আমে বান । তঁতুইয়ে ধান ॥

৩। আগে বাইন্দা দিবে আইল। তাতে রুইবে নানান শাইল ॥ তাতে যদি না হয় শাইল । খনা বলে পারবে গাইল ॥

৪। শীষ দেখে বিশ দিন। কাটায় পারায় দশদিন ॥

৫। খনা বলে শোন শোন করতের শেষে মূল্য বুন ॥

৬। ষোল চায়ে মুলা। তার অর্ধেক তুলা ॥ তার অর্ধেক ধান।বিনা চাষে পান ॥

৭। কচু বুনে ছড়ায় ছালি তার সংখ্যা হালি ॥

৮। চাল ভরা কুমরা পাতা, লক্ষী বলে আমি তথা ॥

৯। উডান ভরা লাই শস্য। খনা বলে লক্ষীর বাসা ॥

১০। ডাক দিয়া কয় রাবণ/কলা লাগাও আষাঢ় শাওন ॥

১১। আগে রুইলা কলা।/বাগ বাগিছা ফলা।

১২। আশ্বিনে রান্দে ভাত/কার্তিকে খায়/যেই বর মাগে যেই বর পায়।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

অন্য সব অঞ্চলের মতো চাঁদপুর জেলায় বসবাসরত মানবকূলও আদিকাল থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি ঘাটিয়ে কল্পনা শক্তির সাহায্যে কিছু যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছে। যেগুলো লোকপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। মাছধরার জাল, চাঁই, জালের বিভিন্ন প্রকার, কামারের হাপর, কুমারের চাক্কি, সূত্রধরের ভাইশ খান, তেলট পালের কাঠের ঘানি, ধানবানার ঢেঁকি ইত্যাদি লোকপ্রযুক্তি যথার্থ উদাহরণ। লোক প্রযুক্তির যন্ত্রগুলো এক এক সম্প্রদায়ের এক এক রকম। লোকপ্রযুক্তির পরম্পরায় যোগ রয়েছে। লোকপ্রযুক্তি সহজলভ্য জটিলতামুক্ত। তবে বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে পেশা পরিবর্তনের যে ঢেউ লেগেছে তাতে লোক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে।

হাপর : কাঠের কয়লাগুলোকে বাতাস প্রয়োগ করে প্রজ্জ্বলন করার জন্যে কামার সম্প্রদায় হাপরের ব্যবহার করে থাকে। হাপর উচ্চতাপ সৃষ্টি করার জন্য সাহায্য করে এবং লোহাকে উত্তপ্ত করে।

শোরতা (জাতি) : শোরতা সুপারি কাটার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রায় সকল গৃহস্থ বাড়িতে এবং বাজারে সুপারির দোকানে শোরতা দেখতে পাওয়া যায়। শোরতাকে চাঁদপুর এলাকায় জাতি বলে।

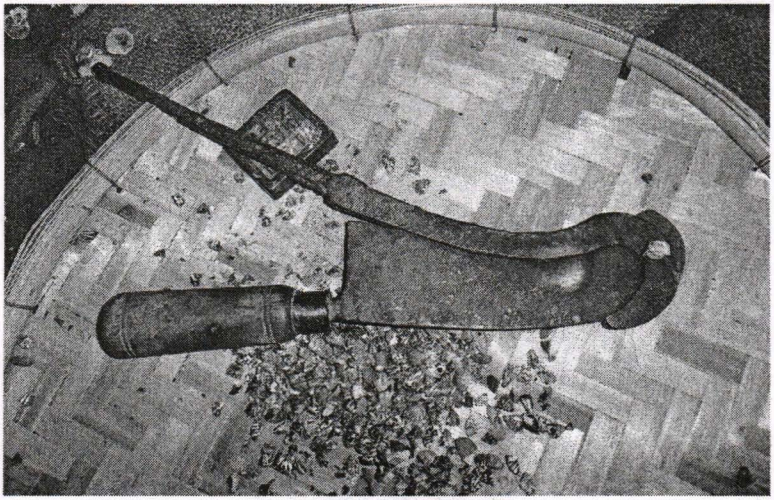

সুপারি কাটার শোরতা (জাতি)

www.pathagar.com

তামাকের কলকি : প্রাচীনকাল থেকে তামাক সেবন করার জন্য হুক্কা এবং কলকি চাষীদের মাঝে প্রচলিত। মাঝে মধ্যে গঞ্জিকাসেবিরা ও কলকির ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে হুক্কার ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে মাদকসেবীরা কলকি ব্যবহার করে এবং কলকি দেখতে পাওয়া যায়।

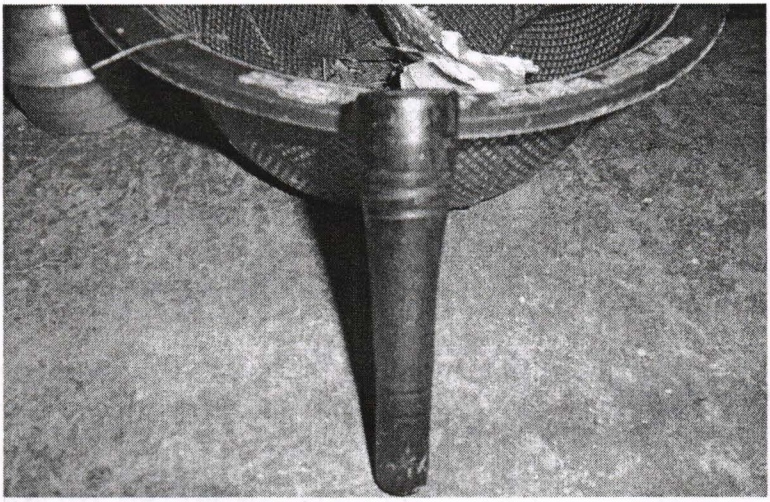

তামাক খাওয়ায় ব্যবহৃত কলসি

টেঁটা : মাছ ধরার জন্য লোহার শলাকাকে গুচ্ছ বেঁধে বাঁশের হাতলযুক্ত করে এক ধরনের মাছ ধরার যন্ত্র স্থানীয় লোকেরা তৈরি করেছে। এগুলো মাঝে মধ্যে অন্য প্রাণী শিকার ও ঝগড়া বিবাদে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

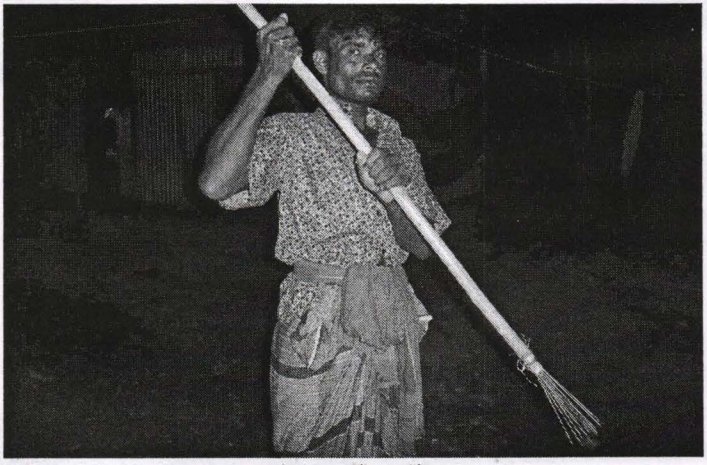

মাছ ধরার টেঁটা (টেঁডা)

www.pathagar.com

বেড় জাল : নদী ও খালবিলে জেলেরা এক বিশেষ ধরনের জাল ব্যবহার করে। একে বেড় জাল বলে। এটি ১০০-৩০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। মজবুত সুতা ও গাবের রস দিয়ে শুকিয়ে জালটিকে শক্ত করা হয়। জালটিকে কাছি দিয়ে উপর ও নিচ ভাগে সংযুক্ত করা হয়। শিকারের জন্য জলাশয়ে চারদিক থেকে বেড় দিয়ে টেনে উপরে তোলা হয়।

কোষা নৌকা : বড় নদীতে যেমন মেঘনা, ডাকাতিয়ায় ছোটো মাছ শিকার করার জন্যে জেলেরা এই বিশেষ ধরনের কোসা নৌকা ব্যবহার করে। নৌকায় পাল লাগানো থাকে। বাতাসের গতি বুঝে নৌকা চালনার মাধ্যমে জাল দিয়ে জেলেরা মাছ ধরে। এই নৌকার গঠন এমন প্রকৃতির যে নদীতে প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের প্রতিকূলেও তা ভেসে থাকতে পারে।

ঢেঁকি : গ্রামগঞ্জে ধানভানা, চাউল গুড়া করা, হলদি-মরচি গুড়া করার কাজে প্রাচীন আমল থেকেই ঢেঁকির প্রচলন রয়েছে। ঢেঁকি হচ্ছে শক্ত কাঠের গুড়ির মাঝখানে একটি হাতল ঢুকিয়ে দু'পাশে দু'টি শক্ত কাঠ মাটিতে পুঁতে ঢেঁকিকে সংযুক্ত করা হয়। ঢেঁকির মাথায় একটি কাঠের টুকরো থাকে, তাহাকে মুষল বলে। মাটিতে গর্তের ভিতর একটি পাথরের গোলাকার ছিদ্রযুক্ত পাত্র থাকে। মাঝের অংশটিতে যে কাঠের টুকরোটি থাকে তাকে কাইল বলে।

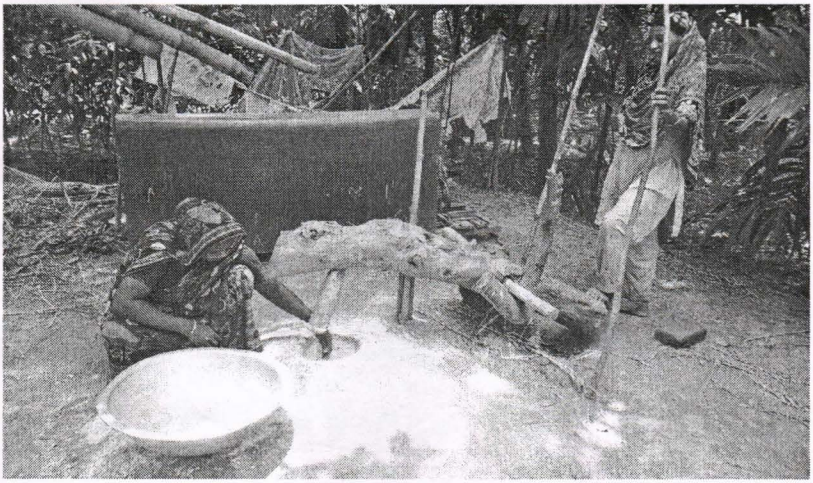

ঢেঁকিতে দেশিয় পদ্ধতিতে চাল গুড়া করছেন দু'জন গ্রাম্য নারী

মাছ ধরার চাঁই : বাঁশের তৈরি এক বিশেষ জাতের মাছ ধরার ফাঁদকে চাঁই বলে। নদীতে বা খালে-বিলে স্রোতের বিপরীতে চাঁই বসানো হয়। চাঁইয়ের ছোটো আকৃতিকে আনতা বলে। মাছ, চাঁই এবং আনতার ভেতর প্রবেশ করলে আর বের হতে পারে না।

www.pathagar.com

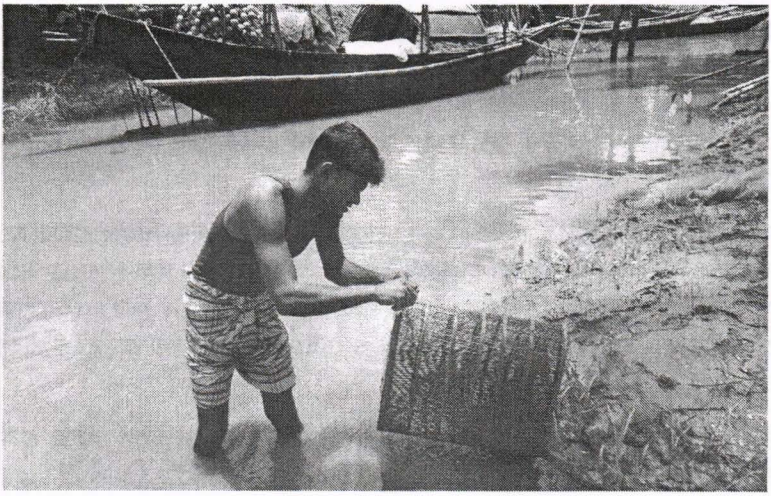

মাছ ধরার চাঁই বসাচ্ছেন একজন জেলে

ধান মাড়াইয়ের কল : লোহা এবং কাঠের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ যন্ত্র দিয়ে ধান গাছ থেকে পাকা ধান ছাড়ানো হয়। প্রাচীনকালে গরু দিয়ে ধান মাড়াই করা হতো। বর্তমানে গরু দিয়ে ধান মাড়াই করা হয় না বললেই চলে।

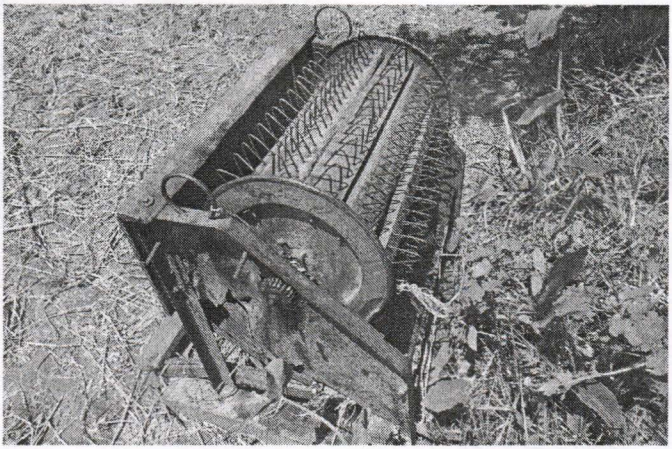

চাঁদপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি ধান মাড়াইয়ের কল

খাঁচায় মাছ চাষ : আমিষের চাহিদা মিটানোর জন্য স্বচ্ছ পানিতে খাঁচা নির্মাণ করে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা ছেড়ে খাঁচায় মাছ চাষ করা হয়। একেকটি খাঁচা ২০ফুট/১০ ফুট সাইজের হয়। গভীরতা ৫ ফুট। খাঁচাগুলো নদীর স্বচ্ছ পানিতে রেখে দু'স্তরের জাল ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন জাতের খাবার দিয়ে খাঁচায় মাছগুলোকে বড়

www.pathagar.com

করা হয়। একেকটি খাঁচায় বিশহাজার রেণুপোনা ছাড়া হয় এবং তিনস্তরে খাঁচাগুলো থেকে মাছ ধরা হয়। খাঁচাকে ভাসিয়ে রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম ব্যবহার করা হয়। একেকটি খাঁচা থেকে আধা কেজি থেকে এক কেজি ওজনের সর্বাধিক এক হাজার মাছ পাওয়া যায়। চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে এরূপ বিশ হাজার খাঁচা দিয়ে মৎস্য চাষীরা মাছ চাষ করে।

স্বচ্ছ পানিতে খাঁচায় মাছ চাষের নতুন প্রযুক্তি

কুমারের চাককি : গোলাকার কাঠের চাকা ও একটি কাঠের লাঠি দ্বারা কুমার সম্প্রদায় চাকিটিকে ঘুরায়। চাকির উপরে কাঁদামাটির গোল্লা বসানো হয়। চাকিটি ঘুরানোর সাথে সাথে মাটির গোল্লাটি কুমারের কারিগরি দক্ষতায় কলসে রূপ নেয়। এই প্রযুক্তি কুমার সম্প্রদায় প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে।

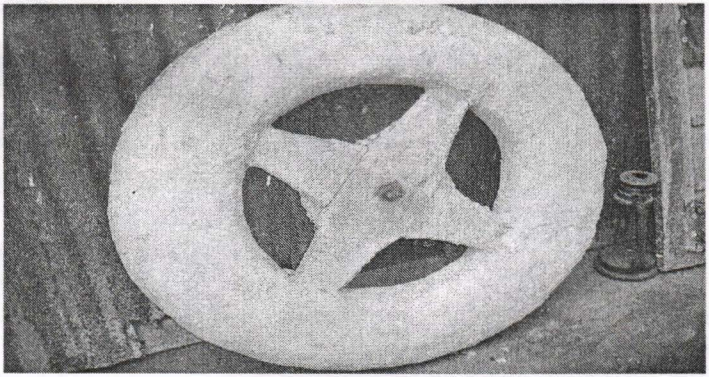

অলিপুর গ্রামে ব্যবহৃত কুম্ভকারের চাক্‌কি

হারমোনিয়াম : চাঁদপুরের পুরান বাজার এলাকায় দেশীয় মালামাল ও প্রযুক্তি দিয়ে বিশেষ ধরনের হারমোনিয়াম তৈরি করা হয়। এগুলি প্রায় বিশ্বমানের বলা যায়। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়েও অন্য জেলায় এগুলি রপ্তানি করা হয়।

www.pathagar.com

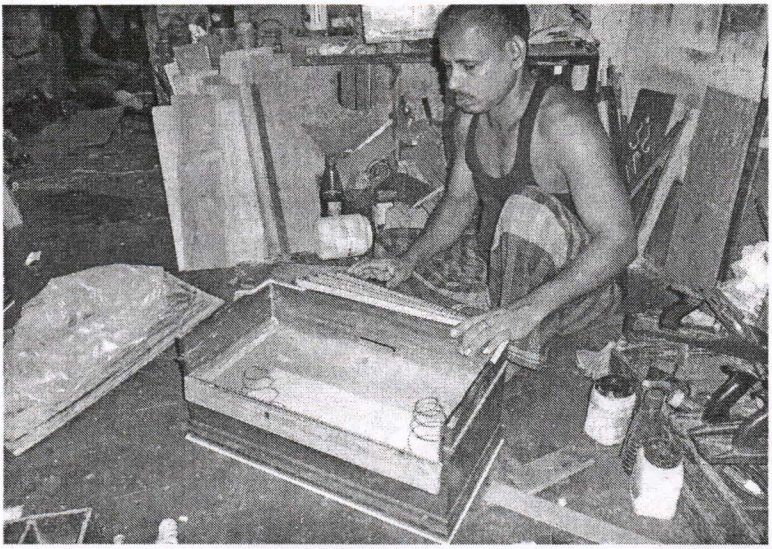

চাঁদপুর পুরানবাজারে বাদল মণ্ডল তার বাড়িতে হারমোনিয়াম নির্মাণ করছেন

তালের নৌকা (কোন্দা) : স্বল্পদূরত্বের জলপথে ব্যবহার করার জন্য মোটা তালগাছের গোড়ার অংশকে ফাঁপা করে এক ধরনের জলযান তৈরি করা হয়। এগুলি টেকসই হয় এবং স্থানীয়ভাবে বহুল ব্যবহৃত।

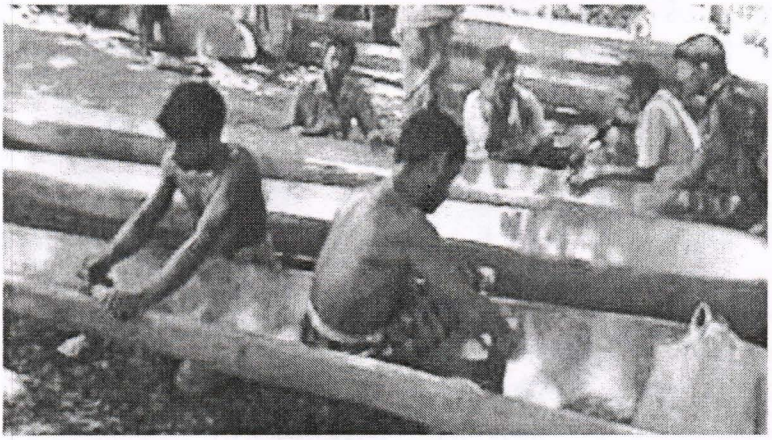

চাঁদপুরে তালগাছের নৌকা (কোন্দা) নির্মাণ

www.pathagar.com

নায়েরগাঁও কুমার বাড়িতে অবিক্রিত গরুর জল রাখার আধার (নাইন্দা)

রপ্তানী ও সংরক্ষণের জন্য ইলিশ মাছ প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে

তেঁতুল কাঠের ঘানি : চাঁদপুর অঞ্চলে এক সময় প্রচুর সরিষা জন্মাত। চরাঞ্চলে মাঠের পর মাঠ সরিষা ক্ষেত ছিল। বর্তমানেও এগুলো আছে, তবে কম। সরিষা থেকে বিশুদ্ধ সরিষার তেল উৎপাদন করার জন্য এক শ্রেণির মানুষ ছিল যাদের কলু বলা হত।

www.pathagar.com

ঘানিতে সরিষা দিয়ে বিশেষ কায়দায় গরুর সাহায্যে বিশুদ্ধ তেল তৈরি করা হতো। এখন কলু ও কলুর বলদ না থাকলেও ঘানি তৈরি হচ্ছে, যেগুলি মটর দিয়ে চালানো হয়।

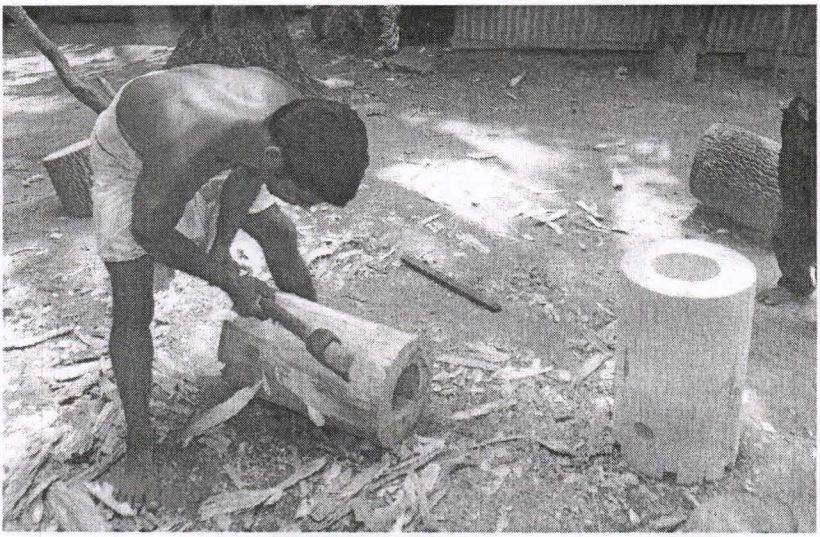

শ্রীরামদী গ্রামে তেঁতুল কাঠ দিয়ে তেলের ঘানি তৈরি করছেন কুলু সম্প্রদায়ের লোক

তালের নৌকা (কোন্দা) : এক সময় চাঁদপুর জেলার সমগ্র এলাকার মধ্যে পঁচাত্তর ভাগই বর্ষাকালে পানিতে নিমজ্জিত থাকত। বাড়িগুলোকে দ্বীপের মতো মনে হতো। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাওয়ার জন্য তাল গাছের নিম্নভাগে অর্থাৎ মোটা অংশ কেটে ভিতরটা ফাঁকা করা হতো। তালের নৌকা টেকসই হতো এবং পানিতে ভেসে থাকত। দু'তিন জন মানুষ অনায়াসেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারত। স্থানীয় ভাষায় নৌকাটিকে কোন্দা বলতো। বর্তমানেও কোন্দার প্রচলন রয়েছে, তবে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে তালের নৌকার প্রচলন সীমিত হয়ে গেছে।

পালকি : যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে চাঁদপুর জেলায় পালকির প্রচলন ছিল। ধর্মীয় গুরু প্রভাবশালী জমিদার ও স্বচ্ছল মানুষেরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পালকি ব্যবহার করত। বিয়েশাদীতে বর কনেকে পালকিতে করে শ্বশুর বাড়ি যেতে হতো। এটা একটা লোক ঐতিহ্য। চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পালকি বহনকারী সোয়ারী (বাছাড়) সম্প্রদায় এখানো রয়েছে। পালকি বহনকারী হাসান মিয়ার (রঘুনাথপুর) সাথে আমাদের কথা হলো। তিনি জানালেন, পালকির বাজার এখন খুবই মন্দা। গড়ে মাসে একটা কাজ পাওয়া যায়। প্রতিটি পালকির জন্য সর্বনিম্ন আট হাজার টাকা পারিশ্রমিক তারা নিয়ে থাকেন। বর-কনে এক মাসে একই পালকিতে বহন করলে

www.pathagar.com

তারা দশ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। ছোটো পালকির জন্য দুইজন বাহক ও বড় পালকির জন্য চারজন বাহক দরকার হয়। বর্তমানে চরাঞ্চলেই পালকির চাহিদা বেশি।

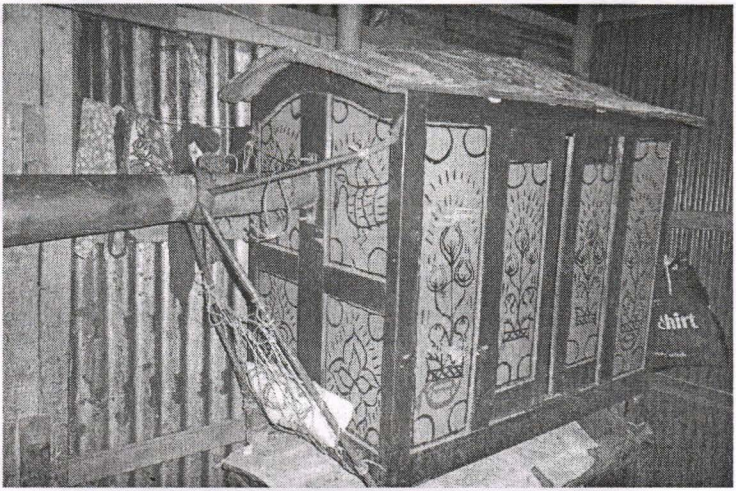

গ্রামাঞ্চলে লোক পরিবহনের আরেকটি মাধ্যম পালকি

নৌকা : চাঁদপুর জেলা নদী, খাল-বিল সমৃদ্ধ একটি জেলা। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা নদী নির্ভর। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, মাছ ধরা ও যাত্রী সাধারণের বহনের জন্য এখনো বিভিন্ন প্রকারের নৌকা ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে কোষা, দু'গলুই সরেঙ্গা, ডিঙ্গি সহ বড় নৌকা ব্যবহৃত হয়। মেঘনা নদীর জন্য এক ধরনের ও অভ্যন্তর ভাগের জন্য অন্য রকমের নৌকা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে নৌকাগুলোতে মাঝিমাল্লার স্থলে ইঞ্জিন বিশেষ করে পানিসেচের শ্যালো ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

চাঁদপুরের চরাঞ্চলের যোগাযোগের মাধ্যম দেশি নৌকা

www.pathagar.com

ঘোড়া : প্রাচীনকালে চাঁদপুর জেলায় যাতায়াতের জন্য মানুষ ঘোড়া ব্যবহার করত। প্রায় প্রত্যেক বনেদী পরিবারে নিজস্ব ঘোড়া থাকত এবং জমিদার শ্রেণি এবং অবস্থাসম্পন্ন কৃষক ঘোড়া ব্যবহার করতেন। বর ঘোড়ায় চরে বিয়ের আসরে আসতেন। বর্তমানে ঘোড়া খুবই বিরল প্রাণী হয়ে গেছে। ঘোড়ার স্থানে দখল করেছে মোটর সাইকেল ও মোটর গাড়ি।

www.pathagar.com

লোকভাষা

কতিপয় বিষয়বস্তুর স্থানীয় নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
সমবার	-	সোমবার	শুক্কুরবার	-	শুক্রবার
মোঙ্গলবার	-	মঙ্গলবার	শনিবার	-	শনিবার
বুদবার	-	বুধবার	রইবার	-	রবিবার
বিসুদবার	-	বৃহস্পতিবার			

বার মাসের নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
বইশাখ	-	বৈশাখ	কাতি	-	কার্তিক
জেট	-	জ্যৈষ্ঠ	আগুন	-	অগ্রহায়ণ
আষা	-	আষাঢ়	হুষ	-	পৌষ
শওন	-	শ্রাবণ	মাগ	-	মাঘ
ভাদর	-	ভাদ্র	হাগুন	-	ফাল্গুন
আশ্বিন	-	আশ্বিন	চৈত	-	চৈত্র

ভৌগোলিক নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
সাগর	-	সাগর	টেঁক	-	অন্তরীপ
খাড়ি	-	উপসাগর	খাল	-	প্রণালী
ঝর্ণা	-	ঝর্ণা	ডোবা	-	ডোবা

গাছের নাম

আম, কাঁঠাল, জামরুল, গামার, চাপালিশ, তেলসুর, সুরুজবেত, দুধ্যা, পিত্তরাজ, নাগেশ্বর, তালি, চাঁপা, ভাদি, শিল, গামা, হরিতকি, বহেরা সিরিস, সোনালূ, বেইল, তেতৈ (তেঁতুল), কড়ই, বৈলসর, জাম, কালিবয়ল, দেবদারু, সেগুন, পিটালী, কাঁটা কারুল, বাঁশ জারুল, ঝাউ, নাইকেল, তাল, শাল, অশ্বথ, বট, উড়িআম, কাঙারাবাদি, বৈলম মন্দর গাছ ইত্যাদি। চাঁদপুরের ফুল, ফল, পাখি ও মাছের নাম - প্রচলিত ও স্থানীয় ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে

ফুলের নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
কেঁয়া হুল	-	কেতকী ফুল	বকুল হুল	-	বকুল ফুল

www.pathagar.com

কেইচ্যাফুল	-	কাঁশ ফুল	গেঁদা/গেঁজা হুল	-	গাঁদা ফুল
রক্তজবা	-	রক্তজবা ফুল	নোয়াশা হুল	-	নাগকেশর ফুল
শিমুল ফুল	-	শিমুল ফুল	অঁরফুল	-	আকন্দ ফুল
সেঁঅলী হুল	-	শেফালিকা ফুল	চম্পা হুল	-	চাঁপা ফুল
শরমিন্দা হুল	-	লজ্জাবতী ফুল			

ফলের নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
কইয়া	-	পেঁপে	কামরঙ্গা	-	কামরাঙ্গা
গড়ম	-	পেয়ারা	আম্বা	-	আমড়া
খিরা	-	সোমাস	মত্তনকেলা/কলা	-	মর্তমান কলা
বাঞ্জী	-	ফুটি-বাঙ্গী	চিনিচাম্পা কেলা	-	চাঁপা কলা
জাম্বুরা	-	বাতাবী, লেবু/জাম্বুরা	আইড্ডা কেলা	-	বিচি কলা
কাট্টলী কেলা	-	সাধারণ জাতের	পদ্দর টাক	-	পদ্মার চাক
খরমুজ	-	খরমুজ	হিঙ্গইর	-	পানি ফল
খাজুর	-	খেজুর	কেউর	-	কেসুর
কমলা	-	কমলা	হাল্লুক	-	শালুক
অট্টই	-	হরিতকী	জলপই	-	জলপাই
আমলই	-	আমলকী	কুঁইউর	-	আখ
বরই-	-	কুল	চিনার	-	কাঁকুড়
হোঁয়া	-	শশা	নাইয়ল	-	নারিকেল
ছিরফল	-	ছোটোবেল/শ্রীফল	আনারস	-	আনারস
কাডল	-	কাঁঠাল			

পাখি

মতলব, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর এলাকায় এক সময় প্রচুর পাখি ছিল, কিন্তু শিকারীদের অত্যাচারে যে সকল পাখির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই।

স্থানীয় পাখির নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
রাতা	-	মোরগ	চাউস্ম্যাবাঁদর	-	চামচিকা
মুরগি	-	মুরগি	ডীইল্যা	-	আকাশচারী
পোননাচানী	-	খঞ্জন	বাইল্যা	-	বাবুই
কৈতর	-	কবুতর	হানিকঁরী	-	পানকৌড়ি
ধেউছা	-	ফিংগা	কুরাইল্যা	-	কাঠ ঠোকরা
কাউয়া	-	কাক	তোতা	-	টিয়া

www.pathagar.com

দৈয়ল	-	দোয়েল	সাইর	-	সারি
কুকিল	-	কোকিল	কোয়াল	-	ঘুঘু
হাট্টটি	-	টিট্টভ	হুত্যইম্যা	-	হুতুমপেঁচা
হাইল্যা	-	শালিক	আঁ-ই কুঁই	-	হাড়ি চেঁচা
বগা	-	বক	রাদা আঁ-স	-	রাজহংস
মাছরাঙ্গা	-	মাছরাঙ্গা	কুরবাল	-	শিকারী বাজ
ডাউক	-	ডাহুক	অলইদ্যইদ্ধ	-	হলদে পাখি

উপরোক্ত পাখিগুলো চাঁদপুর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। এসব পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ প্রকৃতিকে মোহনীয় করে তোলে।

তরকারির নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
আনাজিকেলা	-	কাঁচকলা	কঁইযা	-	ধুন্দুল
কেলার থোড়	-	মোচা	হাইন্য কচু	-	ওল
কড়া কাট্টল	-	ইঁচড়	ওলকচু	-	ওল
সশিন্দা	-	চিচিঙ্গা	অড়ল	-	অরহর
কাঁকরল	-	কাঁকরোল	কদু	-	লাউ
বাইয়ুন	-	বেগুন	চনাবুট	-	ছোলা
ছুঁই	-	শিম	মশুরী	-	মশুর
তিত্ করলা	-	উচ্ছে/করলা	খাডাইয়ুন	-	টকবেগুন
গুড়া কচু	-	ডালিকচু	হোঁপা	-	কচুফুল
মিডা কুমড়া	-	মিষ্টি কুমড়া			

মাছের নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
ঘুল্লা মাছ	-	টেংরা মাছ	খইয়া মাছ	-	খালিশা মাছ
টাকি মাছ	-	টাকি মাছ	রিষ্যা মাছ	-	তপসী মাছ
মাগুর	-	মাগুর মাছ	হুঁডি মাছ	-	পুঁটি মাছ
হিং মাছ	-	সিঙ্গি মাছ	ছেয়লী মাছ	-	খয়রা মাছ (চাপিলা)
গাইগ্যা মাছ	-	ডানকানা মাছ	কালিঘেন্যা	-	কালিবাউস মাছ
রুইত মাছ	-	রুই মাছ	পুঁইয়া মাছ	-	পাকাল মাছ
মাআল মাছ	-	মৃগাল মাছ	কাচকি মাছ	-	মইল্যা মাছ
কাতাল মাছ	-	কাতলা মাছ	হাব্দা মাছ	-	পাবদা মাছ
ভেদা মাছ	-	ভেটকী মাছ	বাইলা মাছ	-	বেলে মাছ
ইচা মাছ	-	চিংড়িং			

www.pathagar.com

মশলা-পাতির নাম

স্থানীয়		প্রচলিত	স্থানীয়		প্রচলিত
অলইদ	-	হলদি	রোন	-	রসুন
মিডাজিরা	-	মৌরী	দারচিনি	-	দারুচিনি
চিঅনজিরা	-	জিরা	আজৈন	-	যোয়ান
ধইন্যা	-	ধনিয়া	সরিষা	-	সরিষা
হেঁয়ইজ	-	পিঁয়াজ			

চাঁদপুরের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত কিছু ব্যতিক্রমী শব্দ

বেগুন = সবগুলি; বেকতে = সবাই; হবরে আয় = তাড়াতাড়ি আস; হুক্কু = ফুফু; বইড় = পা; এনদা = এদিক দিয়ে; হেনদা = ওদিক দিয়ে; সেইতথা রাখা = যত্নে রাখা; নেহারা = আলাদা; কম্পা = পেঁপে; মউ = তরকারী ঝোল; জেরে = পরে; হব্বরে / হুয়ালটানে = তাড়াতাড়ি করে; হুদ্দাওয়ালা = পুরুষ মানুষ; উয়াল = বমি; পোতাইল্লা = শ্যাওলা; চইওলে = চৌকির নিচে; এমিক্কা হেমিক্কা = এদিক, সেদিক; চুলি = জামা; চালি মারা = দৌড় দিয়া; মাদানে = বিকালে; হলই পাতা = পুঁইশাক; বেজ্জে = আটকিয়েছে; হকতে = একতা।

www.pathagar.com